নিশীথ তৃষা



নিশীথ তৃষা

(সম্পাদনায়)
পৃথ্বীরাজ সেন

পাত্র'জ পাবলিকেশন
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৮৫

প্রকাশক :
শ্রীমানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

এগার টাকা

সূচীপত্র

বিতর্কিত এজেন্টের সুপার থ্রীলার

দুরন্ত পিপাসা ॥ এক ॥ ফিলিপ ম্যাক

অবিশ্বাস্য রুদ্ধশ্বাস গয়েন্দা উপন্যাসিকা

কামনার দংশন ॥ আটান্ন ॥ জেমস হেডলী চেজ

বাসনা শিহরিত স্পাই কাহিনী

মরণ অভিসার ॥ একশো চার ॥ নিক কার্টার

দুরন্ত গতির ক্রাইম নভেলেট

এখানে হত্যার ছায়া ॥ একশো সাতান্ন

অ্যালেস্টেয়ার ম্যাকনিল

ফিলিপ ম্যাক

দুরন্ত পিপাসা

শব্দটা না থামা পর্যন্ত আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকলো। সেই সঙ্গে ধোঁয়ায় ভরে গেলো সারা ঘর। জেমস বণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকলো সেই দৃশ্য। গুলিটা তার বাঁ-হাতের কোল্টা ডিটেকটিভ স্পেশ্যাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। ডান হাতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু বাঁ হাতেও চেম্বার চালাতে সে যে অভ্যস্ত, আজই প্রথম প্রথম সে অনুভব করলো, এবং মনে মনে গর্ববোধ করলো। হাতের বন্দুকটা মেঝের দিকে কাত করে সে অপেক্ষা করছিলো তার ইন্সট্রাক্টারের পরবর্তী মন্তব্যের জন্যে।

বণ্ড দেখলো ইন্সট্রাক্টারের ঠোঁটে কেমন বিদ্রূপের হাসি। আমি এটা বিশ্বাস করি না।

তারপর ইন্সট্রাক্টার তার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা পোষ্টকার্ড সাইজের পোলারয়েড ফিল্ম। সেটা সে বণ্ডের হাতে তুলে দিলো। এর পর তারা পিছনের একটা টেবিলের সামনে এসে ঝুঁকে পড়লো। সবুজ আলোয় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে সেই ফটোগ্রাফটি দেখলো বণ্ড।

ইন্সট্রাক্টার কোনো কথা না বলে সেই সাদা রঙের নকল মানুষের মূর্তিটা মেলে ধরলো বণ্ডের চোখের সামনে। তার পেটের ভেতর দিয়ে গুলিটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে। ইন্সট্রাক্টারের মুখে প্রশংসা সূচক হাসি। টোয়েন্টি রাউণ্ডস এ্যাণ্ড আই মেক ইট ইউ ও সি সেভেন-এ্যাণ্ড-সিক্স স্যার, আবেগহীন গলায় বলল সে।

বণ্ড হাসলো। হাসতে হাসতেই কিছু মুদ্রা গুণলো সে। বাজি ধরছি, আসছে সোমবার এর ঠিক দ্বিগুণ হবে। বণ্ড বলল।

আমি বলছি এই বন্দুকের স্যুটিং এ আপনি দিওয়ার ট্রফিও জিততে পারেন চেষ্টা করলে।

টু হেল উইথ দি দিওয়ার ট্রফি, বণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলল, নাও তোমার বন্দুকের দাম। চেম্বারের ভেতরে অব্যবহৃত বুলেটগুলো নাড়া-চাড়া দিলো বণ্ড, এবং বন্দুকটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল—আসছে সোমবার ঠিক এই সময়ে আবার দেখা হচ্ছে।

ও, কে স্যার। নিজের নিখুঁত স্যুটিংএ খুশি হয়ে সেদিনের মতো প্রস্থান করল বণ্ড। সে এবং কেবল 'এম' জানেন, সিক্রেট সার্ভিসে একমাত্র বণ্ডই স্যুটিং এ সিদ্ধহস্ত। বণ্ডের কনফিডেন্সিয়াল রেকর্ড তাই বলে।

তারপর বণ্ড ন'তলায় তার সিক্রেট সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার জন্যে হাঁটা পথে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলো। রিজেন্ট পার্কের কাছে ধূসর রঙের অফিস বিল্ডিং তার, ক্লান্তিকর একটা যান্ত্রিক শব্দ লিফটের দরজা খোলার সময় উঠতেই বণ্ড ভেতরে প্রবেশ করল। লিফট আবার ওপরে উঠতে শুরু করল, তারপর এক সময় এইটথ ফ্লোরে এসে থামলো।

এক সময় দরজা খুলে যায়। অফিস ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেই বণ্ড রোজকার নিয়ম মতো তার সুন্দরী সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে বলল—মর্ণিং, লিল।

সেক্রেটারীর মুখের হাসিটা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, দিন আপনার কোটটা খুলে দিন। তারপর একটু থেমে সে আবার বলল—লিল বলে আমাকে ডাকবেন না। আপনি তো জানেন ও নামে ডাকার মানুষ আমার আছে।

বণ্ড তার হাতে কোটটা খুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ক্রিষ্টিণ্ড ললিয়া পনসনবিকে যেই দেখবে সেই তাকে অমন প্রিয় নামে ডাকবে।

ললিয়া কোনো কথা বলল না।

ললিয়ার রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ এই সিক্রেট সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কাজ করিতে গিয়ে বণ্ডের তো এক এক সময় মনে হয়, ললিয়া যতক্ষণ না কাউকে বিয়ে করছে ততক্ষণ সে তাকে তার লার্ভারের মতো ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে ললিয়াকে অনেকবার বলেছে বণ্ড। বণ্ড ছাড়াও জিরো-জিরো সেকসনের আরো দুজন সদস্যদেরও ঐ একই ইচ্ছে। ওদিকে ললিয়াও এক এক সময় ভাবে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এক নিষ্পাপ গৃহস্থ বধূর মতো সৎ জীবন যাপন করবে। এতোগুলো পুরুষের দৃষ্টির সামনে সে নিজেকে কেমন অসহায়

বোধ করে যেন। কিন্তু এখানে এই সার্ভিসে সে এখন অপরিহার্য। মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স সে এখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।

ললিয়া পনসরি জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তার পরণে সুগার-পিঙ্ক এবং সাদা ষ্ট্রীপ দেওয়া সার্ট এবং ঘন নীল রঙের স্কার্ট। বণ্ড তার ধূসর রঙের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল—কেবব মাত্র সোমবার আমি তোমাকে লিল সম্বোধন করব। আর সপ্তাহের বাকী কয়েকদিন মিস পনসরি। তবে আমি তোমাকে কখনোই, ললিয়া বলে ডাকতে পারব না। ঐ নামটা কেমন যেন অর্থহীন শোনায়। যাই হোক, এনি মেসেজেস? কোনো খবর আছে!

না তেমন কোনো জরুরী খবর নেই। তবে ফাইল পত্র অনেক জমে গেছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ০০৮ বেরিয়ে এসেছে। সে এখন বার্লিনে বিশ্রাম নিচ্ছে। খবরটা চমৎকার নয়?

বণ্ড সহসা তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল—এ খবরটা কখন তুমি শুনলে?

প্রায় আধ ঘণ্টা আগে।

বণ্ড তার ডেস্কের ওপর বসে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করল—আর ০০১১'র খবর কি? দু'মাস আগে সিঙ্গাপুর থেকে সেই যে সে নিখোঁজ হয়ে গেলো, তারপর থেকে তার আর কোনো খবর নেই। সে বণ্ড এবং ০০৯ এক সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করতে করতে জিরো জিরো নাম্বার লাভ করে। কতোদিন তারা তিনজন এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করেছে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেলো ০০১১।

এ সব কথা চিন্তা করতে করতে বণ্ড তার দিনের কাজে মনোনিবেশ করল।

বণ্ড তার পকেট থেকে গানমেটালের সিগারেট কেস এবং ব্ল্যাক অক্সিডাইজড রনসন লাইটার বের করে পাশের ডেস্কের ওপর বসলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাকে আসা চিঠিগুলো পড়তে শুরু করল। এই ভাবেই শুরু হয় তার প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনের কাজ, এই ভাবেই শেষ হয় ছটা মাস, বছর। বছরের মধ্যে দুটি কি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাদবাকী সময় আর পাঁচজন সিনিয়ার সিভিল সারভেন্টদের মতো জীবন কাটে তার। সন্ধ্যেবেলায় তাস পিটে, কখনো বা বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলে। তারপর উইক-এণ্ডে লণ্ডনের কোনো

অভিজাত ক্লাবে গল্‌ফ খেলে। সিক লিভ ছাড়া অফিসে কোনোদিন সে বড় একটা ছুটি নেয় না। বছরে দু'হাজার পাউন্‌ড আয় তার। কিংস রোডে সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে থাকে সে। সঞ্চয় বলতে সামান্য খরচের অঙ্কটাই বেশী।

ইতিমধ্যে পাঁচটা সিগারেটের ছাই এ্যাসট্রের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছিলো। তার কাজের লিষ্টের মধ্যে 'এম' দিয়ে শুরু হয়। তারপর 'সিওএস'। তারপর ডজনখানেক চিঠি। এবং শেষ হয় জিরো জিরো'তে।

ঠিক বেলা বারোটার সময় বণ্ড ন্যাটোর রেডিও ইন্টেলিজেন্স ডিভিসনের ফাইলের ওপর চোখ রাখলো। ছায়াছবির পর্দায় দৃশ্যমান ঘটনাস্রোতে। ইন্সপেক্টোস্কোপ – নিষিদ্ধ কার্যকলাপ ধরার মেসিন। ফিলোপন—জাপানিজ মার্ডার-ড্রাগ ইত্যাদি, ইত্যাদি -

বণ্ডের ডেস্কের ওপর তিনটি টেলিফোন। কালো রঙের রিসিভার বাইরের কলের জন্যে। সবুজ অফিসের কাজ কর্মের জন্যে। এবং লাল রঙের রিসিভারটা সরাসরি চীফ অফ স্টাফ 'এম'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে. সেই লাল রঙের রিসিভার থেকে সহসা অতি পরিচিত টেলিফোনের বেল বাজার শব্দ ভেসে এলো।

'এম'এর চীফ অফ স্টাফ কথা বলছি। তুমি কি এখন চলে আসতে পারো? সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর!

'এম'? বণ্ড জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ।

এনি ব্লু?

তা.তো বলতে পারছি না। তিনি কেবল তোমাকে বলতে বললেন, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান এখুনি।

ঠিক আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি। বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো বণ্ড ক্রেডেলের ওপর।

তারপর মিস পনসবির কাছ থেকে বণ্ড তার কোটটা নিয়ে তাকে বললো,—'এম' এর কাছে যাচ্ছি। আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

বণ্ড করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালো। বণ্ড ভাবছে একটু আগেও তার হাতে তেমন কোনো জরুরী কাজ ছিল না। যেন তরঙ্গহীন সমুদ্রে সে ভেসে চলেছিল একা এক ভেলায়। তারপর হঠাৎ ঐ লাল টেলিফোনে আওয়াজ। সেই সমুদ্রে এক প্রচণ্ড ঢেউ তুলে দিয়ে গেলো যেন।

খানিক আগে স্তব্ধতা ভেঙ্গে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেলো। বণ্ড নিজের কাঁধে আচমকা ঝাঁকুনি অনুভব করলো। আজ সোমবার। এই সোমবারটা তার কাছে বড় কষ্টদায়ক একটি দিন। মনে হয় আজ তার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

ইতিমধ্যে লিফট তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। লিফটের ভেতরে পা দিয়ে বণ্ড বললো,—নাইনথ।

২

একেবারে টপ ফ্লোর হয়ে নাইনথ ফ্লোর। বড় শান্ত নিস্তব্ধ এই নাইনথ ফ্লোর। নক্ না করেই সবুজ রংয়ের দরজা ঠেলে বণ্ড একেবারে শেষ প্রান্তে এম, এর চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো।

এম, এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস মনিপেনি টাইপ রাইটারের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। তার মুখে সেই চিরাচরিত হাসিটা ফুটে উঠতে দেখলো বণ্ড। তারা উভয়ে উভয়কে বেশ পছন্দ করে। মিস মনিপেনি জানে বণ্ড তার এভমায়ারার! তার পরনে ছিলো বণ্ডের সেক্রেটারীর ডিজাইনের সার্ট, তবে নীল স্ট্রীপস্।

পেনি, এটা কি তোমার নতুন পোষাক? বণ্ড জিজ্ঞেস করলো।

সে হাসলো। লোয়ালিয়া আর আমি দুজনে পছন্দ করে একই ডিজাইনের সার্টের কাপড় কিনি। টসে আমার ভাগ্যে পড়ে নীল স্ট্রিপস দেওয়া কাপড়।

সেই সময় এম, এর চেম্বার থেকে তার চীফ অফ স্টাফকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। বণ্ডেরই সমবয়সী সে। তার মুখটা কেমন সাদা দেখাচ্ছিলো। মুখে অত্যধিক কাজের চাপের ছাপ।

এম, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সে বললো,—পরে উনি লাঞ্চ সারবেন।

ফাইন। মৃদু হেসে বণ্ড দরজা ঠেলে এম, এর চেম্বারে প্রবেশ করলো।

উইক এণ্ড ছুটিতে অবসর সময় কাটানোর খবর বিনিময় করার পর এম, চুপ করে রইলেন। হাতের পাইপটা পরিষ্কার করতে গিয়ে কি যেন ভাবছিলেন

তিনি। বণ্ড লক্ষ্য করলো এম, মনে হয় ভাবছেন কি ভাবে কাজের কথাটা শুরু করবেন। বণ্ড তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার কথা ভাবলো। ঠিক সেই মুহূর্তে এম, জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার হাতে কি এখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ আছে জেমস ?

জেমস! বণ্ড একটু আশ্চর্য হলো। অফিসে তার ক্রিশ্চিয়ান নাম ধরে এম, কখনো তাকে ডাকেন না সাধারণতঃ যাইহোক নিজেকে সামলে নিয়ে বণ্ড উত্তর দিলো,—কেবলমাত্র কিছু পেপার ওয়ার্ক আর রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া তেমন কিছু নেই। এ ছাড়া আমাকে আপনার অন্য কোনো প্রয়োজনে দরকার আছে কি স্যার ?

সত্যি কথা বলতে কি জানো বণ্ড এম, বললেন,—কাজটা আমাদের সিক্রেট সার্ভিস সংক্রান্ত কিছুই নয়। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমার ধারণা তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো। বল পারো না ?

অফকোর্স স্যার! বণ্ড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো।

এ রকম উত্তরই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম বণ্ড। এম, বললেন, যাইহোক এবার কাজের কথায় আশা যাক। আচ্ছা তুমি কি স্যার হুগো ড্রাগ্‌সের নাম শুনেছো ?

নিশ্চয়ই! পরিচিত নামটা শোনা মাত্র বণ্ড একটু বিস্মিত হয়ে বললো,—তার সম্বন্ধে কিছু না পড়ে আপনি কোনোদিনই দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করতে পারবেন না। এই তো সানডে এক্সপ্রেসে তার জীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। অদ্ভুত তার জীবনের গল্প।

জানি। সংক্ষেপে বললেন এম,। তার সম্বন্ধে তুমি যতটুকু জেনেছো আমাকে বলো, আমার জানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই।

বণ্ড জানলার দিকে একবার তাকিয়ে ভাবলো, এম ফালতু কথার মানুষ নন। অতএব তাকে স্যার হুগো ড্রাগ্‌সের সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক গল্প তুলে ধরতে হবে তাঁর সামনে। কোনো ভূমিকা কিম্বা চিন্তার অবকাশ রাখা চলবে না।

ওয়েল স্যার, বলে বলতে শুরু করলো বণ্ড। স্যার হুগো ড্রাগসের জীবনী এই রকম :

স্যার হুগো এখন জনসাধারণের চোখে অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, হয়ে উঠেছেন। জ্যাক হবস কিংবা গরডন রিচার্ডসের সঙ্গে তাঁকে এখন

অনায়াসে তুলনা করা যায়। জনসাধারণ তাঁকে তাই মনে করে থাকে তাঁকে যদিও খুব একটা ভাল দেখতে নয়, তা ছড়ো মুখে যুদ্ধে আহত হওয়ার ক্ষতের চিহ্ন এখনো বর্তমান, তবু তাঁরা তাঁকে তাদের মনে 'হিরোর' স্থান দিয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের চোখে। শুধু কি তার চেহারা দেখে আজকের মানুষ ভুলেছে? দেশের যা উন্নতি করতে পারেনি স্যার হুগো দু হাতে টাকা বিলিযে তার দেশের অনেক উন্নতি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এটাও তার কম পরিচয় নয় স্যার। তাকে যে কেন এখনো প্রাইম মিনিস্টারের পোস্টটা দেওয়া হচ্ছে না সেটাই বড় আশ্চর্যের কথা।

বণ্ড তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। আফটার অল স্যার, সে বলতে থাকলো, বছরের পর বছর যুদ্ধের দিনগুলিতে সে তার দেশকে বিপদমুক্ত করে রাখতে সাহায্য করেছে। অথচ বয়স তার চল্লিশের বেশী নয়। তবে কোথা থেকে সে যে এতো উৎসাহ, প্রেরণা পেলো, আর কিই বা তার আসল পরিচয় সেটাই এখন বড় বেশী রহস্যময়। জনসাধারন যে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছে তার জন্য আমি মোটেই বিস্মিত নই, যদিও সে একজন মাল্টিমিলোওনিয়ার।

এম তার কথা শুনে শুষ্ক হাসি হাসলেন। এতোক্ষণে তুমি যা যা বলে গেলে এ সবই সানডে এক্সপ্রেসের ট্রেলার স্টোরি ছাড়া কিছু নয়। নিঃসন্দেহে সে একজন অদ্ভুত ব্যক্তি। কিন্তু এ ব্যাপার তোমার কি মতামত তাই আমি শুনতে চাই। আমি মনে করি না যে, তোমার থেকে আমি বেশী জানি। সম্ভবত কমই জানি। খবরের কাগজের ওপর বেশী গুরুত্ব দিওনা। তাছাড়া তার সম্বন্ধে কোনো ফাইলও আমাদের কাছে নেই, কেবল মাত্র ওয়ার-অফিসে ছাড়া, তবে সেগুলোও খুব স্পষ্ট নয়। অতএব এখন বলো, এক্সপ্রেস স্টোরির সারমর্মটা কি?

স্যরি স্যার, বণ্ড বললো, তাঁর আসল পরিচয় যে কি তা আমি বলতে পারবো না। তবে এটুকু বলতে পারি, লাস্ট গ্রেট-ওয়ারে ১৯৪৪ এর এক শীতের দিনে তাঁকে আবিস্কার করা হয় এক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং অজ্ঞান অবস্থায়। তাঁর সঙ্গে আরো পঁচিশজন আহত মিলিটারি পার্সোনেল ছিলো। জায়গাটা ছিলো আর্ডেন্সের কাছাকাছি। আমরা তখন রাইন নদী অতিক্রম করে গেছি। তখন জার্মানরা গেরিলা এবং স্যাবোটার্সদের নামিয়ে দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্যে। শত শত লোক এবং সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের নিষ্ঠুর কার্যকলাপে। সেই সময়ই তাঁকে পাওয়া যায়। সেই পঁচিশ-ছাব্বিশজন আহত

পার্সোনেলদের মধ্যে ড্রাগস্‌কে ইংরেজ বলে সনাক্ত করা হয়। তখন তাঁর মুখের অর্ধেক ক্ষতবিক্ষত। তাঁকে তখন চেনা যাচ্ছিলো না। তারপর প্রায় বছর খানেক পরে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয় বিভিন্ন হসপিটালে, ওয়ার-অফিসে।

ড্রাগস্ নামে কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। তারপর যখন হুগো ড্রাগসের মতো অন্য কোনো লোককে পাওয়া গেলো না কাগজে-কলমে, তখন তাকেই এই নামে ডাকা হতে থাকলো। ইতিমধ্যে অনাথ বালক যুদ্ধের আগে যে লিভারপুল ডকে কাজ করতো, সে জানালো হুগো ড্রাগসকে সে চেনে। তার জানা হুগো ড্রাগসের একটা ফটোও সে দেখালো। সেই ফটোটা হুবহু আমাদের জানা ঐ হুগো ড্রাগসের মতোই দেখতে। তাছাড়া ওয়ার অফিসও পরে জানতে পারলো পায়োনিয়ার ইউনিটে হুগো ড্রাগসের চেহারার মতো একজন কর্মরত অবস্থায় ছিলো যুদ্ধের সময়। তার থেকে সেই যে হুগো ড্রাগস এই ধারণাটা আরো দৃঢ় হলো। তাছাড়া কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল হুগো ড্রাগসের ছবি ছাপিয়ে। কিন্তু পরবর্তী কালে হুগো ড্রাগসের নাম বা চেহারা নিয়ে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ওয়ার অফিসে আসেনি। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ এর শেষাশেষি তাঁকেই হুগো ড্রাগস বলে স্বীকৃতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তার বকেয়া বেতন এবং পুরো পেনসনের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে।

কিন্তু সে নিজেই এখনো বলে থাকে, সে জানে না সত্যি কে সে। এম, বাধা নিয়ে বললেন, ব্লেডসের সদস্য সে। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে তাস খেলে থাকি। ডিনার টেবিলে সে আমাকে প্রায়ই বলে থাকে, এখনো সে লিভারপুলে গিয়ে সে তার অতীত সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করে থাকে। যাইহোক, এখন বলো, এরপর তোমার কি বক্তব্য আছে।

বণ্ড কি যেন মনে করতে চেষ্টা করলো। তারপর আবার সে মুখ খুললো,—যুদ্ধের পর প্রায় বছর তিনেক সে নিরুদ্দেশ ছিলো। তারপর পৃথিবীর চারিদিক থেকে এদেশের মানুষ তার কথা শুনতে আরম্ভ করলো। তখনই তার নাম প্রথম শুনলো মেটাল মার্কেট। অত্যন্ত দামী এবং প্রয়োজনীয় কলম-বাইট ধাতু সংগ্রাহক হিসেবে সে তখন খ্যাতিলাভ করে ফেলেছে, সবার খুব চাহিদা তখন ঐ ধাতুর। ঐ ধাতু ছাড়া জেট ইঞ্জিন তৈরী করা যায় না। পৃথিবীতে ঐ ধাতুর অস্তিত্ব খুবই কম, অথচ চাহিদা তার পর্বত সমান। ড্রাগস সম্ভবত আগামী জেট-যুগের কথা চিন্তা করে এই মহামূল্যবান ধাতুর ব্যবসায় নেমে পড়ে।

সানডে এক্সপ্রেস তাই তো লিখছে। কলম-বাইট ধাতুর প্রয়োজনে সবাই এখন ড্রাগস মেটালসের শরণাপন্ন। ড্রাগসের ব্যবসা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে সম্প্রসারিত। কিছুদিন আগে সে দক্ষিণ আফ্রিকার এক কলম-বাইট ধাতুর খনি মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়।

এম'এর শান্ত দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ বণ্ডের মুখের ওপর। মুখে পাইপ লাগিয়ে তার কথাগুলো তিনি শুনছেন। বণ্ড বলতে থাকে, ১৯৫০ সালেই সে মাল্টি-মিলোওনিয়ার হয়ে যায়। তারপর তানজিয়ার থেকে ফিরে আসে সে। ইংলণ্ডে ফিরে এসে সে দুহাতে টাকা বিলোতে থাকে দেশের জন্যে বিভিন্ন চারিটেবল ফাণ্ডে, স্পোর্টসের বিভিন্ন ট্রফির জন্য। তাছাড়া তখন তাকে এক নেশায় পেয়ে গিয়েছিলো। মোটা মোটা টাকার বিনিময়ে ভালো বাড়ী, ভালো গাড়ী, ভালো নারী পেতে থাকলো সে।

এবং তারপর সেই ঐতিহাসিক চিঠিটা এলো রাণীর কাছে। ইয়োর মেজেষ্টি মে আই হ্যাভ দি টিমেরিটি—সানডে এক্সপ্রেসে বড় বড় হেডলাইন দিয়ে লিখলো, সুপার এ্যাটোমিক রকেট তৈরী করার জন্যে ড্রাগস কি পরিমাণ কলম-বাইট ধাতু দিয়েছে ব্রিটেনকে। তার ডিজাইনও তৈরী করে ফেলেছে সে। তার লক্ষ্য হবে সারা ইউরোপের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

মাস খানেক পরেই সারা ইংলণ্ডে প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়ে গেলো। প্রতিবাদে মুখর হলো দেশবাসী, ড্রাগসের এতো অবদান সত্বেও কেন সুপার এ্যাটোমিক রকেট বানানো হচ্ছে না? পার্লামেণ্টে বিরোধীপক্ষ সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে এ ব্যাপার অনাস্থা প্রস্তাব আনার হুমকী দিলো। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ড্রাগসের ডিজাইন মনোনীত হয়েছে মিনিষ্ট্রি-অফ সাপ্লাইয়ের উমেরা রেঞ্জ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক। এবং দেশবাসির হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ড্রাগসের দান গ্রহণ করে রাণী তাঁর সম্মতি জানিয়েছে তার কাছে। এবং দাতাকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এই পর্যন্ত বলে বণ্ড এবারে থামলো।

হ্যাঁ, এম বললেন,—'পিস ইন আওয়ার টাইম—দিস টাইম। সেদিনের কাগজের হেডলাইনের কথা আমার মনে আছে। তা প্রায় বছর খানেক আগের কথা হবে। আর এখন সেই রকেট তৈরীর কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। "দি মুনরেকার"।

সো রিয়েলি ইট ইজ এ ওয়ানডারফুল ষ্টোরি। এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান।

ব্যাট দেয়ার ইজ অনলি য়ুয়ান থিং— এম' তাঁর দাঁত দিয়ে মুখের পাইপটা আবার শক্ত করে চেপে ধরলেন।

সেটা কি স্যার? বণ্ড জিজ্ঞেস করলো।

এম, সম্ভবত মনস্থির করার চেষ্টা করলেন। বণ্ডের দিকে শান্ত ভাবে তাকালেন। তারপর মুখ থেকে পাইপটা সরালেন ধীরে ধীরে।

তাসের খেলায় স্যার হুগো ড্রাগস লোক ঠকায়।

৩

তাসের খেলায় প্রতারণা?

এম, ভ্রুকুটি করে বললেন, তাইতো আমি বলছি। তোমার কি মনে হয় না একজন মালটিমিলোওনিয়ারের এ ভাবে প্রতারণা করাটা বিদঘুটে নয়?

ঠিক বিদঘুটে বলা যায় না স্যার। বণ্ড বললো,— আমি জানি বহু ধনি ব্যক্তি পেসেন্স খেলায় এমন অনেক লোককে প্রতারণা করে থাকে। কিন্তু ড্রাগসের ক্ষেত্রে সে কথা ভাবা যায় না। এ কাজটা তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম।

হ্যাঁ, এটাই একটা পয়েন্ট। 'এম' বললেন—কেন সে এ কাজ করে? সেই কারণটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ভুলে যেও না, আমাদের দেশে তাসের খেলায় কাউকে প্রতারণা করাটা মস্ত বড় একটা ক্রাইম। ড্রাগ্‌স এমন সাবধানে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রতারণা করে যাচ্ছে যে সাধারণের চোখে সেটা ধরার কোনো উপায় নেই। তবে ব্লেঞ্চসের চেয়ারম্যান বেসিলডনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। সে আমার কাছে এসেছিলো। তার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে, আমাদের ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর সাহায্যে আমি কিছু একটা করতে পারি এ ব্যাপারে। এর আগেও আমি তার দু' একটা সমস্যার সমাধান করেছি। তাই সে আমার উপদেশ চাইছিলো। এ কথা সে ক্লাবে জানাজানি হতে দিতে চায় না। তাছাড়া ড্রাগ্‌সকেও সে সাবধান করে দিতে চায় অতি গোপনে। তার পাঁচজনের মতো সে-ও তার ভীষণ ভক্ত। সে চায় না ড্রাগ্‌স কোনো বিপদে পড়ুক, কিংবা তার সম্মানে আঘাত লাগুক। তাই

খুব সাবধানে এবং অতি গোপনে এগুতে হবে এ পথে। আমি কথা দিয়েছি বেসিলডনকে সাহায্য করবো বলে। আর আমি চাই তোমার সাহায্য। আমি বেশ ভালো করে জানি, তুমি একজন দক্ষ খেলোয়াড় তাসের জগতে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যুদ্ধের আগে রুমানিয়ানদের বিরুদ্ধে মন্টি কারলোয় যাওয়ার আগে এই তাসের খেলায় তোমার পিছনে আমি অনেক টাকা খরচ করেছিলাম।

জানি, বণ্ড হাসলো। মন্টি কারলোর কাছে কৃতকার্য হওয়ার মূলে ছিলো সেই অ্যামেরিকান যুবক স্টেফি এসপোশিটো। তাদের খেলায় সে কতকগুলো ট্রিক্স জানতো। মূল্যবান তাসের কার্ডের ওপর মোম লাগিয়ে চিহ্নিত করে রাখতো, কিংবা রেজার দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবে দাগ করে রাখতো। সেই সব চিহ্নিত দাগগুলো খেলার সময় ম্যাজিকের মতো কাজ করতো, কারোর সাধ্য ছিলো না ধরার।

ও, কে এবারেও তুমি নেমে পড়ো এ কাজে। 'এম' বললেন, প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার গেস্ট-নাইটে ড্রাগ্‌স ক্লাবে আসে তাস খেলতে। সে তার পার্টনার মেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসে। মেয়ার হলো তার বিজনেসের দালাল। নাইস চ্যাপ। ওস্তাদ খেলোয়াড়।

ওদের খেলা দেখে হয়তো আমি কিছু বলতে পারবো। বণ্ড বললো।

সেই কথা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। 'এম' বললেন আমার মতে একমাত্র তুমিই উপযুক্ত। আচ্ছা তুমি কি আজ রাত্রে ক্লাবে আসতে পারবে? যে কোনো মূল্যে ভালো ডিনার পাবে। সন্ধ্যে ছ'টার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করছি। তোমার জন্যে কিছু টাকা নিয়ে যাবো। ডিনারের পরে আমাদের একটি কি দুটি রবারের খেলা হবে ড্রাগ্‌স এবং তার বন্ধুর সঙ্গে। প্রতিটি সোমবার তাদের দুজনকে দেখা যায়। তাহলে ঐ কথা রইলো, কেমন?

বাড়ি ফিরে বণ্ড টয়লেট-রুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করলো। তারপর প্রায় মিনিট দশেক পরে সে টয়লেটরুম থেকে বেরিয়ে এলো। তার পরণে এখন দামী সাদা সিল্কের সার্ট, গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার্স। পায়ে পালিশ করা চকচকে জুতো। তাদের প্যাকেট সহ সে তার ডেস্কের ওপর বসেছিলো। ডেস্কের অপর প্রান্তে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাদের খেলার লোক—ঠকানো ট্রিক্‌স সম্বলিত স্করানেশ এর চমকপ্রদ

গাইড। বণ্ড তার পাতায় দ্রুত চোখ বুলোতে থাকে। সাড়ে পাঁচটার সময় সে তাদের জার্ডগুলো সজোরে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বইটা বন্ধ করে দিলো। তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে সে নিজেকে প্রস্তুত করলো বাইরে বেরুনোর জন্যে। গলায় কালো সিল্কের টাই সংযোজিত হলো। বেরুবার সময় সে আয় একবার দেখে নিতে ভুললো না, পকেটে তার চেক বইটা আছে কিনা! এবং দুটো সাদা সিল্কের রুমাল খুব সাবধানে ভাঁজ করে ট্রাউজারের দু' পকেটে রেখে দিলো।

ব্লেডস ক্লাবের গোড়াপত্তন যে কবে হয়েছিলো কেউ বলতে পারে না। বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন ধারণা। তবে বেশীর ভাগ সদস্যদের ধারণা ব্লেডস ক্লাব স্থাপিত হয় ১৭৭৮ সালে, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিবন তখনকার দিনের একজন নাম করা ঐতিহাসিক। ব্লেডসের সদস্যপদ খুব সীমিত। দুশোজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অমায়িক ব্যবহার হওয়া চাই, এবং তাকে এক লাখ পাউনডের ক্যাস সিকিউরিটি অবশ্যই দেখাতে হবে।

ক্লাবের নারী এবং পুরুষ ঝি-চাকরদের মধ্যে প্রায় আধ ডজন সুন্দরী ওয়েটরেশ আছে। ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে পছন্দ করে ক্লাবের পিছন দিকে সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত বেডরুমে নিয়ে গিয়ে রাতের সঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রবেশ ফি বাবদ একশো পাউণ্ড এবং বাৎসরিক চাঁদা বাবদ পঞ্চাশ পাউনডের বিনিময়ে ভিক্টোরীয় যুগের বিলাস বহুল স্বাচ্ছন্দ এবং কুড়ি হাজার পাউনড পর্যন্ত জেতার অধিকার আছে প্রত্যেক ক্লাব সদস্যদের।

এই সব কথা মনে করে বণ্ড ভাবলো, আজ সন্ধ্যাটা তার বেশ আনন্দেই কাটবে তাহলে। তার ওপর আছে স্যার হুগো ড্রাগসের তাসের চালাকী ধরিয়ে দেওয়ার বাড়তি আনন্দ উপভোগ।

কিংস রোড দিয়ে স্লায়ান স্কোয়ারের পথে গাড়ী চালাচ্ছিলো বণ্ড নিজে। তখন ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী ছিলো। মেঘ ভর্তি আকাশ, গর্জন, বিদ্যুতের চমক, বৃষ্টির হুমকি। হঠাৎ সারা আকাশ গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। বণ্ড আচমকা গাড়ী থেকে নেমে হাঁটাপথে খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলো মেঘে ঢাকা আকাশের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখার জন্যে। বণ্ডের মনে পড়ে গেলো অফিসের কথা, অফিসের চিঠি পত্রের কথা। তারপর গাড়ীতে

ফিরে এসে সে আকাশের দিকে তাকালো সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় গাঢ়ো আকাশে এক ভিন্ন লিখন পড়লো সে লেখাগুলো বলতে চাইছিলো, এখানে নরক, এখানে নরক।

৪

ব্লেডস ক্লাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বণ্ড দেখলো, ইতিমধ্যেই তাসের জুয়া খেলা শুরু হয়ে গেছে।

সুইংডোর ঠেলে বণ্ড প্রবেশ করলো একটা পুরোনো ফ্যাসানের ছোট্ট একটা ঘরে। ঘরটা ব্লেডস ক্লাবের অভিভাবক ব্রেভেটর। ইভনিং ব্রেভেট এ্যাডমিরাল কি ভেতরে আছেন? বণ্ড জানতে চাইলেন।

গুড ইভনিং স্যার। ব্রেভেট প্রত্যুত্তরে বলল,—হ্যাঁ, এ্যাডমিরাল কার্ডরুমে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তারপর পেজের দিকে তাকিয়ে ব্রেভেট বলল, পেজ তুমি কমাণ্ডার বণ্ডকে এ্যাডমিরালের কাজে পৌঁছে দাও।

ক্লাবের ইউনিফর্ম পরিহিত পেজকে অনুসরণ করতে থাকলো বণ্ড সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে।

ঘরে খুব একটা ভীড় ছিলো না। 'এম' তখন পেসেন্স খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। পেজকে চলে যেতে বলে বণ্ড কার্পেট সরিয়ে এগিয়ে গেলো। 'এম' এর টেবিলের দিকে!

তাহলে তুমি এসেছো? 'এম' বললেন তারপর চেয়ারটা আর একটু টেবিলের দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা করো বণ্ড, ততক্ষণে খেলাটা আমি শেষ করে নিই। সেই ফাঁকে তোমার জন্য ড্রিঙ্কস এর ব্যবস্থা করে দিই!

নো থ্যাঙ্কস। বলে বনড একটা সিগারেট ধরিয়ে 'এম' এর একাগ্র চিত্তে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে থাকলো। এ্যাডমিরাল 'এম' এর সামনে সে উপবিষ্ট। মত্ত সে তার খেলা দেখতে দেখতে, ভাবতে অবাক লাগে এই 'এম' কাজের সময় কতই না গম্ভীর এবং রাশভারী। এরই হুকুমে তাকে কতবার আচমকা ছুটে যেতে হয়েছে কখনো মালয়ে কখনো বা নাইজেরিয়াতে। সেই

'এম' এখন যেন অন্য এক মানুষ তাঁকে চেনাই যায় না এখন। না কি আসন্ন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি কে জানে?

এক সময় 'এম' তাঁর হাতের তাসগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে একজন ওয়েটারকে ডেকে বললেন পিকেট কার্ডস প্লিজ। পরক্ষণেই সে ফিরে এলো হাতে দুটি পাতলা তাসের প্যাকেট নিয়ে।

'এম' হুইস্‌কি সোড়ার অর্ডার দিলো। বণ্ড ঘড়ির দিকে তাকালো, সাড়ে ছটা বাজে। ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বলল, ড্রাই মারটিনি, আর সেই সঙ্গে ভদকা।

খানিক পরে 'এম' বললেন চলো এবার নীচে যাওয়া যাক। ব্রীজ খেলা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। বেশিলডনের টেবিলে আমাদের লোক এখন খেলছে।

ক্লাবরুমের ভিতরে সারি সারি ব্রীজের টেবিল। যেতে গিয়ে সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় হলো ওদের। অবশেষে ওরা ক্লাবের চেয়ারম্যান লর্ড বেশিলনডনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বণ্ড দাঁড়িয়ে ছিলো স্যার হুগো ড্রাগসের পিছনে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তাকে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল এখন। 'এম' এর কথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। আচ্ছা বেশিল, আমার বন্ধু কমানডার বণ্ডকে তোমার কি মনে পড়ে? আজ সন্ধ্যায় আমরা এখানে এসেছিলাম ব্রীজ খেলার জন্যে।

বেশিলডন বণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসলো। গুড ইভনিং। তারপর অপর তিনজনের দিকে ফিরে সে বলল—এক হলো মেয়ার, ডেয়ারফিল্ড ড্রাগস। তারা তিনজন বণ্ডের দিকে সামান্য একটু সময়ের জন্যে তাকালো। বণ্ড তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলো মৃদু হাসি দিয়ে। আর এ্যাডমিরালকে তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চেনো। বেশিলডন তাঁর পরিচয় লিখিতে আর একটা নাম যোগ করলো।

ড্রাগ্‌স তার চেয়ারটা অর্ধেক হেলিয়ে মৃদু চীৎকার করে উঠলো,—গ্ল্যাড টু হ্যাভ বউ এ্যাবোড, এ্যাডমিরাল। থিঙ্ক?

নো, থ্যাঙ্কস। 'এম' মৃদু হেসে জবাব দিলেন জাস্ট হ্যাভ ওয়ান।

ড্রাগ্‌স এবার বণ্ডের শান্ত নীল চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল—আর আপনার?

নো, থ্যাঙ্কস। বণ্ড সঙ্গে সঙ্গে না করে দিল।

অতঃপর ড্রাগ্‌স টেবিলের ওপর রাখা তার কার্ডগুলো হাতে তুলে নিল। অন্যদের মত ড্রাগ্‌স তার হাতের তাসগুলো সাজায় না। কেবল তাসগুলো আলাদা করে নেয় সে লাল এবং কালোয়। এর ফলে তার পার্শ্ববর্তী খেলোয়াড়দের ক্ষমতা নেই যে, কোন তাসের কার্ড তার হাতে আছে। কারণ সাদা কালোয় মেশামেশি হয়ে গেছে তখন।

বণ্ড একটু দূরে সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সেখান থেকে সে আড়চোখে বেশ ভালো ভাবেই মেয়ারের হাত দেখতে পাচ্ছিল। এবং ডান দিকে ঈষৎ ঘুরলেই দেখা যায় বেশিলডনের হাত। তারপর স্যার হুগো ড্রাগসকে সে অতি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিল, যাতে করে সে না টের পায়, বণ্ড তার প্রতি দৃষ্টি রাখছে। ড্রাগ্‌সের চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা সে। চওড়া বুক, গাম্ভীর্যে ভরা মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সব মিলিয়ে তার চেহারার মধ্যে, কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটা চ্যালেঞ্জের ভাব বর্তমান। তাকে কতকটা সার্কাসের রিংমাষ্টার বলে মনে হয় এক এক সময়।

ড্রাগ্‌সকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বণ্ডের মনে হল, ড্রাগ্‌স যেন খুব সহজেই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। শীতল সন্ধ্যা, তা সত্বেও ড্রাগ্‌সকে ঘামতে দেখা গেল, রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছতে দেখা গেল। ঘন ঘন সিগারেট টেনে যাচ্ছে, যাকে বলে চেইন-স্মোকার। মাঝে মাঝে কার্ডের ওপর সে হাতের নখ দিয়ে আঁচড় দেওয়ার মত কি যেন করে যাচ্ছে সে।

বণ্ড আর একটি সিগারেট ধরাল। তার দৃষ্টি তখন স্থির ড্রাগ্‌সের ওপর। সে তখন ড্রাগ্‌সের তাসের খেলায় অস্বাভাবিক কিছু আবিষ্কারের নেশায় মত্ত। প্রতি খেলায় ড্রাগ স কি করে জিততে পারে, সেই রহস্যের চাবি-কাঠি খুঁজে বের করার জন্যে সে তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, তার চোখের দৃষ্টি এখন সেই কথা বলে দেয়।

আধ ঘণ্টা পরে প্রথম কিস্তির খেলা শেষ হল। এবার নতুন করে আবার শুরু।

ড্রাগ্‌স এবার ম্যাক্সের দিকে ফিরে বলল—এবার তোমার পালা ম্যাক্স তুমি এবার খেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে চল যাতে করে আবার আমার 'রাবার' জিততে পারি। তারপর সে 'এম' এর দিকে ফিরে বলল, স্যরি মিঃ 'এম' আপনাদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে। যাইহোক, ডিনারের পরে তো চ্যালেঞ্জ শুরু হচ্ছে

তাই না? আর ভালো কথা, আপনি সেই ওস্তাদ খেলোয়ারের কথা বলছিলেন, তার নাম কি যেন!

বণ্ড। 'এম' বললেন, জেমস বণ্ড। তার খেলার সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝতে পারবেন! বণ্ডের দিকে ফিরে তিনি তার সমর্থন পাওয়ার জন্যে বললেন কি বল বণ্ড?

বণ্ডের চোখ দুটো কেমন দপ করে জ্বলে উঠল সহসা। কৃত্রিম হাসি হাসল শুধু সে মুখে কিছু না বলে।

তারপর ডিনার টেবিলের দিকে যেতে গিয়ে 'এম' বেশিলডনের কানে মুখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি বুঝছো? এই মরণ-যুদ্ধে গতি-প্রকৃতি কি রকম মনে হচ্ছে তোমার বেশিলডন!

বেশিলডন নীচু গলায় কি যেন বলল, শোনা গেল না। বণ্ড তাদের থেকে একটু দূরে হাঁটছিল বলে তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা শোনা থেকে বঞ্চিত হল।

অনেকক্ষণ পরে বণ্ডকে একান্ত কাছে পেয়ে 'এম' জিজ্ঞেস করলেন—এনি লাক?

ইয়েস। বণ্ড বলল—বেশ ভালোভাবেই সে ঠকাচ্ছে সবাইকে।

আঃ সে তো বুঝতেই পারছি, 'এম' একটু বিরক্ত প্রকাশ করলেন—কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, কি ভাবে লোকটা সবাইকে ঠকাচ্ছে সেটার ব্যাপারে তুমি কিছু জানতে পেরেছো?

হ্যাঁ, সূত্র একটা অবশ্যই পেয়েছি। বণ্ড পাল্টা প্রশ্ন করল—আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, ড্রাগ সের সামনে সব সময় একটা মসৃণ সিলভারের সিগারেট কেস পড়ে থাকে। সেটা এতো বেশী মসৃন এবং চকচকে যে, আয়নার মতো মুখ দেখা যায় তার ওপর। সেই সিগারেট কেসের ওপর নিজের এবং বিরোধী পক্ষের হাতের তাসগুলো যেন স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যার ফলে ড্রাগস তার মসৃন সিগারেট কেসের মাধ্যমে অপর পক্ষের হাত বুঝে নেয় অনায়াসে। এবং তার পার্টনারেরও জেনে নিতে অসুবিধা হয় না ড্রাগস কি কি তাস হাতে পেয়েছে। এই পথেই সে সবাইকে ঠকিয়ে চলেছে, এ ছাড়া অন্য কোনো ট্রিক্স তার জানা নেই বলে আমার বিশ্বাস।

বণ্ডের কথায় লর্ড বেশিলডন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাতে হয়েছেটা কি? ফোরটিন—এইটটিন এর যুদ্ধের পর থেকে তো এ-রকম চিটিংকেস

ধামেশাই চলে আসছে। এ রকম স্ক্যাণ্ডালে কোনো কাজের কাজ হবে না। তাছাড়া লোকটার অদ্ভুত জনপ্রিয়তা আছে। এইসব কারণে দেশবাসী আমাদের কথায় ভুলবে না। কমিটিতে দশজন সদস্য আছে, একমাত্র বণ্ডই তার বিরোধীতা যদি করে তো করবে। কমিটির অন্য সদস্যরা আমাকে বলেছে ড্রাগস ছাড়া 'মুনরেকার' অস্তিত্ব বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। এবং কাগজগুলো ক্রমাগত দেশবাসীদের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে এই বলে যে, এই মুনরেকারের স্থায়ী অস্তিত্বের ওপরেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পর্যন্ত বলে বেশিলডন প্রথমে এম এর দিকে তাকালো, তারপর বণ্ডের দিকে। এর কোন বিকল্প সমাধান আছে কি না সেটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।

বণ্ড সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো, না এই পথেই তার ওপর আঘাত আমি হানতে পারবো। আমি তাকে দেখিয়ে দেবো, আমি তার তাসের অবলম্বন করার পদ্ধতি আমি ধরে ফেলেছি। তারপর আমিও তার পদ্ধতি অবলম্বন করবো, তবে অন্যভাবে। এবং তার তৈরী চালাকীই আমি তার ওপর প্রয়োগ করবো।

কিন্তু তোমার সেই পদ্ধতিটা কি শুনি ? এম জানতে চাইলেন।

বণ্ড সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটি সিল্কের রুমাল টেনে বার করে দেখলো উপস্থিত সবাইকে। আমি মনে করি এই রুমাল দুটিই আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে। এখন আমার প্রয়োজন হলো কয়েকটি প্যাকেট ভর্তি ব্যবহৃত তাস একটি রঙের একটি করে, এবং এখানে দশ মিনিট সময় আমাকে একলা থাকতে দিতে হবে।

॥ ৫ ॥

রাত তখন আটটা। এমকে অনুসরণ করে ব্লেডসের ডাইনিং রুমে প্রবেশ করলো বণ্ড। এম এবং বণ্ড দুটি খালি টেবিল দেখে বসে পড়লো পাশাপাশি ডাইনিংরুম বেশ সুসজ্জিত। ব্লেডস ক্লাবেরই উপযুক্ত। একসময় বণ্ডের দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো সামনের দেওয়ালে সোনালী অক্ষরে লেখা ব্লেডস এর নেমপ্লেটের ওপর। তার নীচে গভীর অরণ্যের ছবি। সেদিকে তাকিয়ে এম বললেন,

মনে করো আমরা এখানে বনভোজনে মিলিত হয়েছি। যে যা খুশি খেতে পারো, কোনো বাধা নিষেধ নেই। যাষ্ট অর্ডার হোয়াট ইউ ফিল লাইফ।

বণ্ড তার পছন্দ মত খাবার এবং ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। স্টুয়ার্ড তাদের দুজনের অর্ডার সার্ভ করতে চলে গেলো।

খানিক পরেই একজন ওয়েটরেশ তাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে টাটকা টোষ্ট এবং মাখনের সিলভার ডিস। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়তেই মেয়েটির কালো স্কার্টের স্পর্শ লাগলো বণ্ডের হাতে। মেয়েটির এমন প্রগলভ ব্যবহার এবং তার নীল চোখের অদ্ভুত চাহনি বণ্ডকে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত করে তুললো। কিন্তু সে কয়েকটি সেকেণ্ড মাত্র। পরমুহূর্তেই মেয়েটি চলে গেলো অন্য আর এক টেবিলে। বণ্ডের মনে পড়লো যুদ্ধের আগে প্যারিসে মেয়েরা কি এ ধরণের চটুল পোষাক পড়ে পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াতো। পুরুষদের দেহ এবং মনে সেই উত্তেজনা অনেকক্ষণ ধরে আলোড়িত হতে থাকতো যতক্ষণ না তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের পশ্চাদদেশ দেখাতো। মনে মনে হাসলো সে, মারথে রিচার্ডসের থিয়োরী সব পাল্টে গেছে এখন।

কথায় কথায় এম জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি অতো স্ট্রং ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিলে কেন বণ্ড? কাজের সময় যদি বেসামাল হয়ে পড়ো শেষে।

ঘাবড়ার কিছু নেই স্যার। বণ্ড বলল, আপনি তো জানেন স্যার, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নামলে আমি আকণ্ঠ মদ পান করে থাকি। আজও আমি তাই করতে চাই। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি আজ ঠিকই কাজ হাঁসিল করে ছাড়বো।

তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তুমি যতো খুশি মদ খেতে পারো এখন।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের প্রিয় মদের বোতল সার্ভ করা হল। গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে এম জিজ্ঞেস করলেন—ড্রাগসকে তোমার কেমন মনে হয় বণ্ড?

একটু সময় কি ভেবে বণ্ড বললো,—তার যা স্বভাব কেউ তাকে পছন্দ করার কথা নয়। প্রথমে আমার খুব অবাক লেগেছিল, কি করে আপনি তাকে এখানে এতোদিন সহ্য করে এসেছেন। কিন্তু আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার অনুমান মতো এ ধরণের লোকেরা যে রকম স্বভাবের হওয়া উচিৎ লোকটা আমার কল্পনা মত হুবহু ঠিক সেই রকমই। অতি নির্মম নিষ্ঠুর এবং শয়তান প্রকৃতির মানুষ সে। তার হাত দিয়ে তাস ধরার ধরণ দেখেই বুঝেছি লোকটার মনে

না আমার তাস খেলার কোন উদ্দেশ্যই নেই। তা না হলে খেলার ছলে কেউ অমন আঙুলের সাহায্যে তাসের ওপর চিহ্নিত করে রাখতো না পরবর্তীকালে ভালো খেলার একটা বাড়তি সুযোগ পাওয়ার জন্যে। কিন্তু আজ রাত্রে আমি তাঁর সব আশা শেষ করে দেবো, দেখবেন। বণ্ড অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো এম এর দিকে তাকিয়ে।

সে আমি জানি। এম বললেন, কিন্তু তার মতো অমন ধুরন্ধর লোককে কাবু করা বড় কঠিন কাজ বণ্ড। তবু তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমি জানি একমাত্র তুমিই এই কঠিন কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই তোমাকেই আমি এই কাজের ভার দিতে এখানে টেনে এনেছি। যাইহোক, এখন তুমি কি ভাবে এগুতে চাও তা কি ভেবে দেখছো বণ্ড?

বণ্ড বলল, ডিনারের আগে আমি আমার সেক্রেটারিকে ফোন করে বলে দিয়েছি, হেড কোয়ার্টারে খবর দিয়ে সে যেন জানিয়ে রাখে আজকের রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে, কিংবা কি ঘটতে পারে, শুভ হতে পারে, আবার অশুভও হতে পারে তাই আগেভাগে খবর দিয়ে রাখা।

এম রহস্যপূর্ণ হেসে বললেন, ইট ইজ ইউর ফিউনারাল। অতএব এই বেলা ভালো—মন্দ যা খাবার খেয়ে নাও হে। তোমার প্রিয় কাটলেট কেমন।

অপূর্ব। বণ্ড হাসলো, তারপর সে কাজের কথায় এলো। বাই-দি বাই আমি জানতে চাই ড্রাগসের খেলার ডাক কতো?

ওয়ান এ্যাণ্ড ওয়ান। এম আরো ব্যাখ্যা করে বললেন রাবার জিতলে একশো পাউণ্ড লাভ হবে।

আই সী। বণ্ডের চোখদুটো চিক্ চিক্ করে উঠলো।

সেই সময় স্যার হুগো ড্রাগস তার সঙ্গী মেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তাদের টেবিলের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে একটু সময়ের জন্যে থমকে দাড়ালো। ওয়েল জেণ্টেলম্যান, ড্রাগস রসিকতা করে বললো,—ভেঁড়াগুলো কি এখনও কসাইখানায় তাদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অপেক্ষায়? অর্থাৎ তোমরা চুপ চাপ এখনো বসে আছো কেন?

এম তার বক্রোক্তির অর্থ বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন—কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। সেই ফাঁকে আপনি কার্ডগুলো গাদা করে রাখুন গিয়ে।

ড্রাগস হাসল। কৃত্রিম সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আপনাদের নেই। যাই

হোক খুব বেশী দেরী করবেন না আপনারা। এই বলে মেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সে ডাইনিং রুমের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

তারপর এম বণ্ডের দিকে ফিরে শেষ প্রস্তুতি হিসেবে জানতে চাইলেন—এনি ফাইনাল প্ল্যানস ?

হ্যাঁ, আমরা গোড়ার দিকে স্বাভাবিক খেলাই খেলবো যতক্ষণ না অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে। আর যখন ড্রাগসের খেলা চলবে তখন আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। দেখতে হবে সে যেন তার হাতের কার্ড বদল করতে না পারে। আচ্ছা আমি যদি তার বাঁ দিকে বসি আপনি কি কিছু মনে করবেন ?

না। এম বললেন—আর কিছু বলার আছে ?

কিছু সময়ের জন্য বণ্ড কি যেন চিন্তা করলো। তারপর বলল,—আর একটা কথা স্যার, সময় এলে আমি আমার কোটের পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করবো। দ্যাট উইল মিন দ্যাট ইউ আর অ্যাবাউট টু ডু।

সেই সময় দয়া করে আপনি আমার ওপর ডাক দেওয়ার ভার দিয়ে দেবেন।

॥ ৬ ॥

ড্রাগস এবং মেয়ার অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে, ঠোঁটে ক্যাবিনেট হ্যাভানাস। তাদের আসতে দেখে ড্রাগস তাসের নতুন প্যাকেট কভারটা ছিঁড়ে ফেললো।

কথা মতো বণ্ড বসলো ড্রাগসের বাঁ দিকে।

এম এর দিকে তাকিয়ে ড্রাগস বললো, ওয়ান এণ্ড ওয়ান ? অর মোর, আমি আপনাদের পাঁচ-পাঁচ যোগান দিতেও রাজী আছি।

এক-একই যথেষ্ট। এম বললেন।

আমার ধারনা, আপনার অতিথি নিশ্চয় জানেন এখানে তিনি কি জন্যে এসেছেন ?

এম এর হয়ে বণ্ড সংক্ষেপে উত্তর দিলো, জানি।

ড্রাগস খুশি হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কতো খরচ করতে পারবেন ?

আমার পকেটে যখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তখন আমি আপনাকে

বলবো। বণ্ড সহসা মনস্থির করে বলল, আপনি খানিক আগে বললেন পাঁচ পাঁচ পাউণ্ড আপনার লিমিট। ঠিক আছে, সেই ভাবেই খেলা শুরু করা যাক। আমিও রাজী।

ড্রাগস অবিশ্বাস্য চোখে তাকালো বণ্ডের দিকে। তারপর এম এর দিকে ফিরে সে বলল, আমার বিশ্বাস, আপনার অতিথি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক পালন করবেন।

বণ্ড লক্ষ্য করলো, এম এর সারা মুখে কে যেন হঠাৎ লালরং ছড়িয়ে দিয়েছে তিনি তখন কার্ডে সাফল দিচ্ছিলেন। একসময় তার হাত দুটো একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো। শান্ত গলায় বললেন তিনি, আপনি যদি আমাকে ওর উপযুক্ত জামিনদার বলে মনে করেন, তাহলে আমার উত্তর হবে হ্যাঁ।

প্রথমে রাবার জিতলেন এম এবং বণ্ড। বিমর্ষ দেখানো ড্রাগসকে। নশো পাউণ্ডের হার হলো এই রাবারে। মনে হয় এখন তাসের পড়তা এম এবং বণ্ডের দিকে।

কিন্তু তার পরেই চাকা ঘুরে গেলো। দ্বিতীয় রাবারের খেলা থেকে ক্রমাগত হার হতে থাকলো এম এবং বণ্ডের। একের পর এক খেলায় জেতার পালা ড্রাগসের। পকেট শূন্য হয়ে আসতে থাকে এম এবং বণ্ডের। ড্রাগসের চোখে-মুখে উল্লাসের ছায়া রাবার জেতার।

অবশেষে সেই চরম মুহূর্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওরা। একটা চরম হতাশা এবং বিপর্যয়ের ঝড় কাটিয়ে ওঠার প্রচণ্ডতম প্রয়াস নিয়ে 'এম' এবং বণ্ড তাদের শেষ খেলা শুরু করল। এই শেষ খেলায় জিততে তাদের হবেই আর এ খেলাতেও হার হলে—তারপরের কথা চিন্তা করতে পারেন না 'এম'। কিন্তু বণ্ড তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তার চোখমুখে একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ।

ওদিকে ড্রাগ্‌সের পার্টনার মেয়ার ভয় পেয়ে বলে ওঠে, এ খেলায় তার নাম না জড়াতে। সে অবসর নিতে চাইলো। কিন্তু ড্রাগ্‌স তাকে ভরসা দিয়ে খেলতে বাধ্য করল।

অবশেষে আজকের শেষ খেলার তাস কেটে দিলেন 'এম'। খেলা শুরু হয়ে গেল অতঃপর।

বণ্ড একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করতে থাকলো, এই খেলাতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটাই উপযুক্ত সময়, সে সোজা হয়ে বসল। তার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। তার মন এখন খুব পরিষ্কার। তাকে এখন

বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল খানিক আগে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার জন্যে। নিজের তাসগুলো সে তুলে নিল ধীরে ধীরে। হাতের তাসগুলোর ওপর চোখ পড়তেই তার চোখ দুটি চক চক করে উঠল সহসা। সাতটা স্পেডস বড় বড় চারটে অনার্স সমেত। সেই সঙ্গে হার্টস এবং ডায়মণ্ডের কার্ডগুলো বেশ উঁচুমানের। ড্রাগসের দিকে তাকাল সে। ওরা কি ক্লাবের সব তাসগুলোই পেয়েছে? ড্রাগস কি সে সুযোগ নিয়ে তার ডাকের ওপর ডাবল দিয়ে অযথা ঝুঁকি নিয়ে ফেলবে! বণ্ড অপেক্ষা করতে থাকল।

ওরা সবাই 'নো-বিড' দিল। একমাত্র বণ্ড চারটে স্পেডস কল দিল। 'এম' তাকে সমর্থন করে পাঁচটা স্পেডসের কল দিলেন।

ইতিমধ্যে বেশিলডন তার খেলা শেষ করে ওদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের এই যুদ্ধক্ষেত্রে কি ঘটছে তা দেখার বণ্ডের স্কোরসীটটা হাতে তুলে নিয়ে সে দেখল। তারপর পড়া শেষে সে মন্তব্য করল—মনে হচ্ছে আজ তুমি চ্যাম্পিয়ান যাচ্ছো বণ্ড।

বণ্ড তার উত্তর ড্রাগসের উপর ছেড়ে দিল নীরব থেকে।

ফিফটীন ফিফটীন। অন মাই লেফট। ড্রাগস বলল।

উত্তরটা শোনা মাত্র বেশিলডনের বুকের ধুকফুকানি শুনতে পেল বণ্ড।

পরবর্তীকালে বণ্ডের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই 'এম' দেখলেন, তার হাতে সেই সাদা রুমালটা ঝুলছে। 'এম'র চোখ দুটি ছোট হল। বণ্ড সেই রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। 'এম' চকিতে একবার ড্রাগস এবং মেয়ারের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ফিরে আবার বণ্ডের দিকে তাকাতেই তিনি দেখলেন সেই রুমালটা সে আবার তার পকেটের ভেতরে চালান করে দিয়েছে।

এখন বণ্ডের হাতে নীল রঙের তাসের প্যাকেটটা দেখা যাচ্ছে। এবং সেই তাস দিয়েই খেলা শুরু করল।

কেউ কোনো কল দিল না। 'নো বিড' দিল। কেবল মাত্র বণ্ডই কল দিল। শেষ পর্যন্ত, সেভেন ক্লাবস। 'এম'-এর দিকে ফিরে বণ্ড বলল, সব ক্ষয়-ক্ষতি এই খেলায় সুদে-আসলে উশুল করে নিতে চাই স্যার। ডোণ্ট ওয়ারি। সারটেনলি উই উইল উইন ইন দিস গেম। বণ্ড বড় বেশী ঝুঁকি নিতে চাইছে এই জুয়া খেলায়। মনে হয় সে খুব বড় হাত পেয়েছে এই খেলায়।

বেশিলডনের মুখটা বড় পেল দেখাচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বণ্ডের হাত যাচাই করার জন্যে সে তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ বণ্ড যথার্থই কল দিয়েছে। জয় তার নিশ্চিত আজকের এই শেষ খেলায়। ফিফটীন ফিফটীন খেলা। এই খেলায় বণ্ড পাবে গ্র্যাণ্ড সাম। ড্রাগস এবং তার পার্টনার মেয়ার ফতুর হতে চলেছে একটু পরেই। বেচারা।

ড্রাগস এবং মেয়ারও সে কথা টের পেয়ে গেছে। ড্রাগস কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মেয়ার তুমি লীড দাও, যাহোক কিছু। সারা রাত এখানে বসে থাকা তো চলে না।

মেয়ারের অবস্থা তখন চরমে! যে কোনো মুহূর্তে ষ্ট্রোক হতে পারে তার।

ওদিকে খেলা চলতে থাকে। সব তাস টেনে নিতে থাকে বণ্ড। ড্রাগসের সারা মুখ ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যায়। শেষে রেগে গিয়ে সে বলে উঠল, বণ্ড ইউ আর চীটিং আস—

বেশিলডন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—এখন কোনো কথা নয়, যা কিছু অভিযোগ কমিটির কাছে করো। খেলায় তোমাদের হার হয়েছে ব্যাস এই পর্যন্ত। এখন ওদের পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে বিদেয় হও তাড়াতাড়ি।

নগদ পনেরো পাউণ্ড তাদের হাতে তুলে দিয়ে ড্রাগস বলল—গুড নাইট জেণ্টল ম্যান। তারপর ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

॥ ৭ ॥

পরে বণ্ড ব্যাখ্যা করে বলল, কি করে সে গতদিনের খেলায় ড্রাগসকে হারায়। আসলে ড্রাগসের সাফল দেওয়া নীল রঙের তাসগুলোর মত একই ধরণের তাস সে এনেছিল। ড্রাগসের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কোনো এক সময় সে বদল করে নেয় তাসের প্যাকেটটা। বণ্ডের নিজের তাসগুলো আগে থেকেই সাফল করা ছিল এমনি ভাবে যে, তার এবং 'এম'-এর হাতে দামী দামী তাসগুলো আসে। চরম মুহূর্তে বণ্ড পকেট থেকে রুমাল বের করে এই লুকোচুরির খেলা খেলে। কেউ টের পায় না তার হাত সাফাইয়ের কাজের। এবং এই পথেই ড্রাগসকে বোকা বানায় সে।

আগের দিন গভীর রাত্রে বিছানায় শুতে গেলেও নিয়ম মত ঠিক সময়েই অফিসে হাজিরা দিল বণ্ড। তার চোখে অনিদ্রার কালো ছায়া। বণ্ডের সেক্রেটারি লোয়েলিয়া পনসোবির দৃষ্টি এড়াল না। সে কেমন কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

বণ্ড কালকের প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য তার সঙ্গে রসিকতা করে বলল—আশাকরি গতকাল সন্ধ্যাটা তোমার বেশ ভালোই কেটেছে আমি না থাকাতে।

অফকোর্স নট। মিস পনসোবি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল। বিশেষ করে গতকাল সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ ডিনারের আগের মুহূর্তে তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে তুমি আমাকে কি চিন্তায় না ফেলেছিলে! পনসোবি অতঃপর হাতের সট্‌হ্যাণ্ড খাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আরো বলল—আধ ঘণ্টা আগে চীফ অফ স্টাফ ফোন করে বলছিলেন, 'এম' আজ তোমাকে চাইছেন। অবশ্য কখন তা তিনি বলেননি।

তাই বুঝি। বলে বণ্ড, দিনের চিঠি-পত্র দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপর এক সময় একটা ফাইলের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, ০০৮-এর কোনো খবর আছে?

হ্যাঁ। সে বলল—তাকে এখন মিলিটারী হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। আপাততঃ দৃষ্টিতে এটাই তার একমাত্র বেদনাদায়ক ঘটনা। বণ্ড জানে এই বেদনাদায়ক ঘটনার অর্থ হলো তার পেশায় একটা বড় রকম আঘাত হানা। এক দিক দিয়ে এটা তার কাছে অত্যন্ত শুভ বলে মনে হলো বণ্ডের। সে মনে মনে হাসল। তারপর তার নিজের অফিস ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল বণ্ড।

ইতিমধ্যেই সোমবার চলে গেছে। আজ মঙ্গলবার। নতুন একটি দিন। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে টপ সিক্রেট ফাইলটা খুলে চোখ রাখতেই দেখল, ইউনাইটেড স্টেটস কাস্টমস ব্র্যাণ্ডের চীফ প্রিভেনটিভ অফিসারের একটা নোটের হেডলাইন—দি ইন্সপেক্টোস্কোপ। সঙ্গে সঙ্গে নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। এটা একটা বেআইনী কাজ কারবার ধরার যন্ত্র। এর নির্মাতা হল সান ফ্রান্সিসকোর সিকুলার ইন্সপেকটোস্কোপ কোম্পানি। আমেরিকার প্রতিটি পুলিশ এবং জেল হাজতে অপরাধীর অপরাধ পরিমাপ করার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আফ্রিকা এবং ব্রেজিলে ডায়মণ্ড স্মাগলারদের ধরার জন্যেও এই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

এরপর বণ্ড নতুন আর এক ফাইলের ওপর চোখ রাখল। ফিলোপন জাপানীস মার্ডার ড্রাগ। টোকিও পুলিশের শতকরা সত্তর ভাগ অপরাধ সেখানে সংগঠিত হয়ে থাকে এই মার্ডার ড্রাগের সাহায্যে। এই ভাবে কোরিয়ানদের দোষারোপ করা হয়ে থাকে। সেখানকার ক্রিমিনালরাও 'ফিলোপন'-এর সাহায্য নিয়ে থাকে প্রায় বেশীর ভাগ ক্রাইমের ক্ষেত্রে।

এই সব ফাইলগুলো দেখতে গিয়ে বণ্ডের মাথা ঘুরে গেল। ক্রাইম এবং সে ধরের ক্রিমিনালদের কাহিনী পড়তে পড়তে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তাদের সম্বন্ধে যতই সে চিন্তা করছে ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন ক্রাইমের পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বণ্ড জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা। ড্রাগসের কথাই ধরা যাক না। অত বড় একজন জননেতা হয়ে কেন, কেন সে অমন জঘন্য লোক ঠকানো তাসের জুয়া খেলায় মেতে উঠল? সে কি একবারও ভেবে দেখেনি, এর ফলে জানাজানি হয়ে গেলে—জনমত তার বিরুদ্ধে যেতে পারে, তার স্বার্থে একটা বড় রকম আঘাত আসতে পারে। তাহলে কেন, কেন সে এতো বড় একটা ঝুঁকি নিতে গেল? কেন, কে সে—

বার বার এই একই প্রশ্ন বণ্ডের মনে উদয় হতে থাকল। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। জানলা পথে রিজেন্ট পার্কের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় হঠাৎই তার মনে হল এবার বোধহয় সে এই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছে। সে ভাবল স্যার হুগো ড্রাগসকে এখন একটা নেশায় পেয়ে বসেছে। দৈত্যাকারের রকেট মুনরেকারের তৈরী নেশাটা তাকে পাগল করে তুলেছে, যার ফলে সে এখন যা খুশি করে যাচ্ছে। যদি সে এই রকেট তৈরী করতে সক্ষম হয় তাহলে এটা একটা দেশের কাছে, দেশবাসীর কাছে আত্মরক্ষা করায় শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠবে এক সময়!

তার এই কৃতিত্বে ড্রাগসের সব অপরাধ ধামা-চাপা পড়ে যাবে। হয়ত এই ভরসাতেই ড্রাগস এমন এক সর্বনাশা নেশায় মেতে উঠতে সক্ষম হয়েছে, বণ্ড খুব মন দিয়ে কথাটা ভাবল। কিন্তু কে বলতে পারে এই লোকটার আসন্ন পতন কতদূর? এমনো তো হতে পারে, সে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছে মুনরেকারকে কেন্দ্র করে। আর সেই স্বপ্নটা যদি সফল না হয় শেষ পর্যন্ত? যদি তার মধ্যে শুধুই ফাঁকি থেকে যায়! আর ড্রাগসই কি ভেবে দেখেছে, এমনো দিন

আসতে পারে যখন সে তার সঙ্গী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে এক টেবিলে মদ খেতে যখন দেখবে তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে সে ভুল পথে চলে এসেছে এতোদিন, তখন সে হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে তার মুখ থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে বের করে নিয়েছে। খুব দেরী হওয়ার আগেই জনগণ তাকে হয়ত খুন করতে উদ্যত হবে। ইয়েস বিফোর ইট টু-লেট্।

টু-লেট। বণ্ড মনে মনে হাসলো। এ ব্যাপারে সে এমন নাটকীয় ভাব দেখালো কেন? কেন সে তাকে এমন ভাবে প্রভাবিত করলো। ড্রাগস কি তাকে পনেরোশো পাউণ্ড উপহার দিলো? বণ্ড স্রাগ করল, এ ক্ষেত্রে ড্রাগসের কোনো হাত থাকার কথা নয়, কিন্তু তার শেষ মন্তব্যটাও ভোলা যায় না। স্পেণ্ড ই কুইকলি, কমাণ্ডার বণ্ড। এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিল সে? কি কি অর্থ হতে পারে তার সেই মন্তব্যের।

জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো বণ্ড। তারপর নিজের ডেস্কের সামনে ফিরে এসে সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে পনেরোশো পাউণ্ডের খরচের একটা খসড়া লিখতে বসলো।

খানিক পরেই লাল রঙা টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠলো প্রতিবাদের ভঙ্গীতে।

বণ্ড তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিয়ে মাউথপীসে মুখ রাখলো।

চীফ অফ স্টাফ কথা বলছি। তুমি কি এখনই চলে আসতে পারো বণ্ড? এম তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

আচ্ছা আসছি। বণ্ড সহসা সতর্ক হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো—এনি ক্লু।

এখানে এলেই সব বুঝতে পারবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। তারপরেই লাইন ডিসকানেকটের শব্দ শুনতে পেলো বণ্ড।

॥ ৮ ॥

কয়েক মিনিট পরে বণ্ডকে তার অতি পরিচিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেল। প্রবেশ পথে সেই পরিচিত আলো। এম তাকে চকিতে একবার দেখে নিয়ে বললেন—তোমাকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে ০০৭। যাই হোক বোসো, তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

বণ্ড বুঝলো, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর। তার পালসের গতি আগের চেয়ে আরো দ্রুত হল। সে দেখল এম পেন্সিলে লিখে একটা নোটের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে কি যেন ভাবছেন। এক সময় সেই লেখাটার ওপর থেকে চোখ তুললেন তিনি।

জানো বণ্ড গতকাল রাত্রে ড্রাগসের প্ল্যান্টে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এম গভীর চিন্তা করে বললেন—জোড়া খুন। পুলিশ ড্রাগসকে খোঁজার চেষ্টা করে। তখন তাদের মনে হয়নি ব্লেডস ক্লাবের কথা। আজ সকালে পুলিশ তাকে রিজে ধরে। মুনরেকার প্লান্টের কাছে একটা পাবলিক হাউসে দুজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়। দুজনেই মৃত। পুলিশের কাছে ড্রাগস বলেছে সে কখনোই অসতর্ক হতে পারে না, তাই সে তাদের অমন নির্দয় ভাবে হত্যা করেছে। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ সে।

অভূতপূর্ব ঘটনা। বণ্ড চিন্তা করে বলল,—কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কি করার থাকতে পারে স্যার? ইজ নট ইট এ পুলিশ জব?

আংশিক। বললেন, এখানে স্বার্থওজড়িয়ে আছে। অনেক জার্মান এক্সপোর্ট সেখানে কর্মরত। তাহলে আমি তোমাকে খুলেই বলি সব। বলে এম বলতে থাকেন—আর এ এক সংস্থার কাজ হচ্ছে প্ল্যান্টের বাইরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিন্তু আমাদের মিনিস্ট্রি অফ সাপ্লাইয়ের কাজ হচ্ছে প্ল্যান্টের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তার ওপর নজর রাখা। হাজার একর জমির মধ্যে প্ল্যান্টের আয়তন মাত্র দুশো একর। এই দুশো একর আয়তনের মধ্যে ড্রাগস এবং আরো বাহান্ন জনের গতিবিধি এখন সীমাবদ্ধ।

অর্থাৎ প্যাকেট ভর্তি বাহান্নটা কার্ড এবং একটি জোকার। অস্ফুটে মন্তব্য করলো বণ্ড।

এর মধ্যে পঞ্চাশ জন হলো জার্মান। 'এম' বলতে থাকেন,—রাশিয়ানরা যা পায়নি এই সব শিক্ষিত এক্সপার্টরা আমাদের এখানে কাজ করতে এসেছে। ড্রাগস এদের মোটা মাইনে দিয়ে এনেছিলো মুনরেকার প্ল্যান্ট কাজ করার জন্যে। এখানে তারা কেউই সুখী ছিলো না। আর এ-এফ এর সিকিউরিটি ফোর্সকে শক্তিশালী করার জন্যে মিনিস্ট্রি অফ সাপ্লাই মেজর ট্যালোনকে নিয়োগ করেছিলো সেখানে। এখানে একটু সময়ের জন্যে 'এম' থেমে আবার বলতে থাকেন,—সেই দুজন নিহত ব্যক্তির মধ্যে সে হচ্ছে একজন। জার্মান তাকে প্রথমে গুলি করে, তারপর সেই জার্মান নিজেকে গুলি করে মৃত্যুবরণ করে।

'এম' চোখ দুটি ছোট করে বণ্ডের দিকে তাকান। বণ্ড কোনো কথা বলে না, সে অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী ঘটনার কথা শোনার জন্যে।

অতঃপর 'এম' তাকে বোঝাতে চাইলেন, কেন আমরা এ ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়াতে যাচ্ছি। দেখ বণ্ড ঘটনাটা ঘটেছে পাবলিক হাউসে। অসংখ্য সাক্ষী ছিলো সেখানে। তারা আমাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে একটা সন্তোষজনক উত্তর চাইবে। কারণ এই সব জার্মানদের ইংলণ্ডে প্রবেশের ছাড়পত্র দিই আমরাই। তাই স্বভাবতই আর-এ-এফ এর সিকিউরিটি সংস্থা এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আমাদের কাছ থেকে জানতে চাইবে, মেজর ট্যালোনের হত্যাকারী সেই জার্মান ব্যক্তিটিকে যাচাই করে আমরা ছাড়পত্র দিয়েছিলাম কি না? ইতিমধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা ছোটখাটো তদন্তও হয়ে গেছে। আর এই জন্যেই এই দুর্গটার বাইরে আমরা থাকতে পারি না আর। তাছাড়া আরো একটা কারণ হচ্ছে, আগামী শুক্রবার তারা প্রথম মুনরেকার এর ট্রায়াল দিতে যাচ্ছে। চার দিনেরও কম সময় হাতে রয়েছে এখন। প্র্যাকটিস স্যুট। 'এম' আবার থামলেন।

এর পরেও বণ্ড নীরব থাকে। সে ভেবে পায় না, এ ব্যাপারে সিক্রেট সার্ভিসেসের কি করনীয়ই বা থাকতে পারে। তাদের যা কিছু কাজ সে তো ইউনাইটেড কিংডমের বাইরে তাহলে? মনে হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ কিংবা এম-আই ৫ সংস্থারই এ ব্যাপারে তদন্ত চালানো উচিৎ। বণ্ড অপেক্ষা করে। সে তার ঘড়ির দিকে তাকায়।

'এম' তেমনি মুখে আলতো ভাবে পাইপ রেখে বলতে থাকেন,—গতকাল রাত্রে ড্রাগস এর প্রতি যে আগ্রহ আমি দেখিয়েছিলাম, ঠিক সেই রকম আগ্রহই আমি দেখাতে চাই এক্ষেত্রেও বুঝলে বণ্ড। ঘটনাটা ঘটে ডোভার থেকে মাইল তিনেক দূরে। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ট্যালোন হুইস্কি পান করে ডিউটি দিতে যায় সেখানে। সেই সময় হঠাৎ সেই জার্মান হত্যাকারী যদি তুমি তাকে হত্যাকারী ভাবেই চিহ্নিত করো। তার সামনে এসে বলে,—গালা ব্রাণ্ডকে আমি ভালোবাসি। তুমি তাকে পেতে পারো না। তারপর সে তার বুক লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের স্মোকিং গানের নলটা নিজের মুখের ভেতরে লাগিয়ে ট্রিগার টিপে দেয়।

উঃ কি ভয়ানক নিষ্ঠুর সেই কাজ! বণ্ড জিজ্ঞেস করলো—সেই মেয়েটি কে?

সেটা আর এক জটিল ব্যাপার। 'এম' বললেন,—স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের এজেণ্ট সে। জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ দোভাষী। ভ্যালান্সের নব থেকে ভালো মেয়ে সে। ড্রাগসের সঙ্গে কর্মরত সে এবং ট্যালোনই কেবল জার্মানির লোক নয়। ভ্যালান্সকে কেমন সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে মনে হয়। ইংলণ্ডে এই মুনরেকার প্ল্যানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে যাচ্ছে। এ সবই ড্রাগসের পরিকল্পনা। আর গালা ব্রাণ্ড ছিলো তার সেক্রেটারি। ট্যালোনের কাজ করতে গিয়ে হয়তো তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে থাকবে গালার। ট্যালোনের বয়স হয়েছিলো যথেষ্ট। গালা তাকে বাপের মতো সম্মান দিতো, এর বেশী কিছু সে চিন্তা করতে পারে না। আর সেই খুনী ইগন বারটস ছিলো ইলেকট্রনিকসের এক্সপার্ট একজন।

আচ্ছা তার বন্ধুরা এ ব্যাপারে কি বলছে? বণ্ড প্রশ্ন করে।

ইগনের সঙ্গে এক ঘরে যে বসবাস করতো সে বলেছে, ইগন, ইগন নাকি গালাকে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলো। ইংরেজ তনয়াকে পাওয়ার জন্যে সে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো।

কিন্তু ভ্যালানসের বক্তব্যই বা কি এ ব্যাপারে?

সে খুব একটা নিশ্চিন্ত নয়। 'এম' বললেন,—সে যাইহোক গালাকে বাঁচাবার জন্যে সে যথেষ্ট চেষ্টা করছে। প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে, যাতে গালার নাম জড়িয়ে কিছু না ছাপে এই জোড়া খুনের ব্যাপারে। ভ্যালানস আশা করছে আজ সন্ধ্যের মধ্যেই ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যাবে।

কিন্তু সেই প্র্যাকটিস স্যুটের খবর কি? বণ্ড জানতে চাইলো।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এক্সপেরিমেণ্ট হতে যাচ্ছে আগামী শুক্রবার দুপুরে। বিস্তারিত খবর দিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রধান মন্ত্রী বেতার ভাষণ দেবেন বলে কথা আছে। এই পর্যন্ত বলে 'এম' এবার থামলেন। তখন ঘড়িতে একটা বাজে। লাঞ্চের সময়। বণ্ড লাঞ্চ মিস করতে চাইলো না। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিলো তার। চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলো সে 'এম' এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে।

এম তার দিকে তাকিয়ে তাঁর কথার জের টেনে বলল—ট্যালোন ছেলেটা খুব কাজের ছিল। তার সার্ভিস রেকর্ড অত্যন্ত ভাল, তার অভাব একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে দেশবাসীর মনে এবং সরকারী মহলে। বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আজই সকাল দশটায় তার দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তাকে চলে যেতে হলো। ক্যাবিনেট মিটিং হয়ে গেছে আজ সকালে। মন্ত্রীদের

ধারণা এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। মুনরেকার প্ল্যান্টটা কার্যকরী হোক তা চায় না আমাদের শত্রুপক্ষরা। আমাদের সরকারের ধারণা এতে রাশিয়ানদের হাত থাকলেও থাকতে পারে। এখানে পঞ্চাশজন জার্মান কাজ করছে। তাদের আত্মীয় বন্ধুরা থাকে রাশিয়ায়। স্বভাবতই তাদের মাধ্যমে আমাদের মুনরেকার প্ল্যান্টের সব খবরা খবর পাচার হয়ে যাচ্ছে রাশিয়ায়। ক্যাবিনেট মিটিং এর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ট্যালোনের জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ করতে হবে জার্মান ভাষায় যার দখল আছে প্রচুর, এবং অন্তর্ঘাতক মূলক কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে তাকে। তাছাড়া রাশিয়ানদের সঙ্গে তার ভালো বন্ধুত্ব থাকা দরকায়। এম-আই-৫ তিনজন ক্যাণ্ডিডেট পাঠিয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী আমার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমি আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি তাকে। অতএব এম সরাসরি বললেন স্যার হুগো ড্রাগসকে তোমার এ্যাপয়েন্টমেণ্টের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সে তোমাকে তার হেডকোয়ার্টাসে আজ রাতের ডিনারে আশা করে থাকবে।

॥ ৯ ॥

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। সেইদিনই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছটার সময় জেমস বণ্ড দেখা করতে এলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সহকারী কমিশনার ভ্যালান্সের সঙ্গে। রোনি ভ্যালান্স বেশ দৃঢ় প্রকৃতির লোক। বণ্ড তার সঙ্গে পরিচয় হতে বুঝল, তার মধ্যে অফিস পলিটিক্সের কোন স্থান নেই কিংবা কারোর প্রতি হিংসা বা অহেতুক ঈর্ষাও নেই। সে চায় শুধু কাজ। আর এখন সেই কাজ—হল বণ্ডকে দিয়ে মুনরেকার প্ল্যান্টে রক্ষা করা। এখন বণ্ডের কাজ হল ভালান্সের এজেন্ট হয়ে মুনরেকার প্ল্যান্টে যোগদান করা সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ফেরার পথে সে এলো মিনিস্ট্রি অফ সাপ্লাই অফিসে। উদ্দেশ্য হল ট্যালোনের রেকর্ড স্টাডি করা। তারপর অপারেশন রুমে গিয়ে প্রফেসার ট্রেনের কাছ থেকে জেনে নিলো মুনরেকার রকেটের গঠন প্রকৃতি এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি, গতিবেগ, ফুয়েল কনজামশন, ইত্যাদি। এক কথায় এই মুনরেকার রকেটের অধিকারী হওয়া মানে ইউরোপের অন্যান্য দেশের কাছে গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে ইংলণ্ড। সবাই তখন তাকে বেশ সমীহ করে চলবে।

ইট ইজ এ ওয়ানডারফুল মেসিন। প্রফেসার ট্রেন আরো বলল,—সে তার আপন খেয়ালে আকাশ পথে উড়ে যাবে। যদি না কেউ তাকে পথে বাধা দিয়ে থাকে। ড্রাগস একটা খুব ভালো জিনিষ আবিস্কার করছে। অদ্ভুত পরিকল্পনা। অবশ্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য সে।

বণ্ড পথ ছোট করার জন্যে সেন্টারবাড়ি ছেড়ে পুরোনো ডোভার রোড দিয়ে গাড়ী চালাতে থাকলো। ঘড়ির দিকে তাকাতে সে দেখলো সাড়ে ছটা। ডোভারে পৌছুতে আরো পনেরো মিনিট, এবং তারপর ডিল রোডে পৌছতে দশ মিনিট। সেখানে অন্য কোনো প্ল্যান থাকলে তৈরী করা যাবে খন। জোড়া খুনের ঘটনা এখন তার হাতের বাইরে। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে গলা ব্রানডকে এখনো পর্যন্ত জেরা কিংবা ডাকাডাকি হয়নি এই কেসের ব্যাপারে। পরের দিন খোঁজ নিতে হবে ট্যালোন বিভাগীয় মন্ত্রীকে সন্দেহজনক কি খবর দিতে চেয়েছিল ? এ ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে কোন ক্লু নেই। ট্যালোনের ঘরে তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাইহোক তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার অফুরন্ত অবসর পাওয়া যাচ্ছে। ডোভারের কাছাকাছি এসে বণ্ড মন দিয়ে গাড়ী চালাতে থাকলো।

দূরে পাহাড় ঘেঁসা আকাশে মেঘের ছায়া। বৃষ্টি আসতে পারে। বৃষ্টি সুরু হওয়ায় আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছতে হবে তাকে।

বার বার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়তে থাকলো বণ্ডের। তাকে সতর্ক হতে হবে মেয়েটির সাথে মিশতে গিয়ে। আচ্ছা সেই মেয়েটি কি তার কোন উপকারে আসতে পারে? এক বছর ধরে সে ওখানকার চীফের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছে। সে নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন খবরা খবর জেনে গেছে মুনরেকার প্রোজেক্টর খবর, এমন কি ড্রাগসের খবরও সে হয়ত দিতে পারে। মেয়েটির কি পছন্দ সে খবরও নিতে হবে তাকে! রেকর্ড সীটে মেয়েটির ফটো দেখে মনে হয় সে খুব সুন্দরী এবং সৌখীন তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অন্তত তাই মনে হল বণ্ডের।

অবশেষে বণ্ড তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো সে সামনের সাইনপোষ্টটা মনে করিয়ে দেয় কিংসটাউনে সে পৌছে গেছে।

তার মাথার ওপর সেই সাংঘাতিক চিত্র,-ওয়ার্লড উইদাউট ওয়াণ্ট। গাড়ী থেকে নেমে সে ওকটা পাবলিক বারের সামনে এল তখন বার বন্ধ ছিল।

ধোয়ামোছার জন্যে তখন বার বন্ধ ছিল। বণ্ড অতঃপর পরবর্তী দরজায় গিয়ে নক করলো। দরজা খুলে যেতেই সে দেখলো, এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক বসে আছে তার হাতে সান্ধ্য পত্রিকা।

বণ্ডের দিকে চোখ পড়তেই সে তার হাতের কাগজটার ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে গিয়ে তাকালো তার দিকে।

ইভনিং স্যার। তার গলায় খদ্দেরকে আপ্যায়নের নরম সুর।

ইভনিং। প্রত্যুত্তরে বণ্ড বলল—বড় সাইজের হুইস্কি এবং সোডা প্লিজ—একটা টেবিলের সামনে বসে সে অপেক্ষা করতে থাকলো মদের জন্যে। একটু পরেই তার ঈপ্সিত বস্তু পরিবেশন করা হলো তার টেবিলে।

আচ্ছা কাল তোমাদের এখানে খুব দুঃস্বপ্নের রাত্রি কেটেছে তাই না? গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বণ্ড জিজ্ঞেস করল।

টেরিবল স্যার লোকটা বলল—এবং আমাদের ব্যবসার পক্ষেও খুব ক্ষতিকারক রাত্রি ছিল গতকাল। আচ্ছা আপনি কি প্রেসের লোক? আই মিন, আর ইউ এ রিপোর্টার!

নো। বণ্ড বলল। নিহত মেজর ট্যালোনের চার্জ বুঝে নিতে আমি এখানে এসেছি। সে কি তোমাদের এখানকার নিয়মিত খদ্দের ছিল?

না। মাত্র একবারই সে এখানে এসেছিলো স্যার এবং সেই তার শেষ আসা এখানে। তবে স্যার হুগো ড্রাগসকে আমি খুব ভাল করে চিনি। লোকটা অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র এবং উদার প্রকৃতির মানুষ।

হ্যাঁ, লোকটা বেশ ভালো। বণ্ড বলল—গতকালের সব ঘটনা কি তুমি দেখেছো?

না, প্রথমে গুলির শব্দ আমি শুনতে পাইনি।

।। ১০ ।।

গেটের মুখে মিনিস্ট্রি পাসটা দেখালো বণ্ড। আর-এ-এফ এর সার্জেন্ট সেটা তাকে ফেরত দিতে গিয়ে স্যালুট করলো! দূর থেকে বণ্ড দেখলো ড্রাগস দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে আরো তিনজন দাঁড়িয়েছিলো। তার মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন সুন্দরী যুবতী।

'আঃ—মাই ডিয়ার ফেলো। ড্রাগস হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা জানালো তাকে। করমর্দন করে সে বলল—খুব শীগগীরই আবার আমাদের দেখা হয়ে গেলো কি বলেন? আমার মিনিস্ট্রিরই আপনি যে একজন স্পাই এ কথা আগে জানলে সেদিন তাস খেলতে গিয়ে আমি তাহলে আরো বেশী সতর্ক হতাম।

তারপর ড্রাগস সেই সুন্দরী যুবতীর দিকে ফিরে বললো—পরিচয় করিয়ে দিই, —আমার সেক্রেটারি মিস ব্রাণ্ড।

অদ্ভুত দুটি নীল চোখের অধিকারিনীর দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেলো বণ্ড। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে উইস করলো সুলভ হাসি হেসে, গুড ইভনিং।

প্রত্যুত্তরে ব্রাণ্ডের চোখে কোনো হাসির ঢেউ উঠলো না। তুমি কেমন আছো? গতানুগতিক প্রশ্ন শুধু। সুনির্বাচিত। এ যেন আর এক লোয়েলিয়া পনসবি। চাপা স্বভাবের অতি বিশ্বস্ত কর্মিনী।

ততক্ষণে ড্রাগস তার ডান পাশে দণ্ডয়মান রোগাটে বয়স্ক লোকটির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়,—আমার ডান হাত ডঃ ওয়াল্টার। লোকটার চোখ দুটি দেখে মনে হয় সে খুব রাগী প্রকৃতির লোক। বণ্ডকে দেখেও যেন দেখছে না। আর, অপর লোকটির দিকে তাকিয়ে ড্রাগস বলে, মাই ডগসবডি, উইলি ক্রেবস।

ড্রাগস আরো বললো ওরা দুজনেই ছিটগ্রস্ত বিজ্ঞানী এবং ক্যারিকেচারেও অভ্যস্ত। এই তাদের পরিচয়। বণ্ড শুকনো হাসি হাসলো তাদের দিকে তাকিয়ে।

গ্লাস ভর্তি মারটিনি হাতে তুলে নিয়ে ড্রাগস বললো,—ঠিক আটটায় আমরা ডিনারে বসবো। এখানে সব কাজ মিলিটারি কায়দায় হয়ে থাকে। উইলি, তুমি কমাণ্ডার বণ্ডের দেখাশোনা করো ভালো করে।

স্টাফেরা যেন ড্রাগসের কাছে শিশু। শিশুর মতো ব্যবহার করে সে তাদের সঙ্গে। তাঁকে দেখে মনে হয় সে যেন নেতা হয়েই জন্মেছে। এমন শক্তি সে পেলো কোথা থেকে? সৈন্য বিভাগে কাজ করতে গিয়ে! কিংবা অগাধ অর্থের বিনিময়ে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ক্রেবসকে অনুসরণ করতে থাকলো ডাইনিংরুমে যেতে গিয়ে।

বণ্ড বসেছিলো ড্রাগস এবং মিস ব্রাণ্ডের মাঝের চেয়ারে। ড্রাগসের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে মিস ব্রাণ্ডের সঙ্গে বেশী আলোচনা করতে চাইছিলো বণ্ড। কিন্তু

প্রতিবারেই সে ব্যর্থ হচ্ছিলো। তার দশ কথার উত্তর সে এক কথায় খুব মেপে মেপে দিচ্ছিলো। তাতে তার মন ভরছিলো না। উপরন্তু সুন্দরী ব্রাণ্ডের প্রতি তার দৈহিক আকর্ষণবোধটা যেন ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিলো। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এক অনাস্বাদিত কামনা বাসনার জ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থামলো বণ্ড। ব্রাণ্ড ড্রাগসের টীমের একজন সদস্যা হলেও সে যখন ড্রাগসের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো তখন সবাই তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর খুব মন দিয়ে শুনছিলো। এবং বণ্ড নিজেও! তার দেহে কোনো অলঙ্কার ছিলো না, কেবল হাতে এক আঙ্গুলে দামী হীরের আংটি ছাড়া। পরণে কালো রঙের ইভনিং গাউন হাঁটুর সামান্য একটু নীচে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। টান টান বুক। পুরুষ্টু। পুরুষের চোখ থমকে যাওয়া বুক। ইচ্ছে হয় কথা না বলে সেখানে মুখ রেখে তার নীল দুটি চোখের তারায় আলো খুঁজে ফেরার। 'ভি' গলার গাউনের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা ডান দিকের বুকের ওপর অবস্থিত তিলটা তাকে ভীষণ কামুক করে তুলছিলো। তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো সে। কিন্তু ড্রাগস এবং ওয়াল্টারের আলোচনায় বাধা পেয়ে ব্রাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর ইচ্ছের ইতি টানতে হলো তাকে আপাতত।

রাত নটার সময় ডিনার শেষ হতে ড্রাগস বললো, এবার আমি আপনাকে মুনরেকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। আপনি এবং ওয়াল্টার আসুন আমার সঙ্গে। এই বলে সে ডাইনিংরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো।

মুনরেকার প্ল্যাণ্টের মূল অবস্থান থেকে একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে ড্রাগস বললো, ওয়াল্টার তুমি এগিয়ে যাও, ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর বণ্ডের দিকে ফিরে অদূরে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বলে,—ঐ যে দুধ-সাদা গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন, ওটার ভেতরেই রয়েছে আমাদের ঐতিহাসিক মুনরেকার। ওটার ওপর স্তম্ভদণ্ডের একটা ঢাকনা আছে। দুই ভাগে বিভক্ত করা গম্বুজটা জলের তোড়ে খোলা হয়ে থাকে। একটা বিরাট টেলিভিশন স্ক্রীন মারফত জানা যায় গম্বুজের ভিতরে কি ঘটছে না ঘটছে। আর একটা টেলিভিশন সেট বসানো হয়েছে রকেটের ওপরে ওঠার ছবি পাঠানোর জন্যে। ফায়ারিং এর সময় এক মাইলের আশে পাশে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না, কেবল মাত্র মিনিষ্ট্রি এক্সপার্ট এবং বিবিসির কর্মচারীরা ছাড়া।

মূল প্ল্যাণ্টের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বণ্ড। ষ্টীলের দরজা। দরজার কবাটে লেখা ছিলো ইংরিজী এবং জার্মান ভাষায়। সাংঘাতিক বিপদ।

লাল আলো জলার কারণ ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। বেল টিপে অপেক্ষা করো। ড্রাগস সেই বেলের সুইচ টিপে ধরলো। এলার্মবেলটা বেজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। কেউ বোধহয় অক্সি-এ্যাসিটাইলেন কিংবা অন্য কোনো দুরুহ কাজে রত। ড্রাগস মন্তব্য করে বললো, ভেতরটা এয়ারকণ্ডিসান। ৭০ ডিগ্রী টেমপারেচার।

একটা লণ্ডড় জাতীয় জিনিষ দিয়ে একজন লোক দরজাটা খুলে দিলো। তার কোট পকেটে রিভলবার ঝুলতে দেখা যায়। ড্রাগসকে অনুসরণ করে বণ্ড সেই ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর তারা আরো ভিতরে এগিয়ে চললো। সামনে তাকাতেই বণ্ড দেখলো সেই ঐতিহাসিক মুনরেকার রকেটটা।

প্রায় সমাপ্ত মুনরেকার রকেটটা যতই দেখছে বণ্ড ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত কীর্তি বিজ্ঞানীদের। মনে হয় বিংশ-শতাব্দীর এটিই সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম দুর্ধর্ষ অস্ত্র। এর তুলনা হয় না। আগামী শুক্রবার এর ওপরই এক্সপেরিমেণ্টাল শট হতে যাচ্ছে।

ড্রাগস বোধহয় তার মনের কথা পড়তে পেরেছিলো। বণ্ডের দিকে ফিরে সে বললো,—এটা একটা খুনের ঘটনা বলেও ধরে নিতে পারেন। ড্রাগস আরো বললো,—চাইল্ড মার্ডার। মার্ডার অফ এ চাইল্ডও বলতে পারেন।

সেই সময় ওয়াল্টার এসে দাঁড়িয়েছিলো তাদের মাঝে। ড্রাগস তাকে জিজ্ঞেস করলো,—তা তোমার কি অভিমত ওয়াল্টার ?

মার্ডার। হ্যাঁ, কথাটা খুবই উপযুক্ত এ ক্ষেত্রে অন্তত। হা-হা-হা—মিনিস্ট্রি এখন খুব খুশী। ওয়াল্টার রকেটের লেজের দিকে নিয়ে গেলো ড্রাগসকে। বণ্ড তাকে অনুসরণ করলো।

দশজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো সেখানে বণ্ডের সঙ্গে। তারা কেমন যেন নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা জানালো তাকে। বণ্ড একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, তাদের মুখের মধ্যে কারোর কারোর কাইজার কিংবা হিটলারের ছায়া। বণ্ড অবাক হয় এখানে সবার মুখে গোঁফ দেখে। এটা একেবারেই অপছন্দ বণ্ডের। এছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট নেই। সবার একই মাপের চেহারা। এই প্রসঙ্গে মৃত জার্মান বৈজ্ঞানিক বারটস এর কথা মনে পড়ে গেলো তার। বারটসের মনের কথাটা আসলে কি ছিলো তা জানতে হবে। সে শুনেছে, হিটলারও শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ের জন্যে আত্মহত্যা করেছিলো।

ড্রাগস তার অফিসের ভেতর নিয়ে এসে বণ্ডকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকলো। সব দেখে শুনে বনড বললো, দেখে তো মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে।

ড্রাগসের মুখের চেহারা লক্ষ্য করলো বণ্ড। তার চোখ দুটো হঠাৎ কেমন ধারালো হয়ে উঠলো। বণ্ড আবার বললো,—আচ্ছা আপনি কি মনে করেন আপনার সেক্রেটারি এবং মেজর ট্যালোনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিলো?

হতে পারে। ড্রাগস সহজ ভাবেই বললো,—সুন্দরী নারী। তার ওপর এক সঙ্গে দুজনের মেলামেশা ছিলো। যাইহোক মনে হয়, বারটসের সঙ্গে গালার হৃদ্যতা ছিলো।

আমি শুনেছি, বণ্ড বললো—আমি শুনেছি বারটস নিজের মুখের ওপর বন্দুকের নলটা স্থাপন করার আগে না কি 'হেল হিটলার' বলে চীৎকার করে উঠেছিলো।

হ্যাঁ কেউ কেউ আমাকে সে কথা বলেছে, ড্রাগস উত্তরে বলে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

তাছাড়া তারা সবই কেন গোঁফ রেখেছে? ড্রাগসের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বণ্ড বললো।

এবার ড্রাগস শব্দ করে হেসে উঠলো—মাই আইডিয়া। তাদের সবার মাথা কামানো এবং প্রত্যেকেরই পরণে সার্ট-প্যান্ট। কে কোন জন চেনা মুশকিল। তাই আমিই ওদের এই বুদ্ধিটা দিই তোমরা গোঁফ রাখতে শুরু করে দাও, এক একজনের এক এক রকম স্টাইলে। তাহলে কাউকেই চিনতে কোন অসুবিধে হবে না।

তাই বুঝি!

মোঃ রোকনুজ্জামান খনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

॥ ১১ ॥

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো বণ্ডের। চিন্তায় রাত্রে খুব একটা ভালো ঘুম হয়নি তার।

দিনের আলোয় এই প্রথম সে ভালো করে দেখলো ঘরটা। বেশ সুসজ্জিত ঘর। কার্পেট বিছানো মেঝে। এই ঘরে তার আগে বসবাসকারীর তেমন কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না সে, কেবল একটা চামড়ার কেসে মোড়ানো বাইনাকুলার, ড্রেসিং টেবিল এবং একটা ফাইল রাখার ক্যাবিনেট ছাড়া। ক্যাবিনেটটা নিশ্চয়ই ট্যালোনের ব্যবহৃত কাগজপত্র থাকলেও থাকতে পারে। লক করা।

বণ্ড জানে এ ধরণের ক্যাবিনেট কি করে খুলতে হয়। টপ ড্রয়ারের লকে একটু চাপ দিতেই খুলে গেলো। ড্রয়ারগুলোর ভেতর থেকে সে পেলো কতকগুলো ম্যাপ, প্রোযেক্টের এবং বিল্ডিং-এর। এর নৌবিভাগ চার্ট নং ১৮৯৫। সেই চার্টের ভেতর থেকে পাওয়া গেলো সিগারেটের কিছু পোড়া ৬াই। সেই চার্ট থেকে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না। সেই সময় ড্রাগসের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো বণ্ড। শব্দই ক্রমশ ওপরে উঠে আসছিলো। কিন্তু আশ্চর্য, ড্রাগস তার ঘরে এলো না। মনে হলো আড়াল থেকে সে বোধহয় তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

বণ্ড তার জন্যে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে অবশেষ ক্যাবিনেটের অন্যান্য ড্রয়ার-গুলো পরীক্ষা করলো। একেবারে নীচের ড্রয়ার থেকে পাওয়া গেলো পঞ্চাশ জন জার্মান নাগরিকের পরিচয় লিপি। সেই পরিচয়লিপি পড়তে গিয়ে দুটি জিনিস সে লক্ষ্য করলো। একটি হলো, তাদের কর্মজীবনে কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, রাজনৈতিক কিংবা ফৌজদার সংক্রান্ত কোনো অভিযোগই লিপিবদ্ধ নেই সেখানে। অপরটি হলো, তাদের ফটোগুলো দেখে বোঝা গেলো কারোর মুখেই গোঁফ নেই।

বণ্ড আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো, সেদিন সেই রাত্রে ট্যালোনের ঘরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেছিলো এবং সে তার ক্যাবিনেটের ড্রয়ার থেকে এ্যাজমিরালিটি চার্ট করে দেখেছিলো। সম্ভবত সেই চার্টটা তেমন কিছু প্রকাশ করতে পারেনি। তাই সে ফেলে রেখে গিয়েছিলো যথাস্থানে। ঐ চার্টে আগন্তুকের হাতের ছাপ রয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ওটাই যথেষ্ট। এবং ঐ রাত্রেই ট্যালোন নিহত হয়।

বণ্ড এ কথাও আবার চিন্তা করলো, বারটসই তাকে খুন করেছে, কিন্তু সে জানে না যে লোকটা ট্যালোনের ঘরে সেদিন রাত্রে প্রবেশ করেছিলো, জানে না লোকটার হাতের ছাপ রয়ে গেছে সেই চার্টটার ওপর। যাই হোক, লোকটাকে সনাক্ত করতে বিশেষ অসুবিধে হবে না, কারণ এখানকার প্রতিটি লোকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা আছে ট্যালোনের ঐ ক্যাবিনেটে রাখা রেজিষ্টারে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, ড্রাগসের অমন কোন দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো কি করে? সেটাও একটা চিন্তা করার বিষয় বৈকি।

বারটসের 'হেরল হিটলার' বলে মৃত্যুকলীন চীৎকার, জার্মানদের মুখে গোঁফ ধারণ, এ্যাডমিরালিটি চার্ট, ট্যালোনের ঘরের জানলায় রাখা নাইট গ্লাস, ক্রেবস।

এ সব চিন্তাই বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে বণ্ডের মাথার মধ্যে। যাইহোক তার প্রথম কর্তব্য হলো হেডকোয়ার্টার্সে ভ্যালান্সকে তার সন্দেহর কথা জানিয়ে নোট দেওয়া। তারপর ক্রেবসের সম্বন্ধে আরো গভীর ভাবে অনুসন্ধান করা। তারপর মুনরেকার প্ল্যান্টের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তারপর সব শেষে গালা ব্রাণ্ডের সংস্পর্শে এসে তার কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। হাতে খুব বেশী সময় নেই, মাত্র দুদিন। এরই মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। বণ্ড যতটুকু জেনেছে তাতে তার বিশ্বাস, মেজর ট্যালোন মরেনি, মরতে পারে না সে, কারণ গালা ব্রাণ্ডকে সে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতো।

বণ্ড আরো একটা জিনিষ আবিষ্কার করল ট্যালোন ছাড়া তার দলের আরো সাতজন ব্যক্তি এ্যাডমিরালিটি চার্টে সেই অস্বাভাবিক জিনিস লক্ষ্য করে থাকবে। এখন দেখতে হবে, সেই সাত ব্যক্তি কারা? বণ্ড গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে ডোভারের পথে রওনা হল। নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে এসে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড মারফত ভ্যালান্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে। ভ্যালান্স তার বাড়িতে বসে ব্রেকফাস্ট সারছিল। ভ্যালান্স তার কাছ থেকে বিস্তারিত সব শুনে শেষে অবাক হলো এই কথা শুনে গালা ব্রানডের সঙ্গে তার এখনো পর্যন্ত আলাপ না হওয়ার জন্যে। সি ইজ এজ এ ব্রাইট গার্ল, সে আরো বলল যদি মিঃ কে'র মনে কোন বদ অভিসন্ধি থেকে থাকে তাহলে সে কথা নিশ্চয় জানে। এবং রবিবার রাত্রে টি যদি সেই রহস্যজনক শব্দ শুনে থাকে সে কথাও অজানা থাকার কথা নয় গালার। যদিও সে বলেছে, সে এসবের কিছুই জানে না। যাইহোক বণ্ড বলল, চার্টটা সে একটা লোক মারফত ভ্যালান্সের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। বণ্ড আরো বলল, খবর নিয়ে জানতে হবে, গত সোমবার টি কোথায় ফোন করেছিল?

তারপর কাফে রয়ালে ব্রেকফ্রাষ্ট সারতে সারতে বণ্ড দিনের কাগজ এক্সপ্রেস এক্স, টাইমস এর ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখল দি টাইমস গালার ছবি ছাপিয়ে বিরাট একটা আর্টিকেল লিখছে তারা গালাকে নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখছে। তারা গালাকে নিয়ে একটু বেশী মাতামাতি করছে যেন। যাইহোক এই গালা ব্রানডের সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। তার সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে গিয়ে তার পেটের ভেতর থেকে সব কথা টেনে বের করে আনতে হবে। বণ্ড খুব মন দিয়ে কথাটা ভাবলো।

॥ ১২ ॥

অফিসে গালা ব্রানডের সর্ব প্রথম কাজ হলো টেলিপ্রিন্ট যোগে আসা আবহাওয়ার বার্তা পৌঁছে দেওয়া ড্রাগসের কাছে। কারণ মুনরেকারের প্র্যাক্‌টিস শট ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তার দেওয়া আবহাওয়ার সাংকেতিক চিহ্নগুলো কখনোই মনঃপুত হয় না ড্রাগসের। প্রতিদিন ড্রাগস ডঃ ওয়াল্টারের সহযোগিতায় নতুন করে আবাহাওয়ার চার্ট তৈরি করতে বসে যায়। তার মানে ড্রাগস তার দেওয়া ফিগারগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারে না। বাকী সময় ড্রাগসের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গালার কাজ বলতে কিছুই থাকে না। কেবল কয়েকখানা চিঠি টাইপ করা এবং ফাইলিং-এর কাজ ছাড়া।

ড্রাগসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে গালা দিনের চিঠিগুলো তার কাছে পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ড্রাগসের চেয়ারে এখুনি ডাক পড়বে তার। চিঠিগুলো বাঁচাতে গিয়ে মনে পড়ে গেলো আগন্তুক কমাণ্ডার জেমস বণ্ডের কথা। সিক্রেট সার্ভিসে আর পাঁচজন তরুণ অফিসারের মতোই সে একজন। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে তার পরিচিত বন্ধু কিংবা এম ১৪ থেকে কাউকে না পাঠিয়ে বণ্ডকে কেন পাঠানো হলো এখানে? গালা শুনেছে, সিক্রেট সার্ভিসের একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী হলো জেমস বণ্ড। এমন কি এখানকার কেসটা তদারক করার জন্যে প্রধান মন্ত্রী নাকি তাকেই নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে সে যদি কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেমই না করলো তাতে লাভ কি? এখানে গালা তার ভ্যানিটিব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে মুখে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিলো একবার। যতটা সম্ভব নিজের চেহারটা সে আরো বেশী সুন্দর এবং রোমান্টিক করে তোলার চেষ্টা করলো।

স্যার হুগো ড্রাগসের চেম্বার থেকে ফিরে এসে গালা দেখলো, বণ্ড তার চেয়ারে বসে আছে। বণ্ড তাকে সুপ্রভাত জানালো।

গালা কোনো কথা না বলে তাকে একরকম এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বললো, —স্যার হুগো ড্রাগস আপনাকে ডাকছেন।

বণ্ড তার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে বসেছিলো। হঠাৎ ড্রাগসের তলব শুনে অসহিষ্ণু হলো সে। গালা তার মুখের পরিবর্তন দেখে মনে মনে হাসলো।

তারপর সামান্য একটু হেসে বললো—কাম অন। আমার সঙ্গে আসুন। উনি আমাদের দুজনকেই চাইছেন। এই বলে উঠে দাঁড়ালো ড্রাগসের ঘরের দিকে যাওয়ার জন্যে। বণ্ড তাকে অনুসরণ করলো।

ড্রাগস তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললো,—আপনি এখানে এখনো আছেন? আমি ভাবলাম আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রক্ষী বললো আপনি না কি সকাল সাড়ে সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তা কোথায় গিয়েছিলেন?

বণ্ড তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো, আমি একটা টেলিফোন করতে চাই। আশা করি কাউকে আমি বিরক্ত করছি না।

ভালো কথা, বণ্ডকে থামিয়ে দিয়ে ড্রাগস বললো—আমার লোকজন খুবই মুষড়ে পড়েছে গত সোমবার ট্যালোন খুন হওয়ার পর থেকে। আমার ধারনা, আজ আপনি ওদের খুব বেশী প্রশ্ন করে আরো বেশী নার্ভাস নিশ্চয়ই করে দেবেন না। মিস গালা ব্রাণ্ড তাদের সম্বন্ধে আপনার যা জানার সব বলে দেবে। এবং আমার বিশ্বাস তাদের ব্যক্তিগত সব ফাইল ট্যালোনের ঘরেই রাখা আছে। আপনি কি সেই সব ফাইলপত্র দেখেছেন?

ফাইলিং ক্যাবিনেটের চাবী নেই।

স্যরি। বলে ড্রাগস বললো, আমারই ভুল হয়ে গেছে আগে না দেওয়ার জন্যে।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। বণ্ড একটু সময় চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ—ক্রেবস আপনার কাছে কত দিন থেকে আছে?

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

ড্রাগস কি যেন চিন্তা করে উত্তর দিল—ব্রেকস্?

তারপর পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে একটা সিগারেট ধরাল।

বণ্ড অবাক হল তার মুখে সিগারেট দেখে। এখানে কেউ যে সিগারেট খেতে পারে আমার সে ধারণা ছিল না।

হ্যাঁ, আমি খেতে পারি। ড্রাগস দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ঘরটা এয়ারটাইট ওয়ার্কশপের সঙ্গে এখানকার কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক আপনি একটু আগে ব্রেকসের ব্যাপারে কি যেন জানতে চাইছিলেন? ঐ লোকটার সম্বন্ধে আমার খুব একটা ভাল ধারনা নেই। তার ওপর আস্থা রাখা যায় না। এখন আপনি তার খোঁজ খবর নিন। আচ্ছা, তার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট আছে না কি?

নাথিং মাচ। বণ্ড বলল, লোকটাকে দেখে মনে হয় কেমন ফন্দিবাজ যেন। কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই তার ওপর নজর রাখব। তারপর গালার দিকে ফিরে ড্রাগস জিজ্ঞেস করল—এ্যাণ্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ ক্রেবস, মিঁস ব্রাণ্ড ?

উত্তরটা গালা ড্রাগসকেই দিল—লোকটার সম্বন্ধে আমি খুব বেশী কিছু জানি না স্যার। তবে আমি ও লোকটাকে আজ আর একটুও বিশ্বাস করি না। লোকটা প্রায়ই আমার ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করে থাকে।

সে কি! ড্রাগস চমকে উঠে বলল,—এতো দূর এগিয়ে গেছে ক্রেবস ? ঘনো ঘনো সিগারেট টান দিতে গিয়ে কি যেন চিন্তা করে সে।

॥ ১৩ ॥

তখন একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করেছিল। আশ্চর্য, সবার সন্দেহ একটা লোকের ওপর। হঠাৎ বণ্ড বিশ্লেষণ করতে থাকে এর কারণ কি হতে পারে ? ক্রেবস এই গভীর ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু নয় কিংবা সে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এ কাজ করে নি। এবং তাই যদি হয় কোন প্রয়োজনে এ কাজ সে করতে গেল ? এবং মেজর ট্যালোন ও বারটসের মৃত্যুর সঙ্গে এর কি সম্পর্কই বা থাকতে পারে।

সেই নিরবতা ভঙ্গ করল ড্রাগস। ওয়েল দ্যাট টু সেটল ইট। বণ্ডের দিকে তাকিয়ে সে তার সমর্থন আদায় করতে চাইল। বণ্ড কোন মন্তব্য করল না। তাকে আমি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। বণ্ড আরো বলল—আগামীকাল আমি তাকে লনডনে নিয়ে যাব মিনিস্ট্রীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। ওয়াল্টারকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম কিন্তু তার এখানে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ক্রেবসই একমাত্র উপযুক্ত এভিসি'র কাজের জন্য যাইহোক তার ওপর আমাদের সবার তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। বাই দি বাই, বণ্ড জিজ্ঞেস করল, তার কি কোন বিশেষ বন্ধু আছে ?

না, ওয়াল্টার ছাড়া আর কারোর সঙ্গে তার তেমন কোন পরিচয় ছিল না। সে একা একা থাকতেই বেশী ভালোবাসে। আর ভালবাসে ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস পড়তে।

তাই বুঝি!

বণ্ড তারপর প্রসঙ্গান্তরে গেলো, আর মাত্র দু'দিন হাতে আমাদের সময় আছে। এখন আমি আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামের কথা বলব। আজ হচ্ছে বুধবার, বেলা একটার সময় প্রোজেক্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে ফুয়েলিং এবং পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। এসব কাজ আমি নিজে, ডঃ ওয়েণ্টার এবং মিনিষ্ট্রির আরও দুজন দেখাশোনা করবো। টেলিভিশন ক্যামেরা চালু করা থাকবে, কোন ত্রুটি বিচ্যুতি কিংবা বাইরে থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলে সেই টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে ততক্ষণাৎ। কাল সকালে আবার প্রোজেক্ট খুলে দেওয়া হবে দুপুর পর্যন্ত ফাইনাল চেকিং এর জন্যে। মুনরেকারের যাত্রার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত চলবে সেই অনুসন্ধান কার্য। শুক্রবার সকালে আমি নিজের হাতে ট্রায়াল শটের সব ব্যবস্থা করব। বিবিসি থেকে মুনরেকারের যাত্রা পথের ধারাবিবরণী দেওয়া হবে। স্পেশ্যাল ক্যাবিনেট মিটিং এর সদস্যরাই সেই ধারাবিবরণী শুনবে না, রাজপ্রাসাদের লোকেরাও শুনবে, টেলিভিশনে লক্ষ্য করবে মুনরেকারের গতিবিধি!

চমৎকার। বণ্ড উৎফুল্ল হয়ে বলল—সুন্দর ব্যবস্থা। বণ্ড খুশি হয়ে বলল, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, খুব সতর্কতার সঙ্গে মুনরেকারের কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। এখন এখানে আমার করার কিছু নেই এই অল্প সময়ের মধ্যে।

আমি তাই মনে করি, ক্রেবস ছাড়া। আজ দুপুরে সে থাকবে টেলিভিশন ভ্যানে নোট নেওয়ার জন্যে। আপনি বরং মিসেস ব্রাণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে তাকে অনুসরণ করুন। আমার বিশ্বাস আপনাদের দুজনের দুজোড়া চোখ তার ওপর নজর রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। বণ্ডও মনে মনে চাইছিলো গালা ব্রাণ্ডের সঙ্গে কাজ করার জন্যে। তাই সে তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেল। আজ বণ্ডকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তাকে কেমন সহজ সরল বলে মনে হচ্ছিলো। বাদামী রঙের চুল কপালের ওপর লুকোচুরি খেলা খেলছিল। নীল চোখ, সাদা সার্টের আড়ালে তার দুরন্ত যৌবন আরো বেশী লোভনীয় করে তুলেছিল তাকে।

বণ্ড তার ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা খোলা। সে তাড়াতাড়ি বগল থেকে বন্দুকটা নামিয়ে দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। ঘরে ঢুকে সে দেখল ক্রেবস

তার লেদারকেসের তালা খুলতে উদ্যত। বণ্ড সমস্ত ব্যাপারটা চকিতে অনুমান করে নিয়ে দ্রুত তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। ক্রেবসের পিছনে দাঁড়িয়ে সে বেশ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল,—এ সব কি হচ্ছে শুনি ?

স্যার হুগো ছাড়া আমি কারোর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নই। আমাকে প্রশ্ন করার অধিকার নেই তোমার। আমি আমার কাজ করছি !

টেবিলের ওপর থেকে মদের বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে বণ্ড বলল, এই বোতল দিয়ে আঘাত হেনে আমি তোমার চোখের সামনে থেকে দিনের আলো মুছে দেবো।

ক্রেবস মুখ খারাপ করে তাকে অপমান করতে চাইল। বণ্ড রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল এর পর সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। তার ওপর মোক্ষম আঘাত হানার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু ক্রেবস ভীষণ ধূর্ত। পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে পালাবার আগে উল্টে বণ্ডকেই আঘাত করে পালিয়ে গেলো সে। বণ্ডের আঘাত খুব একটা মারাত্মক নয়। তবু সে অবাক হল লোকটার স্পর্ধা দেখে।

তার চিন্তায় বাধা পড়ল একজন খানসামার প্রবেশে। পিছনে পুলিশ সার্জেন্ট। ঘরে ঢুকে সে তাকে স্যালুট করল এবং তার হাতে একটা টেলিগ্রাম তুলে দিল। বণ্ড জানলার সামনে গিয়ে টেলিগ্রামটা পড়তে শুরু করল। বাগসটারের সই করা অর্থাৎ মিঃ ভ্যালান্স পাঠাচ্ছে টলিগ্রামখানা।

ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ সার্জেন্টকে বিদায় জানালো বণ্ড।

টেলিগ্রামের বক্তব্য হল এই যে, মিনিস্ট্রিতে ট্যালোনের ডাক পড়ার খবরটা নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যাক্তি কেউ শুনে থাকবে যার ফলে তার ঘর সার্চ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, এবং যার ফলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বারটস্ ? সে কেন মৃত্যুবরণ করল। তাহলে কি ড্রাগসের স্বার্থেই ক্রেবস তাকে—বণ্ডের থিয়োরী যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হয় এক্ষেত্রে জোড়া খুন ঘটে থাকলেও থাকতে পারে। গোটা মুনরেকার প্রোজেক্টাই যেন একটা বিরাট রহস্যময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

॥ ১৪ ॥

নীল সবুজ ও সোনালী রঙের সংমিশ্রিত অপূর্ব অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছিল তখন। ওরা তখন এসে দাঁড়িয়ে ছিল ফায়ারিং পয়েন্টের কাছাকাছি অদ্ভুত এক নিঃসীম শূন্যতা বিরাজ করেছিল সেখানে। সামনেই ওয়ালমার এবং ডীলের বীচ। সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ। শেষ সূর্য্যের আলো এসে পড়েছিল পশ্চিমের উপকূলে।

তারপর ওরা এসে দাঁড়ালো একটা ফুলের বাগানের সামনে। নাম না জানা বন্য ফুলের সারি সারি গাছ। বণ্ড কোন ফুলেরই নাম জানে না। তার এই অজ্ঞতা দেখে গালার হাসি পেলো। মুক্ত ঝরা হাসি! গালা আজ অপরূপ সাজে সেজে এসেছে তার কাছে। টাইট স্কার্ট তার পরণে, ততোধিক টাইট সার্ট পরিহিত তার বুকের উদ্ধত্যে অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। গালার শরীরটা অসম্ভব লোভাতুর করে তুলেছিল বণ্ডকে। গালাকে হঠাৎ একটা অর্কিড ফুল ছিঁড়তে দেখে বণ্ড বলল, কাজটা ঠিক হল না তোমার। ফুলেদের মানসিক যন্ত্রণার কথা তুমি যদি জানতে তাহলে বোধহয় একাজটা করতে না।

কথায় কথায় ক্রেবসের প্রসঙ্গ উঠতে বণ্ড দুপুরের ঘটনার কথা সব বলল গালাকে। সে আরো বলল, সেই ঘটনার কথা শুনে ড্রাগস নাকি ভীষণ চটে গেছে। আগামী সপ্তাহে ক্রেবসকে তার দেশ জার্মানিতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে সে।

অনেক আগেই তা করা উচিত ছিলে। গালা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, সাংঘাতিক লোক ঐ ক্রেবস।

বণ্ড আরো বলল, এখন আমাদের কর্তব্য হল, কেবল মাত্র ট্যালোন এবং বারটসের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করার দিকে নজর দিলে চলবে না, সেই সঙ্গে মুনরেকার প্রজেক্টারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এবং সেটাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য তাইনা?

গালা কোন কথা বলল না। চুপচাপ সে হাঁটতে থাকলো সমুদ্রের ধার দিয়ে। তার মনে তখন অন্য চিন্তা। সে তখন তার ছেলেবেলার কথায় চলে গিয়েছিল। সামনে সমুদ্র দেখে তার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল জলকেলি করতে। তার পাশেই

রয়েছে শক্তি সমর্থ পুরুষ জেমস বণ্ড। আচ্ছা বণ্ড কি এমন সুন্দর মুহূর্তে তার কাজের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না? ঠিক এই মুহূর্তে সব কিছু ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারে না! বোধহয় নয়।

বণ্ড তাকে নীরব দেখে আবার জিজ্ঞেস করল্—সেই থেকে কি ভাবছো তুমি?

আই অ্যাম সরি। গালা এবার জবাব দিল, আমি অন্য এক স্বপ্ন দেখছিলাম।

কি স্বপ্ন?

সে কথা তুমি বুঝবে না বণ্ড। গালা অতঃপর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল,—হ্যাঁ তোমার কথাই ঠিক বণ্ড, মুনরেকার প্রোজেক্টটা আমাদের রক্ষা করতেই হবে শত্রুপক্ষের হাত থেকে যে কোন মূল্য। এ্যাট এনি কস্ট। তোমার মতো আমিও তাই ফীল করি।

তাই বুঝি! বণ্ড বলল এখন আমাদের দেখতে হবে জলপথে শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমনের দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং তা প্রতিরোধ করা। এ্যাডমিরালটি চার্ট বলছে এখানে না কি বাহাত্তর ফুটের একটা চ্যানেল আছে, সেই পথেই শত্রুপক্ষ এখানে ঢুকে পড়তে পারে। সেই চ্যানেলটা খুঁজে দেখতে হবে আমাকে নিজের নিজের চোখে। আমি এখনই জলে নামতে চাই। তুমিও এসো না আমার সঙ্গে? ঠাণ্ডা জলে স্নান করা যাবেখন? আই অ্যাম ফীলিং ইট আর ইউ নট?

অফকোর্স! আই অ্যাম ফ্রাইটফুলি, হট। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে বেদীংকসটিউম তো সঙ্গে আনিনি কি পড়ে সাঁতার কাটবো বলো? গালা মনে মনে ভাবল পরণের স্কার্ট এবং সার্ট খুলে ফেললে তো অবশিষ্ট থাকে স্বচ্ছ নাইলন প্যান্ট এবং ব্রা। কিন্তু সে কথা সে বণ্ডকে বলতে পারলো না। তবে বণ্ড তার মনের কথাটা অনুমান করে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আমরা দুজন ছাড়া কে এখানে আছে যে দেখতে যাবে। লজ্জা ছেড়ে গা থেকে ওসব খুলে ফেলে এসো জমে নেমে পড়ি।

প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে চলল তাদের সেই জলকেলি। সেই গভীর জলের মধ্যেই বণ্ড প্রায় নিরাবরন দেহ গালার দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কখনো ডুব সাঁতার কখনো বা জলের ওপর ভেসে উঠতে থাকলো। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। নীল আকাশের নীচে নীল জলরাশি। গালার পরণে শুধু এক স্বচ্ছ নাইলনের

প্যান্ট এবং সংক্ষিপ্ত ব্রা। তাও সে দুটো জলের তোড়ে স্থানচ্যুত। নারীর অতি গোপনীয় স্থানগুলো ঈষৎ উদ্ভাসিত তার চোখের সামনে। ইচ্ছে করলে সেগুলো এখন সে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে পারে। হয়ত সেই জন্যেই গালার নরম মাংসল দেহের অতি গোপনীয় স্থানে চাপ দিতে চাইলো বণ্ড।

সেই মুহূর্তে গালা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেল খানিকটা দূরে। মনে মনে ভাবল সে, সিক্রেট সার্ভিসের এই লোকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেও কি করে যে সেক্সের কথা ভাবতে পারে ভেবে পায় না সে। আশ্চর্য।

কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের বীচের ওপর তাদের দুজনকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পড়ে থাকতে দেখা গেল। রোদ্দুরে জল শুকিয়ে নিতে চাইল। অদূরে শুয়ে থাকা গালার প্রায় নগ্ন শরীরের শোভা দেখে বণ্ডের ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো সুন্দরী গালার সারা অঙ্গ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব স্থানে। বণ্ড তাকে কাছে আসতে বলল। গালা কিন্তু একটুও নড়ল না। সেখান থেকেই বলল, কি বলছো ?

আচ্ছা তোমাকে সবাই গালা নামে ডাকে কেন ? নামটার সঙ্গে তোমার দেহের অমন অপরূপ সৌন্দর্যের কোন মিল নেই।

তাই বুঝি ! গালা মৃদু হেসে বলল আমার আসল নাম হল পালাটি।

সেই মুহূর্তে বোমা পড়ার শব্দ হল। পাইলট সম্ভবত ভুল করে ফেলেছে, যার ফলে প্লেনটা রানওয়ের কোথাও গিয়ে আঘাত করে। বণ্ড নিহত হয়নি। কিন্তু মৃত্যু ভয়টা তখনো তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো বার বার। সে সময় বণ্ড আকাশে উড়ন্ত গাংচিল দুটিকে লক্ষ্য করে গালার কথা ভাবছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্ঘটনাটি ঘটলো। ভয়ে আতঙ্কে তার পা দুটো অবশ হয়ে আসছিল। সে কথা বলতে পারছিল না। গালা কেমন আছে ডেকে জিজ্ঞেস করবে সে ক্ষমতাটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছিল তখন। তবু সেই অবশ অসমর্থ মুহূর্তে তার প্রথম চিন্তা হল, বোধহয় মুনরেকারে কোন বিস্ফোরণ ঘটে থাকবে। উঁচু খাড়াই পাহাড়ের দিকে একবার তাকাল সে, পরক্ষণেই তার দৃষ্টি ফিরে গেল সমুদ্রের বুকে। আসন্ন বিপদের কথা তার মনে হল হঠাৎ। মুনরেকার প্রজেক্ট থেকে তারা প্রায় একশ গজ দূরে ছিল। বণ্ডের পিঠে আঘাত লেগেছিল, রক্তও ঝরছিল কেটে গিয়ে। পাথরের টুকরো এসে লেগেছিল তার গায়ে। তার বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাতেই সে দেখল গালা তার বুকের ওপর ঝুঁকে

পড়ে তার ক্ষতস্থানে হাত বুলোচ্ছে। বুকের যন্ত্রণাটা একটু কমলে সে উঠে বসতে গেল, কিন্তু পারল না।

তারও অনেক পরে জড়তাটা সম্পূর্ণ কেটে গেলে পর বণ্ড ভাল করে চোখমেলে দেখল গালা তার চুলের মধ্যে হাতের বিলি কাটছে। এই প্রথম ওরা দুজন দুজনের দিকে ভালো করে তাকাল। ওরা দুজনেই এখন সম্পূর্ণ নগ্ন। দুর্ঘটনার সময় ছোটাছুটি করতে গিয়ে ওদের দেহের প্যান্ট ব্রা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কেউ লজ্জা পেল না কারোর মনেই অন্য কথা উদয় হল না এই মুহূর্তে। কেবল এ ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত হাসি হাসল। কথা বলল না কেউ। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি যেন।

অবশেষে সেই নীরবতা ভঙ্গ করল বণ্ড। ওয়েল বাই গড। দ্যাটওয়াজ ক্লোজ।

কি যে ঘটল, আমি এখনো তা জানি না। গালা আন্তরিক ভাবে বলল কেবল জানি, তুমি এক অদ্ভুত ভাবে আমার জীবন রক্ষা করলে। বণ্ড তার হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বলল, তুমি পাশে না থাকলে আজ আমাকেও মৃত্যু বরণ করতে হতো। আমার মনে হয় বণ্ড, বলতে থাকে, কে বা কারা যেন সেই খাড়াই উঁচু পাহাড়ের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছিল ডিনামাইটের সাহায্যে। কারণ সেখানে আমি দু' তিনটে গর্ত থাকতে দেখেছি। তাছাড়া পাহাড় ভেঙ্গে আমাদের ঘাড়ে পড়ার আগে আমি প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছি কতকটা প্লেন এ্যাক্সিডেন্টের মতো। আমার ধারণা এ কাজ একা ক্রেবসের নয়। এর পিছনে আরো অনেকের হাত আছে। এখন আমার একান্ত জানা দরকার কে বা কারা আমাদের খুন করতে চায়? কারা কারা!

রাত সাড়ে আটটার সময় ডাইনিংরুমে দেখা হল ওদের ড্রাগসের সঙ্গে। তার আগে ডাইনিংরুমে প্রবেশের মুখে ড্রাগসের উচ্চ হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছিল বণ্ড। ড্রাগসের মধ্যে তেমন কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করল না বণ্ড।

ওদিকে বণ্ড গিয়ে বসল ক্রেবসের পাশের চেয়ারে, তাকে লক্ষ্য করার জন্যে। ক্রেবসকে কেমন যেন উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যে কি না কে জানে। বণ্ড যে তাকে লক্ষ্য করছিল ড্রাগস বোধহয় সেটা অনুমান করেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্টারকে ডেকে বলল সে, ক্রেবস যে অসুস্থ সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না ওয়াল্টার? যাক গে সে কথা, ওকে এখন ওর ঘরে ভালো ভাবে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো এখুনি। এই ভাবেই ক্রেবসকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বোধহয়।

তারপর কফি খেতে খেতে বণ্ড জিজ্ঞেস করল, মুনরেকারে ফুয়েলিং-এর কাজ কেমন চলছে ?

একসেলেন্টলি। সব কিছু তৈরী। দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই সাইট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, কাল সকালে বাই কারে মিস ব্রাণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে আমি লণ্ডনে যাচ্ছি। সঙ্গে ক্রেবসও থাকছে। হ্যাভ ইউ গট এনি প্ল্যানস ?

হ্যাঁ, আমাকেও লণ্ডনে যেতে হবে। বণ্ডের কথার মধ্যে কিসের যেন আবেগ ছিল। মিনিষ্ট্রিতে আমার ফাইনাল রিপোর্ট দেবো বলে ভাবছি।

ওঃ রিয়েলি ? ড্রাগস সহজ ভাবে বলল, আমার মনে হয়, এখানকার সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।

হ্যাঁ, বণ্ড কোন মন্তব্য করতে চাইল না।

দ্যাটস অল রাইট। বণ্ড টেবিল ছেড়ে উঠতে গিয়ে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখনি আমার ঘরে ফিরে যেতে চাই। কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে এখানো বাকী রয়ে গেছে।

ও, কে গুডনাইট।

নিজের ঘরে ফিরে এসে বণ্ড দেখল, তার ঘর আবার সার্চ করা হয়েছে তার অনুপস্থিতিতে। কেবল মাত্র ট্যালোনের নাইট—গ্লাসের যে লেদার কেসটা সে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল একটা গোপন জায়গায় তাতে কারোর হাত পড়েনি। আশ্চর্য !

॥ ১৫ ॥

ড্রাগসের মার্সিডিজ লণ্ডন শহরের পথ দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। গালা বসেছিল পিছনের সীটে ড্রাগসের পাশে। সামনে ড্রাইভারের সীটে বসেছিল ক্রেবস। গালার মনে এখন এক মাত্রই চিন্তা, সে চিন্তা হল মুনরেকারকে ঘিরে। আগামীকাল শুক্রবার তার ট্রায়াল শট। অন্তিম প্রস্তুতির কথা ড্রাগস তাকে এখনো পর্যন্ত কিছুই জানায়নি। গালা অবশ্য জানে, ড্রাগসের মনের কথা সব লেখা থাকে তার সেই কালো নোটবুকে ! যেটা সে সর্বক্ষণ তার প্যান্টের হিপ-পকেটে রেখে দেয়। এখন ঐ কালো নোটবুকটা তার চাই। গালা সুযোগ খোঁজে। সুযোগটা এসে গেল মেটস্টোন ট্রাফিকের সামনে গাড়ীটা থামতে। লাল আলো,

গালা তার হাতের রেনকোটটা নিজের এবং পাশে উপবিষ্ট ড্রাগসের কোলের ওপর আলতো করে বিছিয়ে দিলো অতি সন্তর্পণে। সে জানে ড্রাগস যে রাগী লোক, অন্য কোনো গাড়ী তার গাড়ীটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলে উনি ভীষণ রেগে যান এবং জানলা পথে মুখ বাড়িয়ে সেই গাড়ীর ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে মুখ খারাপ করে থাকেন। সেই মুহূর্তে সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। এবং হলও তাই পরমুহূর্তে। গালা হাত সাফাই করে বের করে নিল সে কালো নোটবুকটা ড্রাগসের হিপ-পকেট থেকে। তারপর খানিকটা পথ যাওয়ার পর ড্রাগসকে অনুরোধ করল গাড়ী থামানোর জন্যে কাছাকাছি কোনো হোটেলের সামনে। এখুনি তার একবার টয়লেটরুমে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ড্রাগস ওর কথা রাখল।

টয়লেটরুমে ঢুকে গালা দ্রুত পড়তে থাকল সেই কালো নোটবুকের পাতা উল্টিয়ে। সে কি! গালা চমকে উঠল। মুনরেকার প্রজেক্টের কাজ শুরু হওয়া থেকে সে সেখানে আছে। ড্রাগসের পারসোনাল সেক্রেটারি হিসেবে সে নোট নিয়েছে গোপনে মুনরেকারের প্রতিটি টেকনিক্যাল ব্যাপারে। কিন্তু তার নেওয়া নোটের সঙ্গে এর যে কোন মিল নেই। গালা যতদূর জানে ফায়ারিং এর পরে মুনরেকার রকেটের নামার কথা ফ্রান্সের কোনো এক অঞ্চলে, নর্থ সী থেকে আশি মাইল দূরে। কিন্তু ড্রাগসের নোটবুকে মুনরেকারের অবতরণের জায়গায় লেখা আছে নাইনটি ডিগ্রী। অর্থাৎ ইংলণ্ডের ভিতরে কোন এক জায়গায়। সর্বনাশ! তাহলে ড্রাগস কি সত্যি সত্যি ইংলণ্ড দেশটাকে ধ্বংস করতে চাইছে? সে কি ইংলণ্ডের শত্রু তাহলে! তার এই পরিকল্পনার কথা কি মিনিষ্ট্রি জানে? গালা তেমনি দ্রুত পায়ে ফিরে এল ড্রাগসের গাড়ীতে।

গালা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল ড্রাগসের কোটের পকেটে হাত রাখতে গিয়ে। শকুনির চোখ নিয়ে ক্রেবস তাকিয়ে ছিল তার দিকে। গালা দেখতে পায়নি। ক্রেবসের হাতটা ততক্ষণে সাপের মত ছোবল মেরে দিয়েছে গালার হাতের ওপর। সেই সঙ্গে সে চীৎকার করে উঠল। জার্মান ভাষায় বলল, স্যার গাড়ী থামান, মিস ব্রাণ্ড একজন স্পাই।

সে কি? ড্রাগস রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাল গালার দিকে।

জ্ঞান ফিরে পেতে গালা দেখল, সে একটা বদ্ধ ঘরের ভিতরে শুয়ে আছে। তার একবার মনে হল, বোধহয় সেটা কোন হসপিটাল হবে। না, তার ভুল ভাঙ্গল, সামনে নানান ধরণের মেসিনারী দেখতে পেয়ে। সামনে দাঁড়িয়েছিল

ড্রাগস। সে তখন মৃদু চীৎকার করে ক্রেবসকে হুকুম করছিল, তাড়াতাড়ি কর। এখুনি আমাকে একবার মিনিষ্ট্রিতে গিয়ে সেই সব ব্লাডি ফুলগুলোর সঙ্গে অভিনয় করতে হবে। বলাবাহুল্য ড্রাগস জার্মান ভাষায় কথা বলছিল।

ক্রেবস সঙ্গে সঙ্গে মেসিনগুলো চালু করে দিয়েছিল। ঘরটা ছিল সাউণ্ড প্রুফ তাই এখানকার কোন আওয়াজই এই ঘরের বাইরে কারোর কানে গিয়ে পৌছতে পারল না।

গালা চোখ বুজে পড়ে রইল। আচ্ছা এরা কি তাকে মেরে ফেলতে চায়? কে জানে। মৃত্যুর জন্যে ভয় পায় না গালা। তার মনে এখন সেই একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। নাইটি ডিগ্রী, নাইটি ডিগ্রী। মুনরেকারের অবতরণের স্থান। অর্থাৎ আগামীকাল লণ্ডন শহর ধ্বংস হতে চলেছে।

বণ্ড তার লণ্ডনের প্রিয় রেস্টুরেণ্টে বসে গালার জন্যে অপেক্ষা করছিল কথা মতো। কিন্তু গালা এত দেরী করছে কেন?

এখন আটটা বাজে। গালার দেখা নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল তার। তবে কি গালার কোনো বিপদ হল? বণ্ড উঠে গিয়ে ফোন করল ভ্যালান্সকে।

ভ্যালান্সও তাকে চাইছিল। তার মত সেও সমানে উদ্বিগ্ন গালার জন্যে। ভ্যালান্স বলল, দেখ বণ্ড, মিস ব্রাণ্ডের কোন ক্ষতি হোক আমি তা চাই না। তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ওকে খুঁজে বের করার ভার তুমি নাও। খানিক পরেই প্রাইম মিনিস্টার রেডিওয় ভাষণ দিতে যাচ্ছেন। আগামীকাল মুনরেকারের প্র্যাক্টিস ফ্লাইট হতে যাচ্ছে।

ডোণ্ট ওয়ারি। বণ্ড তাকে আশ্বস্ত করে বলল, এখন বলুন ড্রাগসের গতিবিধি সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি না? আর সে এখানে উঠেছেই বা কোথায়।

সাধারণত সে আজকাল রিজেই থাকে। ভ্যালান্স প্রত্যুত্তরে বলল, ডোভারে যাওয়ার পর থেকে সে তার গ্রসভেনোরের বাড়ি বিক্রী করে দেয়। তবে শুনেছি বাকিংহাম প্যালেসের কাছে ব্রুরি স্ট্রীটে সে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সম্ভবতঃ সে তার সঙ্গিনী মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটায় সেখানে। এনিথিং এলস?

নো নাথিং। ইউ গো এ্যাহেড। বণ্ড বলল, এখন ফোন ছাড়ছি, পরে কোন খবর থাকলে আপনাকে জানাব। সো লং—

অতঃপর বণ্ড ব্লেডস ক্লাবে ফোন করে জানতে পারল, ড্রাগস এখন সেখানে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বণ্ড যখন রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে এসে তার গাড়ীতে স্টার্ট দিল তখন ঘড়িতে আটটা পঁয়তাল্লিশ।

খানিক পরে দেখা গেল ড্রাগসের সাদা রঙের মার্সিডিজ গাড়ীর পিছনে বেশ খানিক দূরত্ব বজায় রেখে বণ্ডের গাড়ী ছুটে চলেছে। মার্সিডিজ গাড়ীর আরোহী দেখা যাচ্ছে মাত্র দুজন। ড্রাগস এবং ক্রেবস। পিছনের সীটে উঁচু মতোন কম্বল চাপা দেওয়া কি যেন পড়ে রয়েছে।

॥ ১৬ ॥

সাদা মার্সিডিজ গাড়ীর পিছনের সীটে কম্বল ঢেকে রাখা হয়েছিল মিস গালা ব্রাণ্ডকে। গাড়ীতে ওঠার সময় তার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ড্রাগস হঠাৎ সজোরে ব্রেক কসাতে তার জ্ঞান ফিরে আসতে থাকল ধীরে ধীরে। এখন তার সব মনে পড়ছে একটু একটু করে। এবুরি ষ্ট্রীটের সেই ছোট্ট বাড়িতে ড্রাগস এবং ক্রেবস তার ওপর সেই সব দৈত্যাকারের মেসিনগুলোর সাহায্যে দৈহিক নির্যাতন করে তার পেট থেকে কথা বের করতে চেয়েছিল, সে কার হয়ে কাজ করছে? কে, কে সে? গালা প্রত্যুত্তরে বার বার একটা কথাই বলেছিল, স্যার হুগোর হয়ে ছাড়া অন্য কারও স্বার্থে কাজ করতে যাবে সে? কিন্তু ওরা তার কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। তার ওপর দৈহিক অত্যাচারের মাত্রা দিয়েছিল আরো বাড়িয়ে। ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে গালাআবার। তারপর চলন্ত গাড়ীতে জ্ঞান ফিরে পেতেই গালা শুনতে পেলো ক্রেবসের কণ্ঠস্বর। স্যার দূরে ঐ পিছনের গাড়ীটা মনে হয় আমাদের ফলো করছে।

ড্রাগস চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওর গাড়ীতে মোক্ষম আঘাত হেনে ওকে খতম করে দিচ্ছি। তারপর ওর ডেডবডি পিছনের সীটে ঐ মেয়েটার পাশে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। যাইহোক, রেডিওর সুইচটা অন করে দাও। যদি কোন গণ্ডগোল বেধে থাকে তাহলে রেডিও নিউজে ধরা পড়তে পারে।

গভীর রাত্রে দেখা যায় মুনরেকার প্রজেক্ট সাইটে একরকম বন্দী অবস্থায় বণ্ড এবং গালাকে। গালা ফিসফিস করে বলল, জেমস, তোমার আঘাত খুব গুরুতর নয় তো? তুমি ভালো আছো তো!

মাথায় সামান্য একটু চোট লেগেছে, ও কিছু নয়। বণ্ড ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছো ?

কোনোরকমে বেঁচে আছি! বলে তারপর গালা সংক্ষেপে সব বলল, ড্রাগসের সেই কালো নোটবুকে লেখা সর্বনেশে পরিকল্পনার কথা থেকে এই মুহূর্তে ওর ওপর নির্যাতনের ঘটনা পর্যন্ত।

বণ্ডকে কাছে পেয়ে গালা ওর দেহের সব বেদনা ভুলে গিয়েছিল যেন। দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে ও বলল, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে হবে জেমস। যে করেই হোক মুনরেকার রকেটের প্রাক্টিস শট বন্ধ করতেই হবে। তা না হলে বুঝতেই পারছো, আমাদের প্রিয় দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে আগামীকাল।

ড্রাগস তার আফস ঘরে প্রবেশ করতেই বণ্ড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ইউ ওণ্ট শট। প্রাক্টিস শট আপনাকে বন্ধ করতেই হবে মিঃ ড্রাগস।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ইংলিশম্যান, তুমি আমাকে অতো দুর্বল ভেবো না। আমার নার্ভ অনেক শক্ত। আমি কোনো কাজে পিছিয়ে আসিনি আজ পর্যন্ত, বুঝলে ? তারপর সে ক্রেবসের দিকে ফিরে হুকুম করল, গো এ্যাহেড ক্রেবস।

ক্রেবস, ড্রাগস হুকুম করল, যেখানে খুশি এদের নিয়ে যাও। তারপর আমাদের পরিকল্পনা মতো—

স্টপ। বণ্ড ঠাণ্ডা গলায় বলল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হয়ে কাজ করছে গালা। এবং আমিও তাই। সঙ্গে সঙ্গে বণ্ড আবার এ কথাও ভাবল, আগামীকাল অপরাহ্নের পর সেই স্কটল্যাণ্ডের অস্তিত্ব আর থাকছে না।

ঠিক আছে ! ড্রাগস জিজ্ঞেস করলো,—আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমরা যে এখানে বন্দী সে কথা আর কেউ কি জানে ? তোমরা কি অন্য কাউকে টেলিফোন করেছো !

বণ্ড একটু সময় চিন্তা করলো। সে যদি হ্যাঁ বলে তাহলে ড্রাগস তাদের দুজনকেই গুলি করে হত্যা করবে এখুনি। তখন মুনরেকার রকেটের প্রাক্টিশ শট রোধ করা সম্ভব হবে না আর। তাই সে অনেক চিন্তা করে বললো—না। যদি করতাম তাহলে তো তারা এখানে চলে আসতো অনেক আগেই।

ইজ ইট ট্রু ? ড্রাগস খুশি হয়ে বললো,—তাহলে তোমাকে নিয়ে আমার আর তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। ক্রেবস, মেসিন বন্ধ করো। আর দেখো

মার্সিডিজ গাড়ীটা ভালো করে ধোয়ার ব্যবস্থা করে ফেলো, যাতে এক ফোঁটা রক্তের দাগও না থাকে!

তারপর বণ্ডের দিকে ফিরে ড্রাগস বলে,—তুমি জানো না, ইংরেজদের কাছে আমি দিনের পর দিন কি ভাবে কাজ করে গেছি। হ্যাঁ, তোমরা আমাকে ব্লুট বলে আখ্যা তো দেবেই। খুব শীগগীর তোমরা ইংলিশম্যানরা জানতে পারবে, অন্তত একজন জার্মান তোমাদের অশেষ উপকার করেছে। তখন আর তোমরা আমাদের ব্লুটস বলে ডাকবে না।

আমার আসল নাম, ড্রাগস বলতে থাকে,—আমার আসল নাম হলো গ্রাফ হুগো ভন ডার গ্রাচ্যে আমার মা ছিলেন ইংরেজ তনয়া। সেই সূত্রে আমার শিক্ষা দীক্ষা সব ইংলণ্ডে বারো বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর এই জঘন্য দেশে অতিষ্ঠ হয়ে আমি চলে যাই বার্লিনে। কুড়ি বছর বয়সে আমি আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস আয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিজে ঢুকি। তখনই আমি কলমবাইট মেটালের সন্ধান পাই, পরবর্তীকালে যেটা আমি এই মুনরেকার প্রজেক্টে কাজে লাগাই। হ্যাঁ যে কথা বলেছিলাম, তার কিছু পরেই আমি পার্টিতে যোগ দিই। আর তখনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ন্যায় যুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্র প্রধান হিটলারকে পরাজয় বরণ করতে হয় সম্পূর্ণ এক অন্যায় যুদ্ধে। যে অন্যায় যুদ্ধের নায়ক ছিলো ইংলণ্ড এবং তার দোসর আমেরিকা। আমাদের দেশের পরাজয়ের গ্লানি আমি ভুলতে পারিনি আজও। বলতে গেলে সেই যুদ্ধ আমার চোখ খুলে দিয়েছিলো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার পরিশোধ আমি নেবোই একদিন না একদিন। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে সুযোগ খুঁজি। তখন আমার প্রয়োজন ছিলো প্রচুর অর্থের। ডাকাতি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করি। সেই অর্থ নিয়ে তানজিয়ানে চলে আসি, সেখানে খুশি মতো ব্যবসা ফেঁদে বসি। সে ব্যবসা হলো কলমবাইট মেটালের। সেই ব্যবসাই আমাকে রাতারাতি বিগ বিজনেস ম্যাগনেট করে তুললো। লণ্ডনে ফিরে এসে দুহাতে অর্থ বিলোই সেখানকার মানুষ এবং সরকারের মন জয় করার জন্যে। এবং বলাবাহুল্য খুব শীগগীর সাফল্য এনে দিলো আমার সেই বিনিয়োগের পরিকল্পনা। ইংলণ্ড তখন আমার পায়ের তলায়। ইংলণ্ড আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। গ্রাচে থেকে আমি হয়ে গেলাম তখন ড্রাগসের। তোমাদের ভাষায় স্যার হুগো ড্রাগস। আমায় এই ধ্বংসাত্মক কাজে সহায়তা করার জন্যে আমি নির্বাচন করলাম আমার অতি বন্ধু ক্রেবস এবং আমার দেশের আরো পঞ্চাশজন বিশ্বস্ত কর্মচারী, জার্মান

অধিবাসী, আর রাশিয়ার ডঃ ওয়াল্টার। তোমরা কেউ বুঝতেও পারলে না আমাদের সেই সর্বনাশ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের খবরাখবর। তোমাদের দেশে বসে তোমাদের অর্থে পুষ্ট হয়ে আমরা তোমাদের ধ্বংস করার জন্যেই মারণ অস্ত্র তৈরী করে যাচ্ছিলাম।

ড্রাগস আরো বলে,—কিন্তু আমাদের সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে যায় তোমাদের সিকিউরিটি অফিসার মেজর ট্যালোন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোক বারটসকে ভার দিই তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। বেচারা বারটস! সে তার দেশের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করলো আমার আদেশে। তাকে আমরা কোনোদিনই ভুলবো না। তারপর তাদের সেই ঘরের ভিতরে বন্দী করে রেখে চলে যাওয়ার সময় ড্রাগস আবার মুখ খুললো,—আশাকরি তোমরা দুজন আর আমাকে কোনো কষ্ট দেবে না। অন্তত মুনরেকার রকেটের প্রাক্‌টিস শট হওয়া পর্যন্ত।

॥ ১৭ ॥

ড্রাগস চলে যাওয়ার পর বদ্ধ ঘরের ভিতর বসে বণ্ড এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে অনেক চিন্তা করলো। কিন্তু কোনো উপায় নেই, ঘরের বাইরে কড়া পাহাড়া। ঘর থেকে বেরুবার লুপহোল খুঁজে পেলো না। আগামীকাল দুপুরে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। গালা বাচ্ছা মেয়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো। বণ্ড তাকে মিথ্যে আশ্বাস দিলো বাঁচার।

বণ্ড আকণ্ঠ মদ খেলো। গালাকেও খাওয়ালো। তারপর গালাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, শোনো গালা, এ ভাবে দেশবাসীর মৃত্যু আমরা দেখতে পারব না। তার চেয়ে আমি তোমাকে মিনিট দশেকের মধ্যে ড্রাগসের বাথরুমে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবো বাইরে থেকে। তারপর সাওয়ারটা খুলে রাখবো তোমার মাথার ওপর যতক্ষণ না বাথরুম পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যায় জলে। তারপর আমি শেষ সিগারেটে টান দিয়ে মুনরেকার রকেটের লেজে আগুন লাগিয়ে দেবো।

জেমস! তুমি কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেছো? ভয়ার্ত চোখে তাকাল

গালা, না তুমি যেও না জেমস আমার কাছ থেকে। আমি মরতে চাই না। আমি এখনো বাঁচতে চাই।

তা আর এখন সম্ভব নয় গালা। বি রেডি! কুইক—

গালা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে যায়। এবার ও রেগে গিয়ে বলে ওঠে,—তুমি যা বলছো আমি তা শুনতে রাজী নই। অন্য কোনো উপায়ের কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের।

কিন্তু কি সে উপায়, তা তো তুমি বলবে গালা?

নিরাপদ কোনো জায়গায় আমাদের লুকোতে হবে, যাতে ড্রাগসের মনে হয়, আমরা কোথাও পালিয়ে গেছি।

পরেরদিন সকালে দেখা গেল ঘর শূন্য। ড্রাগস এবং তার অনুরাগীরা অবাক হয়ে তাকায় ঘরের চারিদিক। কিন্তু গালা বা বণ্ড কাউকেই তারা দেখতে পেলো না। ক্রেবস স্বগোক্তি করলো, ওরা পালিয়েছে স্যার। মনে হয় যে কোনো একটা ভেন্টিলেটার স্যাফ্টের ভিতরে গিয়ে তারা লুকিয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে ক্রেবস বললো,—আমরা পঞ্চাশজন জার্মান আছি, প্রত্যেকে এক একটা স্যাফেট স্টীম হোস ব্যবহার করবো একই সময়ে, দেখি ওরা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারে!

গালা ভয়ে আতঙ্কে সেই ভেন্টিলেটার স্যাফটের মধ্যে বণ্ডকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো দু'হাত দিয়ে। সব লজ্জা ভুলে তার দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো নিজের নরম দেহটা। তারপর সেই যন্ত্রণাকাতর দেহ নিয়ে অপেক্ষা করা আরো আধ ঘণ্টা! আধ ঘণ্টা তো নয় যেন বছরের অর্ধেক সময় সেটা।

॥ ১৮ ॥

বণ্ড তার ঘড়ির দিকে তাকাল, এগারোটা তিরিশ। তারপর ফিরে আবার —এগারোটা পঁয়তাল্লিশ, সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ –

গেট রেডি গালা। বণ্ড চুপিচুপি গালার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল —অনলি ওয়ান মিনিট মোর!

ওরা ততক্ষণে সেই ভেন্টিলেটার স্যাফট থেকে নেমে এসেছিল ড্রাগসের অফিস ঘরের মেঝের ওপর। তার বাথরুম থেকে সাবানের টুকরোটা সংগ্রহ

করে তার কিছু অংগ গালার হাতে দিয়ে বণ্ড বলল, কানের ভেতর গুজে দাও, মুনরেকার প্রাক্টিস শটের সময় প্রচণ্ড শব্দ হবে, সহ্য করতে পারবে না। উঃ সেই মুহূর্তে আমি—ঈশ্বর তুমি আমাদের রক্ষা করো।

গালা হাসল। সেই মুহূর্তে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারো, আমি তাতে খারাপ কিছু ভাববো না।

স্যার হুগোর হাত সুইচের ওপর। ক্রোনোমিটারের দিকে সে লক্ষ্য রাখছিল স্থির দৃষ্টিতে। পরমুহূর্তেই মুনরেকার রকেটের সুইচে চাপ দিয়ে ড্রাগস চীৎকার করে ওঠে, ফায়ার।

বণ্ডের বুক কেঁপে উঠল। ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সে, স্টপ, স্টপ দ্যা নয়েজ।

স্যার হুগো মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে যেতে থাকল ধীরে ধীরে। সমুদ্রের ধারে। মনে হয় এবার সে অদূরে অপেক্ষ্যমান সাবমেরিনে গিয়ে উঠতে চায় তার পরিকল্পনা মতো।

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধে জ্ঞান ফিরে পেল ওরা। ওরা চোখ মেলে তাকাতেই দেখল ঘরের স্টীলের দেওয়ালগুলো হয়তো অত্যাধিক উত্তাপে বেঁকে গিয়ে সে এক অদ্ভুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। গালার চোখ খোলা। বণ্ড দেখল ও হাসছে। কিন্তু মুনরেকার রকেট? কি হল তার? তার লণ্ডন শহরেরই বা কি হল? নর্থ সী! রেডিও স্বাভাবিক। মনে হয় মুনরেকার অন্য কোনো দিক পরিবর্তন করেছে শেষ পর্যন্ত। তাই আশা করা যায় এখন আর কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই। ভয় কেটে গেছে অল্পের ওপর দিয়ে।

এই বিপর্যয়ে এখনো পর্যন্ত দুশো ব্যক্তি নিহত এবং সমসংখ্যক লোক নিখোঁজ। 'এম' বললেন, ইস্টকোস্টে এবং হল্যাণ্ড থেকে এখনো দুর্ঘটনার খবর আসছে। বণ্ড এবং গালা দুজনেই আহত। তবে ওদের আঘাত তেমন গুরুতর কিছু নয়।

এনি নিউজ অফ ড্রাগস সাবমেরিন, স্যার? ক্লান্ত চোখ মেলে তাকাল বণ্ড 'এম'র দিকে।

স্যালভেজ জাহাজ তার খোঁজ পেয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু স্যার হুগো ড্রাগস আর বেঁচে নেই। ট্র্যাজিক লস অফ স্যার হুগো ড্রাগস এ্যাণ্ড হিজ টীম গ্রেট প্যাট্রিয়ট। এডিনবার্গের সলিসিটার্সের কাছ থেকে ড্রাগসের বাণী পাওয়া গেছে। আমি সেটা সংগ্রহ করেছি। 'এম' বললেন, সেটা একটা অভূতপূর্ব দলিল।

গালা কথা মতো ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা করল বণ্ডের সঙ্গে। বণ্ড ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেল বুঝি। বণ্ড ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, বসো। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু বসে না।

গালা সামনের দিকে তাকাল। প্রায় একশো গজ দূরে একটি যুবককে ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

গালা সেই যুবকটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ফিরে আবার তাকাল বণ্ডের দিকে।—আমি ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি বণ্ড। আগামীকাল অপরাহ্ণে। ও হল ডিটেকটিভ—ইন্সপেক্টর ভিভিয়ান।

এতোক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। কিন্তু এর পরেও সে গালার কাছ থেকে সে কি আশা করছে? সে কি ওর সুন্দর পাতলা দুটি ঠোঁটের চুম্বন, দুটি দেহ এক অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তবে গালার হাতের এনগেজমেণ্ট রিংটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, এর পর আর এগুনো ঠিক হবে না। বণ্ড নিজের বোকামোর জন্যে নিজেকে দোষী করল। কি করে সে ভাবতে পারল, এখন ঠিক এই মুহূর্তে তার মনের যে ইচ্ছে, যে কামনা বাসনা তার অংশ নেবে গালাও।

গালা ভয়ে ভয়ে তাকাল বণ্ডের দিকে। বণ্ড হাসি মুখে তাকাল ওর দিকে। আই এ্যাম জেলাস। বণ্ড তেমনি হাসতে হাসতে বলল, তোমার সঙ্গে কাল রাত্রে আমার একটা আলাদা প্রোগ্রাম করার ইচ্ছে ছিল।

গালার ঠোঁটে দুষ্টুমি ভরা হাসি। কি সেই আলাদা প্রোগ্রাম শুনি?

বণ্ড কোন ভূমিকা না করেই বলল, ভাবছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এই এক মাসের ছুটিতে ফ্রান্সে পাড়ি দেবো।

গালা প্রথমে শব্দ করে হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, দুঃখিত তোমার ইচ্ছের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না পারার জন্যে, যাইহোক আরো অনেক মেয়ে তো তোমার জন্যে পাগল। তাদের মধ্যে থেকে কাউকে পছন্দ করলেই তো পারো।

হ্যাঁ আমিও তাই মনে করছি। বণ্ড প্রত্যুত্তরে বলল, ওয়েল, গুডবাই গালা। সে তার হাত বাড়িয়ে দিল গালার দিকে। শেষবারের মতো বণ্ড ওকে স্পর্শ করল। তারপর ওরা পরস্পর ছেড়ে দুজনে দুটি ভিন্ন পথের দিকে পা বাড়াল।

জেমস্ হেডলি চেজ

কামনার দংশন

তাড়া খাওয়া খরগোসের মত ঢুকল রীমা। ভিজে সপসপ করছে গা। কেবিনের চেয়ারে এমন ভাবে বসল যেন প্রাণহীন দেহ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কালো চাঁদোয়ার আকাশে। আমি পিয়ানোয় বসে চপিন-সুর বাজাচ্ছিলাম। বারের মধ্যে মাত্র দুজন মদ্যপ। রাষ্টি বারের পিছনে গ্লাস মুছছিল। বুথে বসে রেসিং সিট পড়ছে একাগ্র হয়ে নিগ্রো ওয়েটার স্যাম। মেয়েদের বারে একা আসতে দেখলে মাথা গরম হয়ে যায় রাষ্টির। অন্যদিন হলে কুকুরের মত তাড়িয়েই দিত। কিন্তু আজ বাজার মন্দা বলে মাথা গরম করেনি।

একটা কোকাকোলা অর্ডার দিয়ে পাতলা রক্তিম আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বালাল সিগারেট। চোখ দুটো ঘুরছে দুই মদ্যপের দিকে।

পিছন ফিরে পিয়ানো বাজাচ্ছিলাম বলে রীমাকে দেখতে পাইনি। হঠাৎ ওর আর্তচীৎকারে তন্ময়তা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। চকিতে ঘুরলাম, দেখলাম-বারের দরজাটা হাট করে খুলে গেছে। লম্বালম্বি সরলরেখার মত একটি চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে রীমার দিকে চোখ পড়ল। বয়স আঠারো হব হব করছে। রূপোর মত পালিশ করা চুল—বড় বড় চোখ—তার মাঝে সমুদ্র নীল তারা। পরনে রক্ত লাল সোয়েটার—আটোসাটো হয়ে বসেছে এমন, বুকের চুড়ো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার সঙ্গে ম্যাচ করানো অন্ধকারের মত কালো স্ল্যাকস।

চিৎকারের শব্দ ক্রমশঃ কান্নায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে শরীর। বড় বড় পালিশ করা নখ আচড় কাটছে দেওয়ালে। লোকটার সারা মুখে দুঃসপ্নের ঘোর। যেন রাত কেটেছে অনিদ্রায়—রক্তহীন

সাদা লাশের মত শরীর। বয়স আনুমানিক চব্বিশ। চোখে বিশ্রী এক অস্থিরতা নাচানাচি করছে। গায়ের জামা প্যান্ট দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে মেঝেতে।

স্থির হয়ে দেখল রীমাকে তিন কি চার সেকেণ্ড। নাকের পাটা ফুলছে বেলুনের মত। মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ বেরিয়ে এল। রাষ্টি, দুই মদ্যপ এবং আমি ওকে দেখছি একত্রে। বিদ্যুত গতিতে ওর হাত হিপ পকেটে চালিয়ে দিল, বের করল দশ ইঞ্চি লম্বা একটা চাকু। বিজলীর মত ঝিলিক দিল আলো পড়ে। এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটার দিকে মুখের বিশ্রী শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর শুরু করেছে।

স্যাম ভয়ে টেবিলের তলায় ঢুকে গেছে। চুপচাপ বসে মেয়েটাকে মরতে দিতে চাই না, একটা কিছু করতে হবে এই ভেবে বুটের মুখ দিয়ে চেয়ারটাকে একটা গোত্তা মেরে সরিয়ে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়ালাম।

চাকু তুলবার আগেই হাত চালিয়ে দিলাম। ঘুষি আছড়ে পড়ল মাথার মাঝখানে। টলে গেল। তৎক্ষণে ব্যাটা চাকু চালিয়ে দিয়েছে। আস্তিন চেপে বসে পড়েছে রীমা। ধাক্কা সামলে নিয়েছে। টলে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখেও যেন দেখছেনা, ওর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। রীমার সামনা-সামনি হতেই থুতনিতে ঝাড়লাম বিরাশি সিক্কার ঘুষি। পা হাওয়ায় দোল খেয়ে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল ঝকঝকে মেঝেতে। কিন্তু রক্ত মাখা চাকু হাত থেকে ছুটে যায়নি। মুঠোয় এখনও শক্ত করে ধরে রেখেছে হাতিয়ারটা। লাফ দিয়ে সরে এলাম। পরমুহূর্তে পা দিয়ে কব্জিতে লাথি ঝাড়লাম। মুখ দিয়ে একটা মিহিন চিৎকারের সণে মুঠো থেকে ছুটে গেল চাকুটা।

সাপের মত ফুসে, উঠে দাড়াল। রীতিমত একটা ভল্ট খেয়ে মুখোমুখি হল আমার। আমি আবার আঘাত হানবার আগেই কণ্ঠনালী চেপে ধরে কুকরের মত কামড় বসিয়ে দিল গলার নীচে। লম্বা নখ দিয়ে চিড়ে দিচ্ছে গাল, চোখের কোল, কপাল। অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলাম আড়াই মনি পাঞ্চ। আছাড় খেয়ে পড়ল, শুণ্যে একবার ডিগবাজি খেয়ে। কয়েকটা টেবিল গেল উল্টে—গ্লাস ভাঙ্গল গোটা দশেক। হাঁপড়ের মত উঠছে নামছে ছোকরার বুক।

ততক্ষণে রাষ্টি পুলিশে টেলিফোন করে দিয়েছে। রীমার হাত বেয়ে রক্ত ঝরছে টপটপ করে। শরীর কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে—বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখছে আমায়।

রীমার পাশে হাটু গেড়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম—দেখি কতখানি কেটেছে?

—কিছু হয়নি। নাক কোঁচকালো রীমা।

হাত ধরে টেনে তুললাম রীমাকে। পা কাঁপছে থরথর করে।

ইতিমধ্যে আবার বারের দরজা হাট করে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল দুজন পুলিশ। রাষ্ট্রি ইশারা করল একজন পুলিশকে। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ছোকরার দিকে এগিয়ে গেল একজন পুলিশ। জুতোর গোড়ালি দিয়ে গোত্তা মারল শরীরে।

—সামলে। আমি বললাম। - দম নিচ্ছে।

ছোকরার হুঁশ এসেছে। জিমন্যাষ্টদের মত ভল্ট খেয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তে লাফিয়ে হাতের মুঠোয় ধরল একটি জলের কুঁজো। চালিয়ে দিল পুলিশটার মাথা লক্ষ্য করে। টুকরো হয়ে গেলো মাটির কুঁজো। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে পুলিশটা কাটা গাছের মত। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল রীমার দিকে। চোখে আগুনে দৃষ্টি। ছোকরার হাতে কুজোর ভাঙ্গা মাথা। আমি রীমার দিকে ঝুঁকে ছিলাম। সেই ক্ষণে অসহায় আমি। দ্বিতীয় পুলিশটা না থাকলে সেই দিনই হয়ত আমায় যমের বাড়ী পৌঁছে দিত ছোকরা।

দণ্ডায়মান পুলিশটা হাতের লাঠিটা শূন্যে তুলিয়ে ঘা মারল মাথার পিছনে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল কুজোর মাথা। লুটিয়ে পড়েছে সান বাঁধানো মেঝের উপর। এর মধ্যে এসে গেছে এমবুলেন্সের লোকজন, পুলিশ অফিসার। আহত ছোকরাকে ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল এ্যাম্বুলেন্স। পুলিশ সার্জেন্ট হ্যামণ্ড এগিয়ে এল রীমার দিকে। রীমা কাটা হাতে আঙ্গুলের পরশ লাগাচ্ছিল।

—কি ব্যাপার, সিষ্টার! হ্যামণ্ড প্রশ্ন করল। কি নাম তোমার?

—রীমা। রীমা মার্শাল। আমি কান পেতে ওদের কথোপকথন শুনছি।

—কোথায় থাকা হয়?

—সিংগারস হোটেল। (ওয়াটার ফ্রান্টের কাছে এক রদ্দি হোটেল)

—কাজকর্ম্ম কি করা হয়?

মাথা তুলে তাকাল। কণ্ঠে উদাসীনতা।—প্যাসিফিক ষ্টুডিওয়র একষ্টা।

—ঐ নেশুড়ে উল্লুকটা কে?

—উইলবার বলে জানি। পুরো নাম জানি না।

—তোমায় খুন করতে চাইছিল কেন?

এক মিনিট চুপচাপ। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। আপনারা ন্যুয়র্ক পুলিশ থানায় খোঁজ করলে উইলবারের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ পাবেন, পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হ্যামণ্ডের চোখ নেকড়ের মত জ্বলে উঠল। একজন পুলিশকে ইশারা করে বলল—একে এর হোটেলে পৌঁছে দাও।

রীমা বৃষ্টির মধ্যে বেরুল। পিছনে ডাণ্ডা হাতে পুলিশ।

—বসো। একটা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বলল। তোমার নাম ?

—জ্যাক গোর্ডন।

এটা আমার আসল নাম নয়। হলিউডে এসে আমি এই নাম নিয়েছি।

—কি হয়েছে এখানে, বলো ?

আদ্যপ্রান্ত সব শুনিয়ে দিলাম।

—এর আগে কখনও মেয়েটাকে দেখেছো ?

—না।

—মাথায় আসছে না ঐ সুন্দরী মেয়েটা উল্লুকটার কাছে এক সঙ্গে ছিল কি করে ? বুদ বুদ করতে করতে পুলিশকে ইশারা করে—সার্জেন্ট হ্যামণ্ড বৃষ্টির মধে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনা, হিটলারের জঙ্গী শাসনের কয়েক বছর বাদের কথা। তখন আমার বয়স মাত্র একুশ। কম্বাল্টিং ইঞ্জিনীয়ারীং-এর শেষবর্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেনাবাহিনীর ডাক আমায় হাতছানি দিচ্ছে। বাবাকে বললাম। বাবা রাজী ছিলেন না। ছ'মাসের মধ্যেও আমি নিজেকে পরীক্ষার জন্য তৈরী করতে পারলাম না।

চার মাস পর, বাইশ বছরে আকিনাওয়া সমুদ্র তটে সেনাবাহিনীর হয়ে পা রাখলাম। সেই সময় এক দুর্ঘটনায় আমার দেহে এক-ইঞ্চি পরিমাণ একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল। ছ'মাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, প্লাষ্টিক সার্জারীর দৌলতে আমার আঘাত মেরামত করে দেওয়া হল। কিন্তু ডান গালে কাঁটা তারের মত একটা দাগ রয়ে গেল আর ডান চোখের পাতা ঈষৎ ঝুকে পড়েছিল।

আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। বাবা এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। টাকা পয়সা বেশী ছিল না, কিন্তু পড়াশোনার জন্য টাকা খরচ করতে কার্পন্য করেন নি। আবার কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু যুদ্ধের দামামা আমার মনে গেঁথে গেছে। ভাল লাগল না পড়াশোনায়। কলেজ ছেড়ে দিলাম। বাবা

হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন, আমায় নিরাশ না করে বললেন—অলরাইট জ্যাক। তুমি ঘুরে এসো। তোমায় দু'শ' ডলার দিচ্ছি। খাও, দাও, আড্ডামারো, মন খুশ করে ফিরে এসে কাজে লেগে যাও।

প্রথমে এলাম লস এঞ্জেলস, সিনেমার ধান্দায়। দুদিনেই বুঝতে পারলাম সিনেমায় নামা আমার কম্মো নয়। এক মাসের মত ওয়াটার ফ্রন্টের আশে পাশে উড়ে বেড়িয়েছি আর মদ টেনেছি অহোরাত্র। প্রতি রাতে হাজির হতাম রাষ্টি ম্যাক গোবনের বারে। যুদ্ধের সময় রাষ্টি সার্জেন্ট পদে ছিল। লোকটা খোসমেজাজী। আমার জন্য সব কিছু করতে চাইত। সেই থেকে আমি ওর বারের পিয়ানো বাদক। এর জন্য ত্রিশ ডলার দিত সপ্তাহে সঙ্গে মদ ছাড়।

যে বৃষ্টির রাতে রীমা বারে এসেছিল, তখন আমার বয়স তেইশ। পরের দিন ঘরে বসে হ্যামণ্ডের ফোন পেলাম।

—ছুকরী, ছেলেটার কুড়ি বছরের চাকী ঘুড়িয়ে ছাড়ল।

—মানে? হ্যামণ্ডের কথায় আশ্চর্য্য হলাম।

—উইলবারের বিরুদ্ধে অনেক মামলা ঝুলছে। সব মিলিয়ে কম করেও কুড়ি বছরের জেল হবেই। সো লং। কনেকসন কেটে দিল।

সেই সন্ধ্যায় রীমা বারে এল। পরণে ছিল কালো সোয়েটার আর স্লেট রংয়ের স্কার্ট। বারে তখন ভীষণ ভিড়। আমার পাশে একটা টেবিল নিয়ে বসল।

—হ্যালো। কেমন আছ? আমি নক করলাম।

—ভালো। ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট প্যাকেট বার করল। গত রাতে জীবন বাঁচানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

—শুনলাম উইলবারের নাকি কুড়ি বছরের জেল হতে চলেছে। কথায় রাশ অন্যদিকে টানলাম।

—মনে হচ্ছে। নাকের পাটা ফোলাল রীমা, চির জীবনের মত আমার পিছু নেওয়া খতম করেছি। ম্যুয়র্কে দুটো পুলিশকে চাকু দিয়ে চিরে দিয়েছিল। চাকু চালানোয় ওস্তাদ।

কান খাড়া করে শুনছিলাম রীমার কথা। কথা না বাড়িয়ে আবার পিয়ানোয় হাত দিলাম। যেদিন আমার শরীরে খোঁচা লেগেছিল তারপর থেকে মেয়েদের প্রতি আসক্তি আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ আমার তন্ময়তা টলে গেল, পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে হামিং ভয়েজে

গাইছে রীমা। ওর সুন্দর সুরে আমি অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। অদ্ভুত সুন্দর গলা। যেন সেতারের ঝংকারের মত। মিষ্টি গলা। পিয়ানো থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—ফুল ভল্যুমে কেমন গাও ?

—গাইতে পারি আর কি !

—তা হলে গাও। চড়া পর্দায় শোনাও। ষ্টার্ট।

পিয়ানোয় হাত দিলাম আবার। রীমা গাইছে চড়া গলায়। এত সুন্দর গলা আমি অন্ততঃ আশা করিনি। গলার স্বর, ব্লেড যেমন নিঃশব্দে সিল্ক কাটে তেমনি হৈ-হট্টগোল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মদ্যপরা নির্বাক। মুখে কারও টু শব্দটি নেই।

গান থামলে বললাম, এমন সুন্দর গলা দিয়ে তুমি তো বিশ্ব জয় করতে পার।

—আচ্ছা ! বিদ্রুপের মত শোনাল ওর স্তুতি। সস্তায় একটা ঘর দিতে পার থাকবার ?

—আমি যেখানে থাকি সেখানে চলে এসো। সস্তায় এত রদ্দী জায়গা আর কোথাও পাবে না। ২৮ লেকসন এভিন্যু।

রীমা ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে নিয়ে ফেলে দিল। পা দিয়ে ঘষে দাঁড়াল।

—থ্যাংকস। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব ওখানে।

গট গট করে বেরিয়ে গেল রীমা নিতম্বের দোলানী দেখিয়ে।

॥ ২ ॥

মাঝরাতে ঘরে ফিরলাম। দরজায় তালা খুলছিলাম অকস্মাৎ উল্টো দিকের ঘর থেকে উঁকি মারল রীমার মুখ।

—হ্যালো। রীমা হাসল। পৌঁছে গেছি।

—হ্যাঁ জলের মত সস্তায় এরকম রদ্দি হোটেল কোথাও নেই। ঘরের আলো জ্বালিয়ে বললাম। আমি ভেবেছি কালই আমার বন্ধুর নাইট ক্লাবে তোমার কথা বলব।

ধন্যবাদ !

পায়ের জুতো খুলে ফেলেছি। রীমার বড় বড় নীল চোখ আমার দিকে তাকিয়ে যেন কিছু অন্য কথা বলতে চাইছে।

—আমায় পাঁচ ডলার ধার দেবে ? পকেট আমার একেবারে খালি।

কোটটা ছুঁড়ে দিলাম চেয়ারের উপর। সরি। আমার পকেটও গড়ের মাঠ। গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়। ঘুম পেলে খিদে পাবে না।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। মুখ ভাবশূন্য।

—মাত্র পাঁচ ডলার চাইছি। দরকার হলে তোমার সঙ্গে শুতেও রাজী। টাকা ফিরিয়ে দেব কথা দিচ্ছি।

—কেটে পড়ো।

বেডরুমের দরজা রীমার মুখের উপর বন্ধ করে দিলাম।

সারা রাত অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভেবেছি। মেয়েটার এজেন্ট হয়ে অনেক টাকা পিটতে পারব। ওর মিষ্টি গলা রেকর্ড হয়ে যাবে। রেকর্ড, টি, ভি, বেতার সর্বত্র গাইয়ে রীমা। আর আসমান থেকে পড়বে টাকা ঝুর ঝুর করে। আর আমি কমিশন খেয়ে মিলিওনিয়ার হয়ে যাব।

পরের দিন সকাল এগারোটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রীমা সিঁড়ির গোড়ায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। শরীরটা নেতানো। নরম চোখের কোলে দাগ ধরেছে—নাকটা ফ্যাকাসে লাল।

—আমার বন্ধু উইলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফ্রেস হয়ে নাও চান করে।

—দুদিন ধরে কিছু খাইনি। কিছু দাও না ? রীমার স্বর ফ্যাসফেসে।

—আমার অবস্থা তথৈবচ। আমি চিৎকার করে উঠলাম। তোমার চাকরীর চেষ্টা করছি। তার বেশী আর কিছু করতে পারব না।

—আমি না খেয়ে মরে যাব। প্লীজ।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। আধা ডলার দিচ্ছি কিন্তু ফেরৎ চাই পরে।

ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুলে রীমাকে আধ ডলার দিলাম। আমার কাছে এখন পুরো সপ্তাহের টাকাটা আছে। সাবধানে লক করলাম দেরাজ যাতে ও বুঝতে না পারে বেশী টাকা আমার কাছে আছে।

উইলি অফিসেই ছিল। এক গোছা বিশ ডলারের নোট গুনছিল। আমাকে দেখে মাথা দোলাল কিন্তু নোট গোনা চালু রইল। নোট গোনা শেষ করে দেরাজে রাখল উইলি। তারপর আমার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফেলল।

—কি খবর জ্যাক ?

—আমি একটা মেয়েকে জানি, দারুণ গান গায়। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

উইলির ফোলা মুখ ফোলা চোখ আরো একটু ফুলে গেল।

—কি ব্যাপার! মেয়েটার সঙ্গে প্রেমটেম করছ নাকি—নাকি দালালি?

—না না। আমি ওর এজেন্ট। আজ রাতে নিয়ে আসছি। আমি চাই তুমি শুধু একবার শোনো ওর গান। তারপর দেনা-পাওনার কথা হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল উইলি।

—আচ্ছা নিয়ে এসো। কিন্তু কথা দিতে পারছি না।

কথা না বাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার উইলিকে গান শোনাতে পারলে রাখে হরি মারে কে! অন্ততঃ সপ্তাহে ৭৫ ডলার পাওয়া যাবে।

ভাবনার জাল বুনতে বুনতে হোটেলে এলাম। দু'চারটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত ঘরে এসে ঢুকলাম। বিছনার চাদর পাল্টাচ্ছিল চাকরাণী। রীমাকে আশে পাশে দেখা গেল না।

—মিস মার্শাল কোথায়? চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলাম।

—আধ ঘণ্টা আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে! বেলুন চুপসে যাবার মত চুপসে গেলাম। হোটেলের চার্জ দিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। দু ডলার ভাড়া দিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারমানে মেয়েটা আমায় চিট করল। অথচ ওর কাছে টাকা ছিল। স্রেফ ধোঁকা দিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুললাম—লক খোলা। আমার সপ্তাহের পুরো টাকা—ত্রিশ ডলার হাওয়া।

সপ্তাহটা কাটল ভীষণ অর্থ কষ্টে। দু'সপ্তাহের মধ্যে ধাক্কাটা সামলে উঠলাম। মাসখানেক বাদ রাষ্টি দোকানের জন্য একটা নিয়ম সাইন আনতে বলল আমায়। ওর গাড়ীটা দিল সঙ্গে খরচের জন্য দু'ডলার। কোন কাজ ছিল না বলে চলে গেলাম।

গাড়ীর পিছনে নিয়ম সাইন তুলে ফিল্ম ষ্টুডিওগুলির পাশ দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ রীমাকে দেখতে পেলাম প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওর গেটে গার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করছে। ওর রূপালী চুল দেখেই চিনতে পারলাম। ওর গায়ে ছিল একটা টাইট

লাল জামা, কালো স্কিন টাইট জিন আর পায়ে বেলি ড্যান্সারদের মত লাল স্লিপার। গাড়ীটা দাঁড় করালাম একটা বুইক আর ক্যাডিলাকের মাঝে। গাড়ী থেকে নেমে সোজা এগোলাম রীমার মুখোমুখি। গার্ড দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেছে।

—হ্যাল্লো। আমি বললাম। তোমার খোঁজ করছিলাম।

—হ্যালো। এবার মুখোমুখি হলাম।

—তোমার কাছে আমি ত্রিশ ডলার পাই। মৃদু হাসলাম।

—কি মজা করছ? চোখ নামিয়ে বলল রীমা।—কিসের ত্রিশ ডলার?

—তুমি চুরি করেছিলে। তাড়াতাড়ি বার করো নাহলে তোমাকে ধরে পুলিশে দেব।

—আমি কিছু চুরি করিনি তোমার। আমার দেনা শুধু আধ ডলার।

রাগে মুঠোয় চেপে ধরলাম ওর কোমল বাহু। হাত ছাড়াবার অনর্থক চেষ্টা করল। অনোন্যপায় হয়ে ওকে তুলে আনলাম আমার গাড়ীতে।

—গাড়ীটা কার? তোমার? আদর মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করল রীমা।

—না। দিনকাল কি রকম কাটছে?

—খারাপ। একেবারে ভিখারী।

—জেলে গেলে খেতে পাবে বিনা পয়সায়, কোন কাজই হবে না। আমার টাকা ফেরৎ দাও নচেৎ জেলে পাঠাবো।

—সরি। বুক সোজা করে হাতটা আমার হাতে রেখে বলল—দিব্যি খেয়ে বলছি ফেরৎ দিয়ে দেব।

দিব্যি খাবার দরকার নেই। তোমার পার্সটা দাও।

রীমার হ্যাণ্ডব্যাগে হাত বাড়ালাম। গাড়ী দাঁড় করে দিয়েছি ফুটপাতের কিনারে।

—দেখো ভালো হচ্ছে না। পরে পস্তাবে হবে। ক্রোধে ফেটে পড়ছে রীমার চোখে মুখে।

ব্যাগ খুলে ফেলেছি। ভেতরে পাওয়া গেল পাঁচ ডলার, একটা সিগারেট প্যাকেট, একটা চাবী আর রুমাল। টাকাটা নিয়ে সব ফেরৎ দিয়ে দিলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে রীমা বুদ বুদ করে বলল—আজকের কথা ভুলবনা।

—আচ্ছা। এটা তোমার শাস্তি, ভবিষ্যতে চুরি করার সাহস হবে না। কোথায় থাক?

রুক্ষ স্বরে জানাল একটা রুমিং হাউসের ঠিকানা। আমার হোটেলের কাছেই জায়গাটা। গাড়ীর মুখ ঘোড়ালাম রুমিং হাউসের দিকে।

—আজ থেকে আমি তোমার এজেন্ট। যা বলব তাই শুনবে। যা ইনকাম করবে তার দশ পার্সেন্ট আমার। লিখে দিতে হবে।

—আমি গান গেয়ে টাকা রোজগার করতে পারব না।

—আমার কথা শোনো, নচেৎ জেলে পাঠাবো। কোনটা চাও?

অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—আচ্ছা। তোমার কথাই শুনব।

হোটেলে গিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট তৈরী করলাম। যার মূল বক্তব্য আমি এজেন্ট হিসাবে দশ পার্সেন্ট পাব।

—এখানে সাইন করো। লেখার নীচে আঙ্গুল দিয়ে দেখালাম। গজ গজ করতে করতে সাইন করল রীমা। এগ্রিমেন্ট পকেটে রাখতে রাখতে বললাম।

—আজ তুমি ব্লু রোজে গাইবে। ভাল করে গাইবে। সপ্তাহে ৭৫ ডলার পাবে। দশ পার্সেন্ট হিসাবে সাড়ে সাত ডলার আমার পাওনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে জোড়ে কষ লাগালো। ধোঁয়াটা গিলেই ফেলল।

—সারাদিন কিছু খাইনি। কিছু খাবার আনাও। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল রীমা।

সত্যি রীমা অভুক্ত ছিল, ওর চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছে। একটা চিকেন স্যাণ্ডউইচ আনালাম। কাকের মত ঠুকরে খেল আধখানা।

—তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। ন'টার মধ্যে পৌছুতে হবে।

ওর দিকে তাকালাম। পুরোনো হাতীর দাঁতের খেলনার মত লাগছে রীমাকে। চোখের কোলে কালচে দাগ দগদগ করছে, তবুও ওকে সুন্দরী ও সেক্সী লাগছে।

ব্লু রোজে যখন এলাম তখন ন'টা প্রায় বাজে। প্রতিদিনের মত আজও ছোট বড় ব্যবসাদার, অখ্যাত কিছু সিনেমার নায়ক, উচ্চপদের চাকুরে আর সুন্দরী কলগার্লে ঠাসা ব্লু রোজ। উইলিকে দেখতে পেয়ে বললাম—হ্যালো। রীমা মার্শাল ইনি। উইলি শুধু মাথা দোলাল। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম —আরম্ভ করতে পারি প্রোগ্রাম।

—নিশ্চয়ই। যখন তোমার খুসী।

উইলি মাইকে ঘোষণা করল, রীমা এবার গান গাইবে। পিয়ানোয় বসে সুর তুলছি, পাশে রীমা দাঁড়িয়ে। যেন পরীক্ষার প্রস্তুতি।

গান শুরু হল। প্রথম পাঁচ ছ' লাইন 'এ' ক্লাস গায়িকাদের মত গাইল। সুর তাল লয় সব মাপা। কোকিল কণ্ঠের ঝংকার। কিন্তু তারপর সব জট পাকিয়ে গেল। সুর গেল কেটে, তাল গেল ভেঙ্গে, আওয়াজ হয়ে পড়ল রসহীন। শেষে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, বদলে হেঁচকি তুলতে শুরু করছে। শরীর কাঁপছে। পিয়ানো বন্ধ করে দিলাম আমার শরীরে বিশ্রী একটা হীম শীতল প্রবাহ বইতে লাগল। উইলির গর্জন শোনা গেল। আরে ঐ নেশুড়ে ছুড়ীটাকে বাইরে বের করে দে।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রীমা। শরীর কাঁপছে, মাঝে মাঝে হেঁচকি তুলছে। নরম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

—আমি আগেই বলেছিলাম আমার দ্বারা হবে না।

—নেশা কবে থেকে করছ ?

—তিন বছর। উঠে বসল রীমা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল।

—তিন বছর ? তার মানে পনেরো বছর বয়স থেকে নেশা ভাঙ্গ শুরু করেছ ?

ওঃ তুমি থামবে।

— কে এনে দিত ? উইলবার ?

—তাতে তোমার কি ? তুমি চাও আমি গান গাই— সফলতার চরমে উঠি ? সব হবে, আমায় টাকা দাও, একটু নেশা করি, দেখবে ফাটিয়ে দেব গানে।

আমি বিছানায় বসলাম।—শোনো। টাকা আমার কাছে নেই। গান তোমায় গাইতেই হবে। চিকিৎসা করাব। নেশার মোহ কাটলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন লাখ লাখ টাকা কামাতে পারবে।

—ও সব বাসী হয়ে গেছে আমার কাছে। পাঁচ ডলার ছাড়, নেশা করব। আমি আর বরদাস্ত করতে পারলাম না। ওখান থেকে উঠলাম। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠলাম। রীমার ঘরে গিয়ে দেখি মরার মত ঘুমুচ্ছে। বুঝতে পারলাম গত রাতে নিশ্চয়ই নেশা করেছে কোনে আহম্মককে জপিয়ে। দরজা বন্ধ করে এলাম রাষ্টির বারে।

—রাষ্টি, তোমার সঙ্গে কথা আছে। সিরিয়াস।

—বলো। রাষ্টির গলায় উদ্বেগ।

—মেয়েটা গান গাইতে পারে। ওর কণ্ঠে সোনা, খাঁটি সোনা। লাখ লাখ টাকা কামাতে পারে।

—তাহলে কামাতে পারছে না কেন ?

—নেশা করে দম নষ্ট করে ফেলেছে। রাষ্টি ঠোঁট কুঁচকালো।

—তাহলে ?

—চিকিৎসা করতে হবে। কি যে করি ?

—আমি বলব ? মেয়েটার পেছন ছাড়। নেশুড়ে মেয়েকে নিয়ে কিছুই করতে পারবে না। চিকিৎসা করালে, দু কি তিন, কি চার মাস ভাল থাকবে। তারপর আবার মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, চরস, এল এসডি টানবে। আর চিকিৎসা সে অনেক টাকার খোরাক।

—ধার দেনা করে চিকিৎসা করাব। কিন্তু লোকটা কে ?

—ডাক্তার ক্লিঞ্জি। উনি বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা সোনা গিসিং ও ফ্রাকিংয়ের চিকিৎসা করেছেন। ওরা চরস এডিক্টেড ছিল।

দ্রুত টেলিফোন ডাইরেক্টরীর পাতা উল্টে দেখে নিলাম ডাঃ ক্লিঞ্জির ঠিকানা। রুমিং হাউসে যখন ফিরে এলাম দেখি খাটের উপর বসে রীমা, পরণে কালো সিল্কের পাজামা। নীল চক্‌চকে চোখ, রূপোলী—চুল—অদ্ভুত লাগছে ওকে।

—ডাক্তার ক্লিঞ্জির কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।

—ওসব খেয়াল ছাড়ো, চিকিৎসার দরকার নেই আমার। তারচেয়ে কিছু টাকা দাও, নেশা করি।

—শাট আপ। চিকিৎসার জন্য তৈরী হয়ে নাও গর্জন করে উঠলাম।

—আচ্ছা তাই হবে। ফ্যাসফেসিয়ে বলল রীমা।

—বসুন মিঃ গোর্ডন। আমায় বসতে বলল ডাঃ ক্লিঞ্জি। বেশী বয়স নয়, তিরিশের বেশী হবে না। মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ কালো চুল—চোখের তারা ছাই রংয়ের।

—বলুন কি কেস ?

—আমি এক গায়িকার এজেন্ট। তিন বছর ধরে মরফিয়ার নেশা করে আসছে, ওর চিকিৎসা করাতে চাই।

ক্লিঞ্জির তীক্ষ্ণ চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ।

—গ্যারান্টি সহ চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে থাকি।

—সময় কত লাগবে ?

—রোগীর উপর নির্ভর করছে। পাঁচ সপ্তাহ। জটিল কেস হলে আট সপ্তাহ তার বেশী নয়।

—আমি টাকা জোগাড় করছি, গ্যারান্টি ষোল আনা তো?

—নিশ্চয়ই।

রুমিং হাউসে এলাম। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। রীমার কণ্ঠস্বর টেপ করে নিলে মন্দ হয় না। কোনো গ্রামোফোন কম্পানীতে গিয়ে টেপ শুনিয়ে কাজ হাসিল করা যাবে।

রীমা তৈরী। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মিষ্টি দৃষ্টি আমার দিকে ফেলল।

—ডাক্তার ক্লিঞ্জি রাজী হয়েছেন কিন্তু ফিস চাইছেন পাঁচ হাজার ডলার। নাক ফোলাল রীমা, কাঁধ ঝটকে জানালা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে তোমার গান রেকর্ড করিয়ে কোন গ্রামোফোন কোম্পানীকে পাঁচ হাজার ডলার অ্যাডভান্স চাইবো।

রীমাকে জোর করে একটা রেকর্ডের দোকানে এনে টেপ করালাম। সেলসম্যান রীমার গলা শুনে অবিভূত। টেপ খুলতে খুলতে বলল সেলসম্যান।

—এল শায়রলী এমন গলা শুনলে তো পাগল হয়ে যাবে।

—শায়রলী? কে সে? আমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

কালিফোর্ণিয়ান রেকর্ড কোম্পানীর মালিক। আমি শালা বেট রেখে বলতে পারি মেয়েটার গান হিট হবেই। তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারো। সেলসম্যানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আবার রুমিং হাউসে ফিরে এলাম আমরা।

সে দিনই সন্ধ্যার সময় রাষ্ট্রির গাড়িটা ধার নিয়ে হলিউড রওনা হলাম, সঙ্গে সাধের টেপ। টেপ শুনিয়ে রাজী করাতে হবে শায়রলীকে। তারপর পাঁচ হাজার ডলার অ্যাডভান্স নেব।

শায়রলী গান শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু অ্যাডভান্স চাইতেই জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে আপনায় গায়িকার?

—তেমন কিছু না। সামান্য শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখাতে হবে।

—তাই বলে পাঁচ হাজার ডলার? এতো?

—স্পেশাল ট্রিটমেন্ট। ঘাম ছুটছে আমার শরীর থেকে।

—ডাক্তার ক্লিঞ্জির কাছে?

দেখলাম মিথ্যে বলে লাভ নেই।—হ্যাঁ।

এবার মাথা নাড়লেন।—আমার দরকার নেই। গান গাইবার আগে যার ক্লিঞ্জির কাছে যাবার দরকার তার দ্বারা কিছু হবে না।

মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন শায়রলী। আমি বোবা হয়ে বেরিয়ে এলাম।

॥ ৪ ॥

পাঁচ হাজার ডলার—চাই পাঁচ হাজার ডলার। যেমন করেই হোক। আমার এখন একমাত্র চিন্তা ভাবনা, রীমার চিকিৎসা এবং পাঁচ হাজার ডলার।

এমন সময় রীমা টোকা দিল।—টাকার জন্য খুঁজে মরছ! আমি জানি টাকা কি করে পেতে হয়।

রীমার কথা শুনে আশ্চর্য হলাম,—বক্ বক্ করো না।

—হ্যাঁ। আমি জানি কি করে পাঁচ হাজার ডলার পেতে হয়।

—কি করে?

—প্যাসিফিক ষ্টুডিওর কাষ্টিং ডাইরেক্টর বলেছে কাটিং অফিসে রোজ দশ হাজার ডলার জমা পড়ে, একস্ট্রাদের পেমেন্টের জন্য। সেই দরজার তালা ভেঙ্গে…।

আমার পা কাঁপছে রীমার কথা শুনে।

—মানে?

মানে আবার কি? হাপিস করে দিতে হবে টাকা।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি—চুরি। না এত নীচে নামতে পারব না। কিন্তু মাথার মধ্য দিয়ে চিন্তার জটকে খুলতে পারছি না।…ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরের দিন সকাল আটটায় আমরা হলিউড পৌঁছলাম। ঢুকলাম প্যাসিফিক ষ্টুডিওয়। মেইন ষ্টুডিওর পাশে একটা বাংলা প্যাটার্ন বাড়ি তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি, নাম লরী, পরণে কর্ডুরয়ের প্যান্ট এবং নীল শার্ট। রীমাকে দেখে হাসল লোকটা।

—হ্যালো। তোমার সঙ্গে এটি আবার কে?

—আমার বন্ধু। জ্যাক গোর্ডন। ভিড় ভাড়াকার দৃশ্যে চান্স হবে একটা ওর ?

—ওকে। নাম লিখে নিচ্ছি। তিন নম্বর ষ্টুডিওয় যাও। পথ দেখিয়ে দিল আমায়।

সারাদিন তিন নম্বর ষ্টুডিওর আর্কল্যাম্পের তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত সাতটার সময় ছুটি পেলাম, পরিচালক মাইকে ঘোষণা করে দিল। বয়েজ এণ্ড গার্লস কাল সকাল নটায় এই পোষাকে সবাই হাজির হয়ে যাবে।

রীমা আমায় পিছনের দরজা দিয়ে ষ্টেজের নীচে নিয়ে এল। তিন ঘণ্টা ইঁদুরের মত লুকিয়ে রইলাম। সবাই চলে গেছে, টেকনিসিয়ানরা পর্যন্ত এখন ষ্টুডিওয় শুধু আমরা দুজনে।

চারিদিক অন্ধকার, কোন সাড়া শব্দ নেই। রীমা দক্ষ হাতে তালা খোলবার চেষ্টা করছে। হাঁটু গেড়ে বসে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

—হুঁসিয়ার থাকবে। বেশী দেরী হবে না।

কিন্তু ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসছে।

—চলো কেটে পড়ি। আমার ভাল মনে হচ্ছে না ?

—উজবুকের মত কথা বলো না। এখন পেছিয়ে আসা যায় না।

কিন্তু কিছুতেই তালা খুলতে পারছে না রীমা। খিড়কি দিয়ে উঁকি মারলাম। আমার হৃদপিণ্ডটা হঠাৎ ঝাকানি দিয়ে উঠল। শ্বাস কমজোরি হতে লাগল। দেখলাম আমাদের দরজার দিকে একটি অদৃশ্য মূর্তি আসছে। চওড়া কাঁধ, মাথায় পীক ক্যাপ। হঠাৎ রীমা অস্ফুটে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

—তালা খুলে গেছে।

—বাইরে কে যেন আসছে। আমি সতর্ক করলাম।

অদৃশ্য মূর্তিটা দরজা খুলল। আলো জ্বালল। আলো যেন আমার মাথায় প্রহার করল।

—নড়লে গুলী চালিয়ে দেব। শক্ত, কঠোর আত্মবিশ্বাস পূর্ণ কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল।

দরজার দিকে দেখলাম। খোলা দরজার উপরে ক্যাচ খুলে রিভালবার হাতে দাঁড়িয়ে লোকটা।

—এখানে কি করছ এত রাতে ?

কাঁপতে কাঁপতে মাথার উপর হাত ওঠালাম। মনে হল এখুনি গুলী

চালিয়ে দেবে। লোকটা কিন্তু বুঝতেই পারেনি ডেস্কের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে রীমা।

—ডেস্কটা খুলবার চেষ্টা করছিলে? ডেস্কের দিকে চোখ রেখে বলল।

—না-না। একটা নিষ্প্রাণ গলার স্বর ধ্বনিত হল আমার কণ্ঠে। ঠিক সেই সময়ে ডেস্কের পেছন থেকে একটা গুলী ছুটে এল। মাথার টুপী পড়ে গেছে। পেটে হাত চেপে বসে পড়েছে গার্ড। হাতের রিভালবার গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। আঙুলের পাশ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ড্রাম। আর একটা গুলী। ডেস্কের পেছন থেকে ছুটে এল। একটা আর্তচীৎকার করে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল গার্ডের ভারি লাশ। রীমা ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। হাতে রিভলবার, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

—দেরাজ খালি। শালা····। রীমা সাপের মত—ফুসে উঠল।

—চলো কেটে পড়ি।

—রিভালবার কোত্থেকে পেলে?

—কথা না বাড়িয়ে পা চালাও। ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমায় বাইরে নিয়ে এল রীমা।

বাইরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। রীমা ছুটছে, আমি ওর পেছনে। ষ্টুডিওর আলো জ্বলতে শুরু করেছে এক এক করে। শোর-গোলের আওয়াজ উঠছে। আমরা অন্ধের ছুটে চলেছি। সাইরেন গর্জন করে চলেছে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে একটা বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালাম।

—পুলিশ আসার আগে এখান থেকে পালাতে হবে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল রীমা।

—তুমি গুলী চালিয়ে দিলে?

—ওঃ শাট আপ।

ছোট পাঁচিলটা টপকালো রীমা। আমি ওকে অনুসরন করলাম। ছুটতে ছুটতে রাজপথে চলে এলাম। পুলিশের সাইরেন সামনে শোনা যাচ্ছে। পুলিশকার জড় হচ্ছে ষ্টুডিওর গেটে। রীমার মুখে বিতৃষ্ণার সুর।

—শালা লরী, মিথ্যে বলেছে। টাকা ওখানে থাকে না ব্যাংকে জমা করে দেয়।

—তুমি একটা মানুষ খুন করেছো। ওরা তোমায় ফাঁসীতে লটকাতে পারে। হতভাগী, কুত্তী! আমারও তেরোটা বাজালি।

—আত্মরক্ষার জন্য করেছি। গরম সীসার মত উষ্ণ রীমার গলা।

—না। আত্মরক্ষা নয়। জেনে শুনে ইচ্ছে করে খুন করেছো। গুলী চালিয়েছ দু' দু'বার। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ। দ্বিতীয়বার আর তোমার মুখ দেখতে চাইনা জীবনে।

—কাপুরুষ! চুপ করে থাকো।

অবশেষে আমরা একটা বাসষ্টপে এলাম হাঁটতে হাঁটতে।

॥ ৫ ॥

সারা রাত ঘুমুতে পারিনি একটুও। শুধু ছটফট করে কাটিয়েছি। ভাবছি কি করি? এ শহর ছাড়তে হবে। রাষ্টির কাছ থেকে কিছু ধার দেনা করে সরে পড়তে হবে। এগারোটার সময় একটা গড়ী আছে।

রীমা ষ্টুডিওয় যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। আমাকে এসে বলল—কি তুমি যাবে না?

—পাগল! কাল রাতে একটা লোক খুন করেছ তুমি। আমি আর তোমার সঙ্গে নেই। আজই আমি পালাচ্ছি এখান থেকে।

—মাথা ঠাণ্ডা করো। কেউ কাউকে মারেনি। খুন হয়নি কেউ। আমি লাফিয়ে উঠলাম।

—মানে?

—লোকটা মরেনি। হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু গার্ডটা পুলিশের কাছে বয়ানে শুধু তোমার কথা বলেছে। পুলিশ মুখে জখমের চিহ্নওয়ালা আসামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কি বকবক করছ। গুলী আমি করিনি, তুমি করেছ।

—কিন্তু গার্ড আমায় দেখেনি। দেখেছে তোমায়।

কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠল রীমার মুখে।

ভয় আমাকে আকড়ে ধরল। গলা শুকিয়ে আসছে। ভিতরে টানছে জিভ। চিৎকার করে উঠলাম। দেহের সমস্ত শক্তি জড় করে চড় কষিয়ে দিলাম ওর ফর্সা গালে। চোখ জ্বলছে আমার আগুনের মত।

—তোমার সঙ্গে গাঁট না বাঁধলেই হোত। বেরোও এখুনি।

রীমা ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে। চোখের তারায় আগুনের শিখা।

—অসভ্য, ইতর। ভুলব না এ অপমান। একদিন না একদিন এর হিসাব নিকাশ করে ছাড়ব। ভগবানের দোহাই গার্ডটা মারা পড়ুক আর তোমার গলায় ঝুলুক ফাঁসির দড়ি।

পা দিয়ে গোত্তা মেরে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল।

আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে একটি ভাবনা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে—কি করে এখান থেকে পালাব, বাড়ী যাব।

সন্ধ্যের কাগজে দেখলাম, গার্ডের আর হুঁশ ফেরেনি। মারা গেছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে আততায়ীকে। ঘর থেকে বেরুলাম। পাবলিক বুথে এসে টেলিফোন করলাম রাষ্টিকে—রাষ্টি খুব বিপদে পড়েছি। রাতের বেলায় আমার এখানে একবার এসো।

—কি ব্যাপার ?

—সব বলব।

ন'টার সময় রাষ্টি এল ওর গাড়ী চড়ে। রাষ্টি বেশ পরিশ্রান্ত, চোখে মুখে ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে।

—কি খবর ? ঐ ছুকরীর চক্কর নাকি ?

—হ্যাঁ। আমি সান্ধ্য কাগজটা রাষ্টির হাতে দিলাম। নিউজটা তুলে ধরলাম ওর চোখের সামনে।

নিমেষে পড়ল রাষ্টি। তারপর মাথা উঠিয়ে আমায় দেখল।

—মাই গড। এ তুমি কি করেছ ?

—আমি না, ঐ রীমা। আমি আদ্য প্রান্ত গড়গড় করে বললাম রাষ্টিকে। —ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি খুন আমি করিনি।

—এখন কি করতে চাও ?

—এখান থেকে পালাব। বাড়ী যেতে চাই।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক গোছা নোট বের করে আমার হাতে দিল। তারপর সাবধান করে দিয়ে বলল।

—লস এঞ্জেলস ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়োনা। ওখানে নিশ্চয়ই পুলিশ ঘুরঘুর করছে। তোমাকে গাড়ী করে সানফ্রানসিসকো নিয়ে গিয়ে ট্রেনে চড়িয়ে দেব।

রাষ্টি উঠে দাঁড়াল।

আমিও অনুসরণ করলাম ওকে। হাতে একটা স্যুটকেশ আমার, তাতে আমার সব-যাবতীয় সামগ্রী।

হিরোশিমায় অ্যাটম বোম ফাটানো হল। এই হৃদয় বিদারক ঘটনার মধ্যে বাড়ী পৌছলাম। রীমার সঙ্গে সাক্ষাতের দু'বছর পর কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করলাম।

এগারো বছর পার হয়ে গেছে রীমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এই এগারো বছরে অনেক কিছু হয়ে গেছে আমার জীবনে। ইঞ্জিনীয়ার হবার দু বছরের মধ্যে বাবা মারা গেলেন, রেখে গেলেন একটা বাড়ী আর পাঁচ হাজার ডলার। বাড়ীটা বিক্রি করে দিলাম। এই টাকা নিয়ে বন্ধু ওরবোর্ন এর সঙ্গে পার্টনারশীপ ব্যবসা শুরু করলাম। ওরবোর্ণ আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। বেশ ভারি চেহারার মানুষ হলে কি হবে? কাজ করার ক্ষমতা অস্বাভাবিক। দিনে বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে, ঘুমোয় মাত্র চার ঘণ্টা। আমাদের কোম্পানীর নাম ওরবোর্ণ অ্যাণ্ড হ্যালিডে। হ্যালিডে ছিল আমার বাবার নাম।

প্রথম তিন বছর আমরা এক কামরা বিশিষ্ট অফিস ঘরে কাজের আশায় বুক বেঁধে শুধু বসেই ছিলাম। সামান্য পুঁজি না থাকলে হয়ত না খেয়ে মরতাম।

ধীরে ধীরে আমরা কাজ পেতে শুরু করলাম। দু বছরের মধ্যে মুনাফা আসতে শুরু করল। ওরবোর্ণ সামলায় বাইরে আর আমি ভেতর। ছ'বছর পর প্রাইভেট কাজ পেতে শুরু করলাম, যেন বাংলো, পেট্রল পাম্প, ছোট সিনেমাগৃহ।

এর মধ্যে আমি বিয়ে করেছি একটি লাইব্রেরিয়ান মেয়ে সরিতাকে। ইতিমধ্যে আমরা গাড়ি কিনেছি, কিনেছি ফ্ল্যাট। একদিন সকালে নগরপাল ম্যাথিসনের ফোন পেয়ে হাজির হলাম মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে।

ম্যাথিসন আমাদের ভালবাসেন, আমাদের জন্য কিছু করতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু এতদিন সে সুযোগ আসেনি। আজ তিনি একটি বিরাট অফার দিলেন। হ্যালণ্ড ব্রীজ তৈরী করার।

—শুধু সর্ত এক বছরের মধ্যে ব্রীজের কাজ শেষ করতে হবে। ম্যাথিসন বললেন। আমরা রাজী হলাম।

পরবর্তী তিরিশ দিন ধরে আমরা এষ্টিমেট তৈরী করলাম এষ্টিমেট কমিটি অ্যাকসেপ্ট করল। এই ঘটনা রীমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের এগারো বছর পর।

ষাট লাখ ডলার খরচ ব্যাপারটা যে কি এলাহি ব্যাপার তা টের পেলাম যেদিন আমার অফিসে এল জনসংযোগ অধিকারী ক্রীডি সেদিন। ওরবোর্ণ ওর কথা গিলছিল মুখরোচক খাদ্যের মত।

—শনিবার আমরা একটা পার্টি থ্রো করছি ডিপার্টমেণ্ট থেকে। আর সম্মানিত অতিথি রূপে হাজির থাকবেন আপনারা। শনিবার টিভিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

—টিভি! বিচলিত স্বরে বললাম।—টিভিতে কেন?

—মাইফ্রেণ্ড। ষাট লাখ ডলার খরচ করতে যাচ্ছি, ছেলেখেলা নয়! ইণ্টারভিউ আমিই নেব। ব্রিজের একটা মডেল তৈরী করে টিভিতে দেখানো হবে।

ক্রিডির কথা শুনে মাথার মধ্যে পুরোনো ভূতটা জেগে উঠল। মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে রইলাম।

—লাইফ ম্যাগাজিনেও একটা আর্টিকেল ছাপবার ব্যবস্থা করছি। লাইফে কভার করতে পারলে শহরে হৈ চৈ পড়ে যাবে।

এবার আমি ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়লাম। লাইফ তো সারা পৃথিবী ছড়িয়ে দেবে। না। কিছুতেই আমার ছবি লাইফ পত্রিকায় ছাপাব না।

ক্রীডি নোট বইয়ে কি সব নোট করতে করতে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। —টিভি ইণ্টারভিউ আমাকেই তৈরী করতে হবে। প্রথমে সাধারণ ব্যাপার স্যাপার, যেমন—কোথায় জন্ম? বাপ মা কে? শিক্ষা দীক্ষা কোথায়? ভবিষ্যতে কি করতে চান ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওরবোর্ণ এক এক করে জবাব দিচ্ছে। আমি ঘামতে শুরু করেছি। লস এঞ্জেলেসের দিনগুলি কি ভাবে কভার করব? এবার পালা শুরু। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া অবধি আটকালো না—গড়গড় করে বলে গেলাম।

ক্রিডি প্রশ্ন করে চলেছে।—কলেজ ছেড়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন?

—সর্বত্র। যেখানে খুশী সেখানে।

—কাজ কি করেছিলেন তখন?

—চোট-ছোট কজে করে বেরিয়েছি।

ওরবোর্ণ ও আমার কথা গিলতে শুরু করেছে।

—কোথায় কোথায় গিয়েছেন? কি ধরনের চাকরী করেছেন? আবার ক্রিডির প্রশ্ন।

—এর জবাব আমি দেব না।

—ওকে। বিজ তৈরী করে যে টাকা উপার্জন করবেন তা দিয়ে কি করবেন?

এবার আমি শান্তির শ্বাস নিলাম। প্রশ্ন এবার সহজ পথ ধরেছে।

—একটা বাড়ী করব। সেটা আমি নিজে তৈরী করব।

ক্রিডি তার নোট বন্ধ করল।

পরের দিন সকালটা কাটল ঠিকাদারদের সঙ্গে আর এষ্টিমেট তৈরী করতে। বেলার দিকে যখন স্যাণ্ডউইচ চিবুচ্ছি সেই সময় ক্রিডি এল সঙ্গে দুজন লোক। একজনের গলায় ঝুলছে রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা ইলেকট্রনিক ফ্লাস গান। ক্যামেরা দেখেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

—এরা লাইফ পত্রিকা থেকে এসেছেন। ছবি তুলবেন। ক্রিডি বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাসের রক্ত চক্ষু জলে উঠল।

—দেখুন, আমি পত্রিকায় ছবি ছাপতে চাই না।

—লজ্জা পাচ্ছে। ক্রিডি হাসতে হাসতে বলল।—না হলে বিশ্বের কোন আঁতেল না চায় লাইফে ছবি ছাপাতে?

ক্যামেরাম্যান ছবি তুলে চলেছে। আমি জখমের দাগটা আড়াল করে কথা বলছি বারবার।

—এই জখমটা যুদ্ধের সময় হয়েছিল, মিঃ হ্যালিডে?

—হ্যাঁ।

—আমরা জখমের একটা ছবি তুলতে চাই। সামান্য বাঁ দিকে ঘুরুন।

—আমি বিজ্ঞাপন করতে চাই না। রূঢ় স্বরে বললাম।

কিন্তু তৎক্ষণে ছবি তুলে নিয়েছে আমার।

সারাদিন মুডটা খারাপ রইল। ছবির ব্যাপারটা নিয়ে আমার চিন্তিত করে তুলল। লস এঞ্জেলেসের আমার পরিচিতরা ঠিক আমায় চিনতে পারবে।

আরো দুদিন কি করে যে কেটে গেল জানি না, শুধু কাজ আর কাজ। সরিতা লাইফ এর একটা কপি নিয়ে বাড়ী এল। 'লাইফে' আমার বিরাট ছবি ছাপা হয়েছে। চেয়ারে বসে, জখমের চিহ্ন স্পষ্ট এবং চোখের পাতা ঝোকা বোঝা যাচ্ছে। তলায় ক্যাপসন—বীর সেনানী জ্যাক হ্যালণ্ড সিটির ষাট লাখ ডলারের ব্রিজ তৈরী করার পর নিজ হাতে নিজের বাড়ী তৈরী করতে ইচ্ছুক। উনি ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন।

এই ক্যাপসন লাইনটা আমায় ভাবিয়ে তুলল। যারা আমায় জ্যাক গোর্ডন নামে জানে তারা সহজেই চিনতে পারবে।

রবিবার টেলিভিসন প্রোগ্রাম ছিল। সরিতা ষ্টুডিওয় এলো না ও বাড়ীতে বসেই টি, ভি, দেখবে। প্রোগ্রাম খুব সুন্দর হল। ইণ্টারভিউর সময় ক্রিডি প্রশ্ন করল—এটা লুকোনো কথা নয় যে আপনারা এই ব্রিজের কাজ করে মুনাফা পাচ্ছেন এক লাখ বিশ হাজার ডলার। এত টাকা নিয়ে কি করবেন।

ওরবোর্ণ বলল—আয়কর বিভাগের হিসেব চুকিয়ে একটা গাড়ী কিনব। এবার আমার দিকে তাকাল ক্রিডি।

আপনি মিঃ হ্যালিডে, শুনেছি, আপনি নাকি একটা বাড়ী করবার প্ল্যান এঁটেছেন ?

—হ্যাঁ।

যেই আমাদের উপর থেকে ক্যামেরায় মুখটা সরে গেল ক্রিডি সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্পেনের ছিপি খুলে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠল।

অবশেষে মজলিস ভাঙ্গল। আমরা ক্রিডির সঙ্গে কর মর্দন করে বেরিয়ে এলাম। ঠিক সেই সময় একজন টেকনিসিয়ান এগিয়ে এল।

—মিঃ হ্যালিডে আপনার ফোন।

—তোমার বউয়ের ফোন হবে। ওরবোর্ণ কথাটা বলে বেরিয়ে গেল।

রিসিভার তুলে নিলাম হাতে। আমার অন্তর্ভাবনা ধড়াস ধড়াস করছে। আমার অনুমান সত্য হল। রীমার ফোন।

—হ্যালো। রীমার গলা তোমার প্রোগ্রাম দেখলাম টি, ভিতে। আমার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে।

—আমার আশেপাশে লোক আছে। যা বলবার আস্তে বল।

—এখন তুমি বড়লোক ?

—কথা বলার সময় আমার নেই।

—আমি শুধু তোমাকে একবার দেখতে চাইছি। কেলওয়ে হোটেলে দশটার সময় অপেক্ষা করছি। বুদ্ধিমানের মত পৌছে যেও।

লাইন কেটে দিল রীমা। রুমাল বার করে ঘামে ভেজা শরীর মুছে নিলাম। আমার চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, হাত পা কাঁপছে।

॥ ৬ ॥

অনেক কষ্টে কেলওয়ে হোটেল খুঁজে পেলাম। একেবারে রদ্দি হোটেল। এখানে এক ঘণ্টার জন্যও ঘর ভাড়া পাওয়া যায়—আর মাঝে মধ্যে পুলিশি হাঙ্গামা ঘটে।

দশটার সামান্য কিছু আগেই পৌঁছলাম। রিসেপসনিষ্ট ডেস্কে বসে একটা হাবসীবুড়ো। লাউঞ্জে ছড়ানো ছিটানো গোটাপাঁচেক বেতের চেয়ার। আমার দৃষ্টি ঘুরছে চতুর্দিকে। এক কোণায় একটা চামড়ার মোড়া চেয়ারে বসে এক ছিপছিপে চেহারার মহিলা কুতকুতে দৃষ্টিতে দেখছে আমায়। রক্ত লাল লিপষ্টিকে রঞ্জিত ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। একবারে চিনতে পারিনি রীমাকে। আগের সেই রূপোলী চুল নেই। চুল পোলিশ মেয়েদের মত ছোট করা, তাতে লাল রংএর স্প্রে। সবুজ জামা। চোখে মুখে স্তব্ধতা। লবী পেরিয়ে মুখোমুখি হলাম। রীমার চেহারা পাঁকা বাঁশের মত হয়ে গেছে—লালিত্য ধুয়ে মুছে সাফ। তিরিশ বছরের বেশী মনে হয়। চোখে ইস্পাত কঠিন পুরুষালী দৃষ্টি।

—হ্যালো জ্যাক। অনেক বছর পর দেখা! রীমা চোখ নাচাল।

—এসো নির্জনে কথা বলা যাক। আমার গলার আওয়াজ স্তাতস্যাতে।

—না এখানেই কথা হবে। আমায় একটু মদ খাওয়াবে?

—খাও।

রীমা উঠে রিসেপসনের টেবিলে গিয়ে একটা বেল বাজাল। ভেতরের ঘর থেকে এক দৈত্যাকার ইটালিয়ান বেরিয়ে এল।

—একটা স্কচ। দুটো গ্লাস। সোডা। তাড়াতাড়ি।

একটা চেয়ার টেনে বসলাম। আমার পাশে আর একটা চেয়ারে বসল রীমা। —বিয়ে করেছ। একটা সিগারেট ধরিয়ে, নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে দিল গলগল করে। অনেক কষ্ট করেছ, নাহলে আজও তুমি জেলে পচে মরতে।

ইতালীয়ান দৈত্যটা স্কচ রেখে গেল। বিল আমি দিয়ে দিলাম। এক নিশ্বাসে আধ গ্লাস র-স্কচ শেষ করে বাকী অর্ধেকে সোডা ঢেলে দিল।

—তোমার কথা বল? এত গুলো বছর কাটালে কি করে? আমার গানের টেপটা কি এখনও আছে।

—হারিয়ে গেছে।

আসল কথাটা শোনার জন্য আমি ছটফট। রীমা কাঁধ ঝাঁকাল একবার।

—টেপটাও হারিয়েছে। টাকাও তো বেশ কামিয়েছে। টেপের নাম হিসেবে কিছু পয়সা কড়ি ফেলতে হবে।

—আমি কিছু দিতে রাজী নই তোমায়।

—তুমি বিবাহিত এখন? তাই এই পরিবর্তন?

—শোনো। এসব কথায় বেশী লাভ হবে না। তোমার আর আমার রাস্তা ভিন্ন।

জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পিঠটা একবার চুলকে নিল রীমা। চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমশ কঠিন হচ্ছে ওর।

—তোমার বউ জানে; তুমি একটা মানুষ খুন করেছ?

—খুন আমি কাউকে করিনি। আর এর মধ্যে আমার স্ত্রীকে টানছ কেন?

—ঠিক আছে। তোমার এই মনগড়া কাহিনী পুলিশের কাছে বললে কি ভাল হবে?

—দেখো রীমা গুলী তুমিই চালিয়েছিলে?

—লাইফে তোমার ছবি দেখলাম। তারপর টি, ভিতে। ষাট হাজার ডলার পাচ্ছো, এর থেকে আমায় কত দিচ্ছ?

—এক আধলাও নয়।

রীমা হেসে উঠল।—কিন্তু তুমি দেবে। টেপ হারানোর বদলে।

—ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

—জ্যাক। এখনও আমি রিভালবারটা সযত্নে রেখে দিয়েছি। লস এঞ্জেলস পুলিশ থানায় তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। থানায় গিয়ে শুধু বললেই হল খুনটা আমরা দুজনে মিলেই করেছি। খুব সহজ ও সরল কাজ বুঝেছ?

—অত সহজ নয়। খুনের দায়ে তুমিও ফাঁসবে। তোমারও নিস্তার নেই ঠা-ঠা করে হেসে উঠল রীমা।

—বেওকুফ। আমার জেল হলে কি আসে যায়। আমার দিকে তাকাও। জেলে গেলে আমি কি হারাব! আমি তো শেষই হয়ে গেছি। এখন আমি

একটা জঘন্য নেশুড়ে, আর নেশা করার জন্য সব সময় টাকা জোগাড় করে চলেছি ছলেবলে।

এগিয়ে এলো আমার সামনে। চেহারার ক্রুরতা জেগে উঠল। কিন্তু তুমি জেলে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে তোমার। বউয়ের কোলে শুতে চাও না? সুখের জীবন চাও না? এসব তোমার কাছে আছে। আমার কথা না শুনলে স্রেফ জেলে পচতে হবে। সত্যি বলছি। ব্ল্যাক মারছি না। পৃথিবীতে টাকার চেয়ে আর কি আছে? সবসে বড়া রপইয়া। আমার টাকা চাই-ই চাই। টাকা দাও নচেৎ জেলে পাঠাব।

বোবা দৃষ্টি মেলে দেখলাম রীমাকে। সত্যিই তো ওর কাছে এখন কি আছে, যা হারালে ও সর্বশান্ত হবে? আগে থেকেই অন্ধকার বিবরে মুখ থুবড়ে আছে। ওর কাছে জেল তো অনেক সুখের। আমি এখন ওর জালে—ষড়যন্ত্রে আটক। আমার দেহের শেষ রক্ত বিন্দু চুষে নেবার খেলায় ও বুঁদ হয়ে আছে।

—আচ্ছা, টাকা তোমায় দেব। পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে খুশী হয়ে ঘরে ফিরে যাও।

—না গোর্ডন। আমি বদলা নিতে এসেছি। হাতের তালু দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিল,—কোনো হারামীর বাচ্চা আমার উপর হাত উঠিয়ে নিস্তার পায়নি। আমি যা বলছি তাই হবে। পুরো ষাট হাজার ডলার চাই। এই সপ্তাহেই চাই দশ হাজার। তারপর আরো দশ, আগামী মাসে তিরিশ আর বাকীটা শেষ ইনস্টলমেন্টে।

আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু কোন উপায় নেই। পালাবার পথ নেই। এই নিরন্তর ব্ল্যাকমেল থেকে নিস্তার একমাত্র রীমার মৃত্যুতে।

—বেশ ফাঁসালে আমায়। ঠিক আছে, কালকের মধ্যে দশ হাজার পেয়ে যাবে, এই হোটেলে।

বিশ্বাসঘাতকের হাসি হাসল রীমা। ময়লা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা কাগজ আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল—চেক এই ঠিকানায় পাঠাবে। এটা প্যাসিফিক অ্যাণ্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লস এঞ্জেলস শাখার ঠিকানা। আমার ব্যাঙ্কার নয় এ—এদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে টাকাটা অন্য এক জায়গায় জমা করে দেবার, যার ঠিকানা তুমি জানতেও পারবে না।

এখন তোমার পার্সটা দাও?

পার্সটা ছুঁড়ে দিলাম রীমার কোলে। তৎক্ষণাত শিকারী নেকড়ের মত লুফে

নিল। পার্শে দু'শডলার ছিল। বের করে খালি পার্সটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

—গুডবাই। চালাকী করার চেষ্টা করো না ভুল করে। এই সপ্তাহের মধ্যে চেক পাঠিয়ে দিও।

আমি ভাবছিলাম রীমা বেরুলেই ওর পিছু নেব। কিন্তু মেটা ইটালিয়ান আর দুটো ষণ্ডামার্কা লোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। বুঝতে বাকী রইলনা, রীমার পিছু নিলে এরা আমায় আড়ং ধোলাই দিয়ে যমের দুয়ার দেখিয়ে দেবে। রীমা একটা স্যুটকেশ উঠিয়ে বাইরে অন্ধকারে মিশে গেল।

এই ষড়যন্ত্রের জাল কেটে বেরিয়ে আসার রাস্তা নেই। আমাকে অন্যায় খেলার বুড়ি করে রীমা সর্বনাশা ফাঁদ পেতেছে। লস এঞ্জেলসের ঠিকানা দিয়েছে রীমা, তার মানে এখনও হ্যালাণ্ড সিটি থেকে লস এঞ্জেলস পাড়ি দেবে? না একটা চাল মাত্র। রীমার খোঁজে নামতেই হবে, তাতে আমার মঙ্গল। একেবারে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

দ্রুত ষ্টেশনে এলাম। শেষ গাড়ী চলে গেল—না রীমাকে দেখা গেল না। মধ্য রাতে বাড়ী ফিরলাম। সরিতা ঘুমিয়ে পড়েছে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে। লাউঞ্জে গিয়ে পাসবইটা বার করলাম। মাত্র দু হাজার ডলার জমা আছে, দশ হাজারের বণ্ড। ব্রিজের কাজে টাকা পেতে এখনও আরো আট দিন। এখন আমার হাতে তিনটে কাজ জরুরী। এক, রীমার খোঁজ করা। দুই, ওর হাত থেকে রিভলবারটা হাতানো। তিন, রীমার মুখ বন্ধ করা। রীমার খোঁজ পাওয়ার একমাত্র উপায় লস এঞ্জেলসের ব্যাংকে গিয়ে চালাকী দ্বারা ঠিকানা হাসিল করা।

॥ ৭ ॥

আটটার আগেই অফিসে এলাম। টেবিলের উপর এক গাদা ফাইল চিৎ করা আমার জন্য। ওরবোর্ণ কে বললাম—আমায় দুদিন ছুটি দাও।

—ইমপসিবল। ওরবোর্ণ ধমক দিয়ে উঠল!—ব্যাপার কি?

—পার্সোন্যাল। চোখ নামিয়ে নীচু স্বরে বললাম।

—এখন ছুটি নিলে ব্রিজের কাজ পাঁচদিন পেছিয়ে যাবে। এরকম চিলে

কাজ হলে ভবিষ্যতে ভাল কণ্ট্রাকট হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ওরবোর্ণকে বলতে পারছি না আমি কত অসহায়।

ওরবোর্ণ চলে যাবার পর চেক বুক বার করে, রীমা মার্শালের নামে চেক কেটে একটা খামে বন্ধ করে লস এঞ্জেলস ব্যাংকে ঠিকানা লিখে খামটা আউট ট্রেতে ফেলে দিলাম। তারপর আমার ব্যাংকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম আমার বণ্ড গুলি বেচে দিতে।

আমি জানি ব্ল্যাকমেলিং-এর শক্ত জালে জড়িয়ে পড়েছি, গচ্ছা যাবার আগে রীমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। দিন রাত কাজ করলে দুটো দিন বাঁচাতে পারে।

পরবর্তী দু সপ্তাহ আমি পাগলের মত কাজ করে গেলাম। সকাল পাঁচটায় বেরুতাম আর ফিরতাম মাঝরাতে।

—কাল থেকে তিনদিনের ছুটি নিলে অসুবিধা নেই তো? ওরবোর্ণকে বললাম।

—জীবনে কোন মানুষকে এরকম গাধার মত খাটতে দেখিনি, দোস্ত। সত্যিই তুমি ছুটি নেবার যোগ্য।

বেলা একটার সামান্য পর লস-এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করলাম। ট্যাক্সি ধরে সোজা হাজির হলাম প্যাসিফিক অ্যাণ্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। বিরাট ব্যস্ত ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক কাউণ্টারে লম্বা লাইন। একটা লাইনে দাঁড়ালাম। জমা দেবার ফর্মে রীনা মার্শালের নাম লিখে দশ ডলারের পাঁচ খানা নোট পে করে, তলায় লিখলাম হ্যামিলটন। ফর্ম ও টাকাটা এগিয়ে দিলাম কাউণ্টারের ফোকরে। ক্লার্ক উল্টে পাল্টে ফর্মটা দেখে বিস্ময় দৃষ্টি ফেলে আমায় দেখে বলল—জাষ্ট এ মিনিট।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। ফর্ম হাতে নিয়ে গ্যালারীতে উঠে গেল ক্লার্ক। একটা লিষ্ট দেখে, একটা অটো মেশিনের বোতাম টিপল। মেশিন থেকে বেরুল একটা কার্ড। কার্ডটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত এল ক্লার্ক।

—ভুল করেছেন মিষ্টার। এ নামে কোন অ্যাকাউণ্ট নেই। আমি মিনমিনিয়ে বললাম।—হতে পারে। কারণ মিস রীণার কাছে জুয়ায় আমি হেরেছিলাম! ওকে কথা দিয়েছিলাম ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব। তবে ও বলেছিল ওর পাস বই এ ব্যাঙ্কে নেই শুধু জমায় টাকা আপনারা হ্যাণ্ডেল করেন।

আপনি নাম ভুল করছেন, রীনা নয় রীমা হবে।

—হতে পারে। আমার কাছে ওর ঠিকানা নেই। ওর ঠিকানাটা বলতে পারেন ?

—আপনি ব্যাঙ্কের কেয়ার অফে চিঠি দিন আমরা পাঠিয়ে দেব। এ রকম নেগেটিভ উত্তর আশা করেছিলাম।

—ওকে, ধন্যবাদ।

নোটগুলো পকেটে রেখে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলাম। এই আমার প্রথম পদক্ষেপ। এবার বুঝতে পারলাম রেকর্ড কার্ড কোথায় রাখা হয়। সেই জায়গা অবধি পৌছুতে হবে।

তারপর একটা সস্তার হোটেলে ঘর ভাড়া নিলাম। ওখান থেকে ফোন করলাম প্যাসিফিক অ্যাণ্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। ম্যানেজার ফোন ধরল। নাম বললাম এডওয়ার্ড মাষ্টার্স, বিজনেসের কথাবার্তা বলতে চাই। পরের দিন দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিলাম।

পরের দিন ম্যানেজারের কামরায় হাজির হলাম। পরিচয় দিলাম বিল্ডিং কণ্ট্রাকটর ফার্ম-এর প্রতিনিধি। হেড অফিস ন্যুইয়র্কে, লস এঞ্জেলসে একটা ব্রাঞ্চ খোলার ইচ্ছে আছে এবং এই ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই, বিশ লাখ ডলার দিয়ে।

ব্যাপারটা কর্ণগোচর হতেই আমাকে শাসালো পার্টি ভেবে তেল দিতে শুরু করল ম্যানেজার। সাহায্যের হাত বাড়ালেন। আমি সুযোগ হাত ছাড়া করলাম না। বললাম।

—আপনার অফিস ইকুইপমেন্ট সিস্টেম খুব আধুনিক।

আমার অফিসেও এ রকম করতে চাই। এ ধরনের ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করে কারা ?

—চ্যাণ্ডলার অ্যাণ্ড ক্যারিংটন।

—আমাদের কাজ কারবার আপনাদের মত। সারা দেশে আমাদের অসংখ্য ক্লায়েন্ট রয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। এজন্য রেকর্ড রাখা খুব জরুরী। আপনাদের এখানে রেকর্ড রাখা মেসিনটা দেখে লোভ হয়!

—রিয়েলী। দামী বটে মেসিনটা তবে কাজ ও দেয় অদ্ভুত। আপনি একবার দেখে আসতে পারেন কি সুপার্ব কাজ করে মেসিনটা। আমি যেন এই চাইছিলাম।

আমায় একজন ক্লার্ক নিয়ে এল মেশিনটা দেখাতে। ক্লার্ক আমার বুঝিয়ে চলেছে মেশিনটা কি ভাবে কাজ করে।

—আমাদের সাড়ে তিন হাজার ক্লায়েন্ট আছে। প্রত্যেক ক্লায়েন্টকে নাম্বারিং করা হয়েছে। নম্বরের লিষ্ট টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।

কার্ডটা দেখলাম। দ্রুত পড়ে নিলাম নামগুলো। সেখানে রীমার নাম পেলাম। রীমা মার্শাল ২৯৯৭। নম্বরটা মনে মনে টুকে নিলাম।

—নম্বর দেখে। এই বোতাম নম্বরটা পাঞ্চ করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরের কার্ডটা বেরিয়ে আসে।

—শুনতে বেশ ভালই লাগছে। কাজ কেমন করে?

—খুব সুন্দর। দেখুন একবার। আমাদের লিষ্টের প্রথম নম্বরের মালিক আর অ্যাটকিন্স। বলেই একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের ট্রেতে চলে এল একটা কার্ড। সেই কার্ডের উপর লেখা অ্যাটকিন্স বড় বড় অক্ষরে।

—আমি একবার দেখি?

—ওকে।

আমি টিপলাম ২৯৯৭ সংখ্যাটি। কার্ড বেরুল রীমা মার্শালের। তাতে ঠিকানা লেখা। অ্যাকাউন্ট। সান্তা বারবা। ক্রেডিট দশ হাজার ডলার।

আধ ঘণ্টা পর সান্তা বারবার পথে পাড়ি দিলাম। ইউনিয়ন অ্যাণ্ড প্যাসিফিক ব্যাংক খুঁজে পেলাম। ছোট ব্রাঞ্চ অফিস। ব্যাঙ্কের সামনেই ছোট একটা হোটেল। ছোট খাট একটা ঘর ভাড়া নিলাম হোটেলের। ঘরের জানালার সামনেই ব্যাংকের গেট। একটা চেয়ার টেনে বসলাম জানলার পাশে। কিন্তু সারাদিনেও রীমাকে আশেপাশে দেখা গেল না। পরের দিন সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু রীমার খোঁজ পাওয়া গেল না।

দুটো দিন উদভ্রান্তের মত কাটিয়ে সকাল এগারোটায় অফিস এলাম প্লেনে। ওরবোর্ণ আমায় দেখেই ছুটে এল। দেখে মনে হল কদিন যেন ও ঘুমোয় নি। ওকে দেখে আমার শরীরে একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল।

—কোথায় ছিলে? ওরবোর্ণের গলা থমথমে। সরিতা···।

—কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

—খারাপ খবর জ্যাক। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমার শরীর কাঁপছে কথাটা শোনার পর।—খুব চোট পেয়েছে।

—কোথায় ও ?

—ষ্টেট হসপিটলে। কিন্তু শোনো।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম ঝড়ের মত। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা হাজির হলাম হাসপাতালে।

॥ ৮ ॥

লম্বা কড়িডোর পেরিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে আমায় নিয়ে এল। বেডের পাশে দাঁড়িয়ে সরিতাকে দেখছি। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, বাকী শরীরটা চাদরে ঢাকা। মোমের মত সাদা শরীর।

আমার জীবনের সাংঘাতিক ঘণ্টা। ওকে আর একবার দেখলাম, মন বলছে আর কখনও সরিতা কথা বলবে না, দেখবে না, কখনও আমার বুকে মাথা রাখবে না।

আপ্যার্টমেণ্টে ফিরে এলাম বিকেলের দিকে। চিন্তা ভাবনায় মনটা দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। আট দিনের মধ্যে রীমাকে দশ হাজার ডলার দিতে হবে।

এতেই ওর চাহিদা শেষ হবে না। ফাটা জুতোর মত হা বেড়েই যাবে। সরিতার জন্য চিকিৎসার খরচ—সেও এলহি ব্যাপার।

রাত আটটার সময় ডঃ গুডইয়ার হাসপাতালে এলেন, খবর পেয়েই আমি চলে এলাম। ডাক্তার এখনই অপারেশন করতে চান।

—আপনার স্ত্রীর অবস্থা খুব সংকটজনক। ভেরি ডিফিক্যাণ্ট অপারেশন। বাঁচবার আশা কম, এতে আমি প্রাণপণ লড়ে যাব।

পরের তিন ঘণ্টা জীবনের সব চেয়ে সংঘাত পূর্ণ সময়। ইতিমধ্যে সস্ত্রীক মেয়র ম্যাথিসন এবং ওরবোর্ণ এসে গেছে। রাত এগারোটার সময় অপারেশন টেবিল থেকে বেরিয়ে ডঃ গুডইয়ার বললেন—অপারেশন সাকসেস। আপনার স্ত্রী বেঁচে যাবে।

কিন্তু ওর স্বরে যেন একটা মিথ্যে লুকিয়ে ছিল যেটা বলতে চাইছিলেন না বুঝতে পারছি। হয়ত কোন সাংঘাতিক কথা—বাঁচবে কিন্তু ভবিষ্যতে হুইল চেয়ারের সাহায্য নিয়ে চলতে হবে। স্মরণ-শক্তিও হারাতে পারে।

—আপনি একে সাকসেস বলছেন! আমি চিৎকার করে উঠলাম। ঘর থেকে

বেরিয়ে এলাম। পা রাখলাম হাসপাতালের গেটের বাইরে। অন্ধকার রাত আমার মনের চারপাশে আবার ঘিরে ধরল চিন্তার জট।

আগামী তিনদিন আমি টেলিফোনের অপেক্ষায় রইলাম। সরিতা জ্ঞানশূন্য অবস্থায়—জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে। তৃতীয় দিন রাত ন'টায় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিলাম দ্রুত।

—হ্যালিডে বলছি।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে। এসটার হোটেলের বারে অপেক্ষা করছি।

রীমার ফোন। হৃদপিণ্ডটা ধক্ করে উঠল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বরসাতী গলিয়ে বেরুলাম। হ্যালণ্ড নগরের সবচেয়ে শানদার হোটেল। তখন বার প্রায় খালি। কোনের দিকে মাঝ বয়সী এক মহিলা বসে শ্যাম্পেন খাচ্ছে। অন্য কোনে একজন শক্তিমান কঠিন পুরুষ। পরণে ক্রিম রংয়ের স্পোর্ট কোট, সবুজ রংয়ের প্যাণ্ট, গলায় লাল সাদা রুমাল বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছে ট্রাক ড্রাইভার, হঠাৎ পয়সায় ফুলে উঠেছে, না হলে ওদের মত মানুষ এসটার হোটেলে ঢুকতে সাহস পায় না।

মাসল—তোলা হাতে ধরা হাইবলের গ্লাস। বারের ঠিক মধ্যিখানে বসে রীমা, আজ ওকে চেনাই যাচ্ছে না। সিনেমার নায়িকার মত লাগছে। চুলে মডার্ণ ড্রাই করেছে। আমার পয়সায় ফুটানি। চেহারায় জেলাও বেড়েছে বেশ।

আমি ওর কাছে গিয়ে বসলাম। কোনের ম্যাসলম্যান স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আমায়। বুঝলাম লোকটা রীমার বডিগার্ড।

রীমা সাপের চামড়ার সুদৃশ্য ব্যাগ খুলে একটা চিঠি এগিয়ে দিল। চিঠিটা পকেটে রাখলাম।

—দশ হাজার ডলার পেয়েছ। এখন আমার পয়সা নেই। আমার বউয়ের অবস্থা খুব খারাপ, অর্থের খুব টানাটানি চলেছে।

একটা সোনা মোড়া সিগারেট কেস বার করে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ডানহিলের সোনার লাইটার দিয়ে ধরাল।

—মানে আমরা জেলে যাত্রা করছি।

—সত্যি বলছি, আমার বউয়ের জন্য জলের মত পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আগামী মাসে তোমাকে টাকা দেব।

ভাঙ্গা কাসি বাজার মত হেসে উঠল রীমা।

—আজই আমি চাই। নচেৎ জেলের রাস্তায়…। আমি জানি আমাকে

সরিয়ে দিতে চাইছ। মরার ভয় আমি পাই না। কোনে বসা ঐ মাসলম্যানকে দেখছো? আমায় ভালবাসে। কোন প্রশ্ন করে না, আমি যা বলি তাই শোনে কলুর বলদের মত। সব সময়ে আমার আশেপাশে থাকে।

এই পরিস্থিতি থেকে আমার নিস্তার নেই। ব্ল্যাকমেলিং-এর জালে হাত পা বাঁধা পড়ে গেছে।

আমি চেক লিখে ওর হাতে দিলাম।

—এই নাও। আমার গলার স্বর যেন আমিই চিনতে পারছি না।—তোমাকে সাবধান করছি। তুমি ঠিক বলেছ—আমি তোমায় খুন করব।

—একদিন আমারও সময় আসবে।

রীমা হেসে উঠল।

—সিনেমার ডায়লগ পড়ো না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা হাসপাতালে এলাম।

ডাক্তার বিনবোর্জ হ্যাণ্ডশেক করে, উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—মিঃ হ্যালিডে, আপনার স্ত্রীর অবস্থা বিশেষ ভাল না। ডাঃ গুডইয়ারের সঙ্গে কনসালট করেছি উনি ডঃ জিমারম্যানকে দেখাতে বললেন। ডঃ জিমারম্যান স্পেশালিষ্ট—ব্রেন সার্জান। ওকে দেখাতে হলে হ্যালণ্ড হাইটসএ ওর স্যানাটরিয়ামে ভর্তি করাতে হবে।

—কত খরচ হবে?

—মনে হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে তিনশ' ডলার।

অসহায় ভাবে কাঁধ নাড়লাম। খরচ দিনদিন বৃদ্ধির মুখে।

॥ ৯ ॥

প্যাসিফিক অ্যাণ্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাশের হোটেলে একটা কামরা ভাড়া নিলাম তিনদিনের জন্য। এই তিনদিনের মধ্যে কাজ গুছাতে হবে। প্রথম দু রাত্রির নিরাশায় কাটল।

তৃতীয় রাত। বরসাতি নিয়ে বেরুলাম বৃষ্টির মধ্যে। তখনও দু চারটে ড্যান্স হল খোলা ছিল। সমুদ্রতটে একটি রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলাম। ভেতর থেকে নাচ

গানের সুর ভেসে আসছে। ঢোকার মুখেই দেখলাম একটি দৈত্যকার মানুষ হুড়মুড় করে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নামল। এ সেই রীমার দোস্ত। দ্রুত ওর পিছু নিলাম। পার্কিং লটে গিয়ে একটা পোয়েন্টিয়াকের দরজা খুলে কি পকেটে ফেলে আবার রেস্তোরায় ঢুকে গেল। ও বেরিয়ে যেতেই পোয়েন্টিয়াকের পাশে ছুটে এলাম। লাইটার জ্বালিয়ে ষ্টিয়ারিং হুইলে টাঙ্গানো লাইসেন্স ট্যাগটায় নজর পড়ল— এড বাসরী-২, ইষ্টশোর, শান্তা বারবা।

অলডে নাইট ওপেন একটি গ্যারেজ থেকে একটি ষ্টুডি বেকার ভাড়া করলাম। ঠিক তিন মাইল ড্রাইভ করার পর সান্তা বারবার ইষ্টশোরে পৌছলাম। লম্বা ষ্ট্রিপের মত বাড়ীগুলো ইষ্টশোরে। ২ নম্বর খুঁজে বের করতে দেরী হল না। একটা ছোট্ট বাংলো। ভেতরে সেই পোয়েন্টিয়াকটা দাড় করানো। বিড়াল সতর্ক হয়ে দৃষ্টি ছুড়লাম চার ধারে। না কেউ নেই। মেইন গেট দিয়ে হরিনের মত নিঃশব্দে ছুট দিয়ে ভেতরে এলাম। উঁকি মারলাম ঘরের মধ্যে। ওয়েল ডেকরেটেড লম্বা কামরা, দেওয়ালে কুরাচিপূর্ণ ছবি টাঙ্গানো খান চারেক, আর কোনে রয়েছে একটা কালার টিভি। অপর প্রান্তে রীমাকে দেখে চোখ থেমে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, মুখে সিগারেট, হাতে হুইস্কির গ্লাস। সবুজ রংয়ের চাইনিজ চেড়া ফ্লেয়ারের ফাঁক দিয়ে মসৃণ ধবধবে উরু দেখা যাচ্ছে। ভেতরের একটা দরজা খুলে বাসরী ঢুকল পরণে ঢিলে পাজামা, বুক হাতের ডেলা ডেলা মাংসপেশী উঠানামা করছে চলার সাথে। লাইট অফ করল বাসরী। তারপর এক এক করে বাংলোর সব আলো নিভে গেল। অন্ধকারে ডুবে গেল বাসরী ও রীমা।

বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলাম। এবার যেন রীমাকে খুন করার ফন্দিটা ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল মাথা থেকে। আগে আমাকে বাসরীকে সরাতে হবে। রীমার পাশে বাসরী থাকলে রীমার মুখ কখনই বন্ধ করা যাবে না।

সে রাতে ঘুমুতে পারিনি একবারও।

পরের দিন আবার শান্তা বারবার রীমার বাংলোয়। এবার আমি নিয়ে এসেছি একটা দূরবীন। একশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ওয়াচ শুরু করলাম। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাসরী প্রথম বেরুল দরজা খুলে। আজকের সূর্য্য অনেক উজ্জল। একটু পরেই দেখা গেল রীমাকে। ভূতের মত

লাগছে ওকে। গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। বাসরী বসল পাশে। তারপরই নীল ধোঁয়া উড়িয়ে পোয়েন্টিয়াক পশ্চিম দিকে চলে গেল।

গুপ্ত স্থান থেকে বেরুলাম। এই সুযোগে রীমার পিস্তলটা হাতাতে হবে। দরজার ক'লং বেল টিপে ধরলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। কেউ নেই ঘরের মধ্যে। শব্দ করে বেজেই চলেছে বেল। একটু আগে রীমার ফেলা চাবীটা লেটার বক্স থেকে বার করে তালা খুললাম।

খিড়কির পাশেই একটা ডবল বেড খাট—পাশেই প্রসাধনদ্রব্যে সাজানো ড্রেসিং টেবিল। কোনে একটা ক্যাবিনেট। সাবধানে সব দেরাজ খুলে দেখলাম। না পিস্তলের নাম গন্ধ নেই। শুধু নতুন কাপড়ে চোপড়ে ঠাসা। আলমারীর মধ্যে হ্যাঙ্গারের মেলা শুধু। তাতে টাঙ্গানো হরেক ডিজাইনের লোভনীয় রংয়ের ফ্যাসন দুরন্ত ড্রেস। উপরের দেরাজে পেলাম একটা ডিবে। খুলে ফেললাম ডিবেটা। চিঠি পত্রে ঠাসা—আর শুধু ছবির মেলা। বেশীর ভাগ ছবি রীমার। হঠাৎ একটা চিঠি আমার চোখ কেড়ে নিল।

তিনদিন আগে পোষ্ট করা হয়েছে। খুলে পড়তে শুরা করলাম।

২৩৪ ক্যাসল আর্মস
এসেবী এভিনিউ, সানফ্রানসিসকো

প্রিয় রীমা,

গত রাতে উইলবারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ও প্যারোলে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে তোমায় হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে। নেশাও করছে আগের মত, আগের চেয়ে সাংঘাতিক হয়েছে। তোমাকে খুন করার জন্য পাগলের মত ঘুরছে। সাবধানে থাকবে। আমায় ওকে দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

ইতি—ক্লেয়ার।

উইলবারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। পুরোনো দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাষ্টির বার। চকিত রীমা। উন্মত্ত উইলবার, হাতে চকচকে ছুরি। তেরো বছর পর ছাড়া পেয়েছে। এবার রীমাকে ছাড়বে না। আমার শরীরে একটা বিদ্যুত শিহরণ বয়ে গেল। উইলবারই বোধহয় আমার সমস্যার সমাধান কর্তা। ক্লেয়ারের ঠিকানা নোটবুকে নোট করে চিঠিটা যথাস্থানে রেখে দিলাম। রিভালবারটা পেলাম একটা ড্রেসের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাধা।

দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে দেখলাম রীমাও বাসরী আসছে। সঙ্গে সঙ্গে

নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। ওরা সোজা এসে ঢুকল ঘরে। তারপর সামান্য উত্তপ্ত কথাবার্তা। ওদের কথোপকথনে বুঝতে অসুবিধা হল না—রীমার এই প্ল্যাণ্ড ব্ল্যাকমেলিংয়ে বাসরীর সায় নেই। আমার সমস্যার সমাধানের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছি। উইলবারের খোঁজ করে রীমার ডেরা বাৎলে দিলে—রীমার খুন খুব সহজে হবে। কিন্তু সমস্যাও আছে, রীমা যদি বুঝতে পারে ওর রিভালবার অদৃশ্য হয়েছে, ভয়ে হয়ত বাংলো ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

হোটেলে ফিরে এলাম। সেদিনই সান ফ্রানসিসকো রওনা হয়ে গেলাম। উইলবারের ঠিকানা আমার কাছে নেই। শুধু আশা বলতে, মেয়েটার নাম আর ঠিকানা। ট্যাক্সি নিয়ে এসেবী অ্যাভিনিউর রুজভেলট হোটেলে এলাম। এক ওয়েটারকে নক করলাম।

—আমি একটি মেয়ের খোঁজ চাইছি।

পাঁচ ডলারের একটি নোট দু আঙুলে তুলে ওর চোখের সামনে নাচিয়ে দিলাম।

—১৩৪ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্টে যে থাকে তার নাম ?

—ক্লেয়ার সিমস ?

—হ্যাঁ। কে ও ? কি করে ?

নোটটা ছিনিয়ে নিল হাত থেকে।

—গেটসবী ক্লাবে ষ্টিপট্রিজ করে। কিন্তু সাবধান ভীষণ ক্ষ্যাপা মেয়ে। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। গেটসবী ক্লাবে হাজির হলাম। তখন সবে ষ্টিপট্রিজ শুরু হয়েছে। ক্লেয়ার সিমস-এর নাচ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রস্ফুটিত—উন্নত স্তন ও গুরু নিতম্বে এবং কালো ভুষো চুলের অধিকারী ক্লেয়ার। খদ্দেররা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে নগ্ন দেহের তরঙ্গ দেখছে। মাঝরাতে দরজার সামনে সামান্য হট্টগোল উঠল। মাঝারী চেহারার একটা ছোকরা ঢুকল, রূপালী ফ্রেমের চশমা চোখে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে গানে তাল ঠুকছে। কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে। শরীর ফ্যাকাশে। নিজের চেহারা নিজের কাহিনীর চরিত্র। এই উইলবার।

একটা জবরদস্ত ছুকরীকে বগলদাবা করে উইলবার আমার পাশের টেবিলটায় বসল। উইলবারকে রীমার পিছু লাগালে, খুনের অপরাধে আমিও সমান অপরাধী হব। রীমার ঠিকানা বলা মানেই—হত্যা পারোয়ানায় হস্তাক্ষরের সামিল। যদি রীমা মারা না যায় পরে তাহলে সারা জীবন ধরে ব্ল্যাকমেলিং-এর ধমকি শুনতে

হবে। উইলবারকে রীমার ঠিকানা জানানোর আগে সরাতে হবে বাসরীকে। রীমা আর বাসরীর বার্তালাপ শুনে বুঝলাম পুলিশ বাসরীর খোঁজ করছে। যদি বাসরীকে ফলস ফোন করে যে পুলিশ ওকে ধরতে যাচ্ছে তাহলে বাসরী নিশ্চয়ই কেটে পড়বে।

কিছুক্ষণ পর উইলবার ও মেয়েটা বেরুল রাস্তায়। ওদের ফলো করে চললাম। আধ ঘন্টা হাঁটার পর ওয়াটার ফ্রন্টের কাছে একটা রদ্দি হোটেলে ঢুকল ওরা। হোটেলটির নাম এণ্ডিসন হোটেল। বুঝতে পারলাম না উইলবার এই হোটেলে স্থায়ী ভাবে উঠেছে? না অস্থায়ীভাবে? দ্রুত নিজের হোটেলে গিয়ে এণ্ডিসন হোটেলে ডায়াল করলাম। বুকের মধ্যে কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে আসছে। যেন কিছু বলতে পারছি না। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল রিসেপসনিষ্টের গলা।

—হোলড অন লাইন প্লিজ।

মিনিট পাঁচেক রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইলাম। ফোনের মধ্যে একটা মেয়ের উত্তপ্ত স্বর শোনা গেল।—আমি কি জানি কে? হাজারবার বলেছি, জানিনা। নিজেই জিজ্ঞেস করো। মেয়েটার হাল্কা চিৎকারের ক্রোধ ভেসে এল —ইতর—শুয়োর! ছুঁচো। খবরদার আমার গায়ে আর হাত লাগাবে না। এবার উইলবারের গলা শোনা গেল—হ্যালো কে?

—উইলবার?

—হ্যাঁ। কে বলছো?

আমি দ্রুত কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম।—গত রাতে রীমা মার্শালকে দেখেছি।

—তুমি কে?

—তার দরকার নেই। জানতে চাও রীমা কোথায়?

—হ্যাঁ। কোথায় ও বল?

—দু দিনের মধ্যে ওর ঠিকানা পেয়ে যাবে, শুক্রবার সকালে, সঙ্গে ওর কাছে যাবার ভাড়াও। শুক্রবার অবধি অপেক্ষা করো।

—কিন্তু তুমি কে? তুমি কি ওর বন্ধু?

—আমি কি ওর বন্ধুর মত কথা বলছি? হুকে আটকে দিলাম রিসিভার।

পরের দিন সকালে স্যানেটোরিয়াম থেকে খবর পেলাম ডাঃ জিমারম্যানের চিকিৎসায় সরিতা সুস্থ হয়ে উঠছে।

এদিকে আমার চিন্তা ভাবনা সব কেড়ে নিয়েছে রীমা। রীমাকে খুন করার

পরিকল্পনা মানেই নিজের জেল হওয়া থেকে মুক্তি। উইলবারকে ঠিকানা পাঠালে কি গ্যারান্টি আছে রীমাকে খুন করার? কিন্তু···। সত্যি কি বিচিত্র আমার পরিকল্পনা? যোজনা এবং ঘটনা দুই—দু' য়ে শূন্য বিষ। রীমার খুন। উইলবারের জেল।

বিকেল পাঁচটার সময় একটা সাদা কাগজে বড় বড় অক্ষরে রীমার নাম ও ঠিকানা লিখলাম। একটা খামের মধ্যে কাগজটা ভরে সঙ্গে দশ ডলার গুঁজে বন্ধ করে দিলাম। খামের উপর উইলবারের ঠিকানা লিখে ডাক টিকিট লাগিয়ে পোষ্ট করলাম। খামটা যে মুহূর্তে আমার হাত থেকে লেটার বক্সে পড়ল সেই মুহূর্তে বিচিত্র এক শিহরণ ধমনীর মধ্যে ছুটে গেল।

॥ ১০ ॥

পরের দিন সকাল ছ'টার আগেই পুলের কাজ যেখানে হচ্ছিল সেখানে এলাম। কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। ঘণ্টা দেড়েক দেখা শুনো করলাম স্পটে। অফিসে যখন ঢুকলাম তখন ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে দেখলাম পৌনে আটটা বেজেছে। আর আধ ঘণ্টা পর উইলবার আমার চিঠিটা পাবে। দশটা অবধি ব্যস্ত রইলাম অফিসের নানা রকমের ঝামেলায়। দশটার একটু পরে এণ্ডারসন হোটেলে ফোন করলাম। কিন্তু যার জন্য ফোন তাকে পাওয়া গেল না। উইলবার হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। তাহলে উইলবার সান্তা বারবায় রওনা হয়ে গেছে।

রবিবার ও সোমবার ওরবোর্ণের সঙ্গে পুলের কাজে ব্যস্ত রইলাম। মঙ্গলবার কাটল অফিসের কাজে। বধুবার আর বৃহস্পতিবার ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম।

আজ শুক্রবার রীমার ইনস্টলমেণ্ট দেবার দিন। আজই আবার সরিতার দ্বিতীয় অপারেশন হবে। চার ঘণ্টা ধরে চলল অপারেশন। অপারেশন সাকসেস। ঠিক সেই সময়ই অফিস থেকে আবার ফোন এলো।

—মিষ্টার হ্যালিডে। ফোনের জন্য দুঃখিত। কিটি নামে এক ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট আপনার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

ক্ষণিকের জন্য আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল।

—আমি পাঁচটা নাগাদ আসছি।

ফোন রেখে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। তাহলে কি আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে?

ডাঃ গুডইয়ার জানালেন কয়েক মাসের মধ্যে সরিতা একদম ভাল হয়ে যাবে।

দু একদিনের মধ্যে সরিতার সঙ্গে দেখা করতে পারব। আমি ভাবছি এই দু দিনের মধ্যে আমি লস এঞ্জেলস জেলে পৌঁছে যাব।

দশ মিনিট পর অফিসে পৌঁছলাম। ক্লারা টাইপ পিটছে। আমাকে দেখেই হাত উঠল। বরসাতী খুলতে খুলতে বললাম, আনন্দের খবর। সরিতা একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।

—গুড নিউজ, মিঃ হ্যালিডে।

—পুলিশ সার্জেন্ট কোথায়?

—আপনার চেম্বারে বসে।

চেম্বারে ঢুকলাম। চামড়ায় মোড়া চেয়ারটায় বসে একজন ভারিক্কি চেহারার বয়স্ক লোক। চেহারায় পুলিশী কঠোরতা। নিষ্ঠুর চোখ, মোটা ঠোঁট, ভারি কাঁধ, পেটটা এগিয়ে এসেছে চর্বির দৌলতে, মাথায় আধপাকা চুলের বাহার। আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে বললো।

—মিঃ হ্যালিডে? আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিটি। সান্তা বারবার সিটি পুলিশ।

—আপনার জন্য কি করতে পারি? ওঁকে বসতে বললাম। কিটি বসল চেয়ারে। ওর সবুজ চোখ ঘুরছে আমার দিকে।

—জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এসেছি। মিঃ হ্যালিডে। আপনার সহযোগীতা আশাকরি। আমরা জিংকস ম্যানডেন নামে এক ব্যক্তিকে খুঁজছি। আপনি ওকে চেনেন?

এরকম নাম আমি জীবনেও শুনিনি।

—জিংকস ম্যানডেন? না তো।

পকেট থেকে একটা চুইংগাম বের করে মুখে পুরে দিল কিটি। কিন্তু চোখের তারা স্থির নিবদ্ধ আমার মুখে।

—কি ব্যাপার বলুন তো? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সশস্ত্র ডাকাতির আসামী ম্যানডেন। গতকাল সান্তা বারবা ষ্টেশনে একটি পরিত্যক্ত গাড়ির ষ্টিয়ারিং হুইলে ম্যানডেনের আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছি। গাড়িটা

লস এঞ্জেলস থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছিল। ঐ গাড়ীর মধ্যে একটা কাগজের টুকরো পেয়েছি যাতে আপনার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর এল আমার। তাহলে ম্যানডেন কি বাসরী?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করল একটি খাম তার মধ্য দিয়ে বার করল একটি ছবি। বাসরীর ছবি। ছবিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল।

—না। একে আমি চিনি না।

—তবে গাড়ীর মধ্যে আপনার নাম ঠিকানা এল কি করে?

—আপনার কোন সাহায্য করতে পারব না সার্জেন্ট।

—বিচিত্র সব ধান্দা। সব উলোট পালট হয়ে যাচ্ছে।

গাম চিবুতে চিবুতে উঠে দাঁড়াল কিটি।

—আপনি একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করুন মিঃ হ্যালিডে। হয়ত ওর কথা ভুলে গেছেন। ম্যানডেনকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—আমি ওকে দেখিই-নি, চিনব কি করে!

—গুড নাইট। কিটি চলে গেল। আমার শরীর ঘামে সপসপ করছে।

পরের দুটো দিন উৎকণ্ঠায় কাটল। প্রতি মিনিটে অপেক্ষা করছি এই বুঝি রীমার ফোন এল, নচেৎ—গ্রেপ্তার করতে পুলিশ এলো বুঝি। রবিবার সকালে সার্জেন্ট কিটি আবার এল। মুখে চুইংগাম, চিবুতে চিবুতে বলল, মিঃ হ্যালিডে আপনি ম্যানডেনকে না জানলেও, ও আপনাকে চেনে। সান্তা বারবার যে আস্তানায় গা ঢাকা দিয়েছিল সেখান থেকে লাইফ ম্যাগাজিনের একটি কপি উদ্ধার করেছি। যে সংখ্যায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই ছবিতে পেন্সিলের মার্কিং করা ছিল। তার থেকে মনে হয় ও আপনাকে চেনে এবং আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক জড়িত।

—না লোকটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

—আচ্ছা, আপনি রীমা মার্শাল নামে কোন মেয়েকে চেনেন? কিটির মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা নেমে এল আমাদের কথার মাঝে। তারপর বললাম।

—না, চিনি না। আর কোন প্রশ্ন?

আমার দিকে দেখল কিটি, চুইংগাম চিবুতে চিবুতে। কিটির চোখ আমার চোখে নিবদ্ধ।

…মেয়েটা খুন হয়েছে।

আমার হৃদপিণ্ড দৌড়ুচ্ছে রেসের ঘোড়ার মত।—খুন?

—হ্যাঁ রীমা মার্শালের খুন। ম্যানডেন পালিয়েছে, কিন্তু পেয়েছি মেয়েটার কাটা লাশ। চাকু মেরে মেরে শরীর চিরে দিয়েছে, তেইশবার আঘাত করা হয়েছিল।

আমি স্থির, কথা নেই মুখে। হাতের তালু ঘামছে। ইতিমধ্যে কিটি পকেট থেকে একটা খাম বের করল। তার মধ্য থেকে বার করল রীমার ছবি। বিভিৎস। সাংঘাতিক। চোখে দেখা যায় না।—আপনি একে চেনেন?

—না।

—মিঃ হ্যালিডে এটা খুনের মামলা। আপনি এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছেন। আপনি কখনও সান্তা বারবার গিয়েছেন?

এবার লুকোতে পারলাম না। ফেসে যাবার ভয়ে বললাম।

—হ্যাঁ গিয়েছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

—একটা রদ্দি হোটেলে উঠেছিলেন কেন? আর কেনই বা গিয়েছিলেন? আর সেখানে নাম ভাড়িয়ে ছিলেন কেন?

বুঝতে পারলাম আজ কিটি অনেক খবর জোগাড় করে এনেছে। তাই আমিও অন্য চাল চাললাম।—পুলের কাজে গিয়েছিলাম।

—ওকে হ্যালিডে। আর আপনাকে জ্বালাতন করতে আসব না। কিছু এলো মেলো সূত্র জড় করার চেষ্টা করছি। আমরা জানি কে খুনী?

—আপনি জানেন? কে খুনী?

—ম্যানডেন। আমরা ওকে ঠিক ধরব। ফাঁসীতে লটকাবো।

কিটি উঠল। আমি বিস্ময়ে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তাহলে রীমা মরেছে। কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছি না। সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বাসরীকে খুনের দায়ে খুঁজছে কেন? বেচারা খুন না করেই ফাঁসীতে চড়বে? কারণ একমাত্র আমিই জানি রীমার খুনী কে? উইলবার।

আর এটা প্রমাণিত করতে পারে একমাত্র আমার স্বীকারোক্তি। তাতে কিন্তু অনেক ঝামেলা। গার্ডের খুনের মামলা আমার উপরই পড়বে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের সিকে ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হল কিটি। ওকে দেখেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মুখে চুইংগাম দাঁতে কাটছে। আমাকে দেখেই ব্যঙ্গ ভরে বলে উঠল। মিঃ হ্যালিডে

আপনি মিথ্যে বলছেন। আপনি রীমাকে জানতেন। রীমা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট থেকে জানতে পেরেছি, আপনি দু কিস্তিতে ওর নামে কুড়ি হাজার ডলার জমা দিয়েছেন। তবুও বলবেন আপনি ওকে চেনেন না।

—হ্যাঁ জানি। রীমা আমায় ব্ল্যাকমেল করছিল।

—আমিও সঠিক পথে চলেছি। কিন্তু আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল কেন?

সঠিক উত্তরটা আমি এড়িয়ে গেলাম। সাধারণ ব্যাপার। আমার সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল। তারপর যখন জানতে পারল আমি বিবাহিত তখনই আমাকে ধমকী দিতে লাগল, আমাদের সম্পর্কের কথা বলে দেবে স্ত্রীকে।

—ওকে। কাহিনী শেষ। আমি আপনাকে টানব না রিপোর্ট-এ।

হেসে উঠল কিটি। বড্ড কুৎসিত হাসি।—আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, কারণ এই মাসের শেষে আমি রিটায়ার হয়ে যাচ্ছি।

—ধন্যবাদ।

—ছ্যাটস ওকে মিঃ হ্যালিডে। একটা বিচিত্র হাসির ছায়া কিটির চোখে মুখে।

॥ ১১ ॥

স্যানাটরিয়াম থেকে বাড়ী ফিয়েছে সরিতা খুশীর বন্যার পার্টি থ্রো করলাম বাড়ীতে। মাঝ রাতে শেষ হল পার্টি। সবাই বাড়ী চলে গেছে। সরিতা বেডরুমে। শুধু ওরবোর্ণ আর আমি টেরেসে বসে শ্যাম্পেন গিলছি। দূরে নদীর উপর ব্রিজের কাজ চলছে দেখা যাচ্ছে। এক সময় ওরবোর্ণ বলে উঠল—অবশেষে সান্তা বারবার হত্যাকাণ্ডের আসামী পুলিশ ধরতে পারল। আমি তো ভেবেছিলাম খুঁজেই পাবে না।

মনে হল আমার বুকে কে যেন জোরে ঘুষি মারল। ক্ষণিকের জন্য কথা বেরুল না।—কি বললে?

—নিউইয়র্ক নাইট ক্লাবে ধরা পড়েছে। উরুতে গুলী লেগেছে কাউণ্টার অ্যাটাকে হয়ত বাঁচবে না। আসার সময় রেডিওতে শুনে এলাম।

দু'দিনের মাথায় বোমাটা ফাটল। খবরের কাগজে বেরুল রিপোর্ট। প্রথম

পৃষ্ঠায় একটি ছবি। বাসরী-আর আঠারো বছরের এক ভার্জিন মেয়ে হাত ধরাধরি করে আছে। ছবির নীচে লেখা ম্যানডেন গ্রেপ্তারের সময় নাইট ক্লাব সিংগারে পলিনটেরির সঙ্গে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়েছে। নাইট ক্লাবে সুন্দরী টেরির সঙ্গে যখন বিয়ের পার্টিতে মশগুল সেই সময় একজন গোয়েন্দা ওকে দেখে ফেলে। গোয়েন্দা এগুতেই বাসরী টের পায় এবং রিভালবার তোলে কিন্তু তার আগেই গোয়েন্দার পিস্তল গর্জন করে উঠে। সাংঘাতিক ভাবে আহত। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তাররা ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাত দিন শ্রম করে চলেছে!

দু'দিন পর আবার খবর বেরুল। অপারেশন সাকসেস। ভাল হয়ে উঠেছে বাসরী। এখন ওকে সান্তা বারবার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক-দিনের মধ্যে রীমার খুনের মামলা চালানো হবে বাসরীর বিরুদ্ধে।

খবর পড়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে লাগলাম। আর দেরী করা উচিত নয়। কালই কিটিকে আদ্যপ্রাপ্ত জানাতে হবে। না হলে একটা নিরপরাধ মানুষের সাজা হয়ে যাবে।

পরেরদিন বিকেল চারটার সময় হাজির হলাম কিটির ছোট্ট অফিসে।

—এসো। আমার দেখে অভ্যর্থনা করল কিটি।

চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল কিটি। আমি ওর সামনে বসলাম।

—কিসের হেতু আগমন মিঃ হ্যালিডে? কিটির চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

—আমি বলতে এসেছি, রীমা মার্শালের খুন ম্যানডেন করেনি।

হাতের চেটো দিয়ে নাকটা ঘষে বলল—তবে কে খুন করেছে?

—উইলবার।

—আপনি জানলেন কি করে?

—সে এক লম্বা গল্প। শুরু থেকে বলছি।

—সত্যিই আপনি স্বীকারোক্তি দেবেন, মিঃ হ্যালিডে?

—হ্যাঁ।

কিটি দেরাজ খুলে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার বের করে মাউথপীসটা আমার মুখের সামনে ধরল। বোতাম টিপে দিল। টেপ চলতে শুরু করল।

—আরম্ভ করুন, মিঃ হ্যালিডে।

আমার ব্ল্যাকমেলিং-এর ইতিহাসের শেষ অধ্যায় অবধি বললাম। এবং শেষ তীর ছোঁড়ার কাহিনীও বাদ দিলাম না। কিটি টেপ বন্ধ করল। দেরাজ

খুলে বার করল বড় একটা ফোল্ডার। তার মধ্য থেকে একটুকরো কাগজ খাম আর দুটো জিনিস বার করে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

—চিঠিটা আপনি লিখেছিলেন?

উইলবারকে পোষ্ট করা সেই চিঠিটা। চিনতে অসুবিধা হল না। বিচলিত দৃষ্টি ফেললাম কিটির মুখে।—হ্যাঁ। আপনি পেলেন কি করে?

—এণ্ডারসন হোটেল থেকে। এ চিঠি উইলবারের হস্তগত হয়নি। আমি হতবাক। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। কিটি বলে চলেছে।

উইলবার চিঠিটা পায়নি। চিঠি পৌছোছল সতেরো তারিখ সকালে। আর ষোল তারিখ রাতেই উইলবারকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, মাদক দ্রব্য ষ্টক করার অপরাধে। বাকী সাজা খাটছে এখন জেলে। পরে আমরা ম্যানেজারের কাছ থেকে চিঠিটা পাই।

আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে হেন বিশ্বাস করতে পারছি না আমি।—উইলবার যদি রীমাকে খুন না করে থাকে তাহলে করল কে?

—আমি বারবার বলেছি খুন করেছে ম্যানডেন। ছোকরা রীমাকে ধোঁকা দিচ্ছিল। আসলে ম্যানডেন ভালবাসত টেরী নামে এক গায়িকাকে। রীমা ব্যাপারটা জানতে পেরে, ম্যানডেনকে শাসায়, মেয়েটার সঙ্গ না ছাড়লে পুলিশে খবর দেবে। তাই ম্যানডেন পালাবার রাস্তা তৈরী হয়ে গেল।

কিন্তু রীমা ওকে যেতে দিতে রাজী নয়। ছোকরা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতাহাতি হল খানিকক্ষণ দুজনের মধ্যে। শয়তান যেন ভর করল ম্যানডেনের মাথায়। অবশেষে খুনই করে ফেলল রীমাকে। আমাদের হাতে এখন ওর বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রমাণ। তাছাড়া ম্যানডেন অপরাধ স্বীকার করেছে।

ফোল্ডার বন্ধ করে কিটি উঠে দাঁড়াল, এক চোখে দেখে নিল ঘড়ির কাঁটা। তারপর কিটি এগিয়ে এল।

—পাঁচ মিনিট, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে কিটি। আধ ঘন্টা পর এল;

—কি চিন্তা করছেন? পনেরো বছর জেলের কথা। আমি চুপ হয়ে বসে।

—সহযোগীদের গুডবাই করে এলাম। এখন আমি রিটায়ার ম্যান। সব জমা দিয়ে এলাম। কিন্তু এই টেপটা বাদে।

আমি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছি।—তার মানে ?

হাসির জোয়ার উপছে পড়ল কিটির মুখে।

—খুব সহজ। দেয়া—নেয়ার পালা শেষ করা যাক মিঃ হ্যালিডে। টাকাই সব। টাকার চাইতে আর বড় কি আছে ? কি বলেন! তুমি যদি টেপটা কিনতে চাও, আমি বিক্রি করতে রাজী। এতে তোমার জীবন বেঁচে যাবে।

টাকা। টাকাই সব। সবসে বড়া রুপাইয়া। রীমার মত কথা বলছে কিটি। অন্যায় খেলা আবার চক্রাকারে ঘুরে শুরুর পথ ধরেছে। রাগে আমার শরীর রিরি করছে। কিন্তু সংযত হয়ে বললাম—কত ?

—রীমা ত্রিশ হাজার চেয়েছিল ? আচ্ছা আমায় বিশ দিও। বদলে টেপ আর রিভালবার দুটোই পাবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কাঁধ ঝাঁকালাম।—ঠিক আছে। রাজী। কিন্তু পরশুর আগে নয়। রবিবার অফিসে এসো—পেয়ে যাবে।

—না অফিসে নয়। রবিবার সকালে আমি খবর দেব কোথায় দেয়া—নেয়ার পালা হবে।

—ওকে। আমি উঠলাম। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম পুলিশ চৌকি থেকে।

মাথার মধ্যে বিচিত্র অনুভূতির পোকাগুলো একত্রে গুঞ্জন করে উঠল।

রীমার কাছ থেকে পার পাওয়া আমার সাধ্য ছিল না।

কিটির নির্দেশ মত ট্যাভের্ণ আর্মসে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে শুধু ভারি একটা ব্রীফকেস। বারের মধ্যে পা রাখলাম। কিটি এক কোনে বসে ভবল স্কচের মৌতাত নিচ্ছিল। ওর দিকে এগুলাম। কিটির দৃষ্টি আমার ব্রীফের উপর।

—হ্যালো ফ্রেণ্ড। কোন মদিরায় গলা ভেজাও ?

আমি নিঃশব্দে বসলাম পাসের চেয়ারে। আমাকে চুপ থাকতে দেখে বলল।

—সব এনেছো ?

—না।

—না ? ভূখা নেকড়ের মত গর্জে উঠল,—হারামীর বাচ্চা, জেলে যেতে চাও ?

—আজ সকালে সবেমাত্র বণ্ড বিক্রি হয়েছে। এখন অবাধ টাকা তুলতে পারিনি আমার সঙ্গে চলো হাতে দিয়ে দেব।

শুকনো খেজুরের মত মুখটা হয়ে গেল কিটির।

—আমার ধোকা দেবার চেষ্টা করছ? আমি এত আহম্মক নই যে তোমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব? শালা—ছুচো কোথাকার। পনেরো বছরের জেলে বাঁচাবার চেষ্টা কর, গাধা।

—আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। বললাম। ব্রীফ কেস তুলে বেরিয়ে এলাম। সোজা এলাম আফসে। চেম্বারে ঢুকে ব্রীফ খুললাম, মধ্য দিয়ে বার করলাম পুরোনো কিছু খবরের কাগজ আর সিগারের দুটো খালি বাক্স। একটা সিগারেট ধরালাম। আজ আর হাত কাঁপছে না। নিজের উপর ওভার কনফিডেন্স দেখেই নিজেই অবাক। আজ শেষ চাল আমার হাতে। দেড়টার সময় আবার হাজির হলাম ট্যাভের্ণ আর্মস-এ। কিটি সে রকমই বসে আছে। ঘামে ওর শরীর সপসপ করছে, ছোট চোখের তারায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। এখন আমার হাত একেবারে খালি। আমাকে শূন্য করেছে।

—টাকা কোথায়?

—আমি মত পাল্টেছি, তোমাকে এক আধলাও দেব না। আমায় গ্রেপ্তার করতে পার।

—আচ্ছা বেটা মেনি বেড়ালের বাচ্চা, ঘণ্টা আমিই বাধব তোর গলায়। এখনই তোকে জেলে পাঠাচ্ছি।

—সত্যিই এবার বুঝেছি, পঁয়ত্রিশ বছর চাকরী করে ডিটেকটিভ সার্জেন্টের পর আর পদোন্নতি হয়নি কেন? তোমার মাথা গোবরে ঠাসা, ঘিলু এক ফোটাও নেই। উল্টে আমিই তোমাকে ধরিয়ে দেব। আমি সাক্ষী দিতে যাবার পরও তুমি আমায় গ্রেপ্তার করোনি, আমার বয়ানের টেপ রিটায়ার হবার পর জমা দাওনি ইনচার্জ সার্জেন্টকে—তারপর এখন এই হ্যালণ্ড নগরে আমার সঙ্গে কি করছ—এসব বলব পুলিশের কাছে। আর ব্রীফ কেসটার কথা মনে যেটা একটু আগে আমার হাতে ছিল, মনে পড়ে আমাদের মধ্যে কি বার্তালাপ হয়েছিল? ব্রীফের মধ্যে ছিল একটা টেপ রেকর্ডার। আর এই টেপ আমি ব্যাংকের সেফটি ভল্টে রেখে দিয়ে এসেছি। ঐ টেপ চালালে আমার সঙ্গে তুমিও জেলে যাবে। পেনসনের টাকা বরবাদ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে পনেরো বছরের জেল।

বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝড়তে শুরু করেছে কিটির দেহ থেকে। ঘরঘর করে উঠল।

—গুল মারছ, তোমার ব্রিককেসে টেপ রেকর্ডার ছিল না। ধোঁকা আমায় দিতে পারবে না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—আচ্ছা। আমায় গ্রেপ্তার করাও, তারপর আমি কি করি দেখো। আমি গ্রেপ্তার হলে দু'একদিনের মধ্যে তুমি পড়বে। ব্যাঙ্ক। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি আমি গ্রেপ্তার হলে লসএঞ্জেলসের সরকারী উকিলের হাতে যেন টেপটা তুলে দেওয়া হয়। বদমাইশ—উল্লুক। আমি চালেঞ্জ জানাচ্ছি বাপের ব্যাটা যদি হোস তাহলে আমার ব্লাফের চ্যালেঞ্জ কর।

আর কোন কথা নয়। বাইরে বেরিয়ে এলাম। রোদ—ছোটাছুটি করছে রাস্তার পিঠে—আকাশ কাঁচের মত সচ্চ—মেঘের নাম—গন্ধ নেই।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

মরণ অভিসার

নিক কার্টার

॥ ১ ॥

—নিক, তুমি কি ঠিকমত জানো যে শিয়াভ মরে গেছে ?

ডেভিড হক মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে মনটাকে ভারী করে দেয়। এটা হল তেমনই এক বিরক্তিকর মুহূর্ত্ত। বসেছিলাম, ওয়াশিংটনে, এডেসের প্রধান অফিসে।

টেবিলের ওপর একটা ফাইল, শিয়াভের নাম লেখ। হক ধোঁয়া ছেড়েই চলেছে, হয়তো আমাকে ফাইলের লেখাগুলো দেখাতে চাইছে না।

ফ্লোডার ফাইল আর সিগার ছাড়া আরো একটা জিনিষ আছে ওর সামনে, সেটা হল কলম আমি বলে চলেছি উত্তরমেরুর ঘটনা আর সে একমনে নোট নিয়ে চলেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বলি—তুমি কি জান যে শিয়াভ মরে গেছে ৫৫ ঘণ্টা আগে।

হক নীরবে লিখেই চলেছে।

—ছোরা দিয়ে শিয়াভের দেহে দুবার আঘাত করা হয়। আমি জানি কোথায় ও মরে পড়ে আছে।

হক বলে ওঠে—আরে তুমি এত তাড়াতাড়ি রাগ করছ কেন ? আগে আমার কথা শেষ করতে দাও। তারপর বরং চটে যেও। তাছাড়া তোমার কর্তব্য ভরা জীবনে সামান্য অবসরটুকু এভাবে নষ্ট করে লাভ কি ?

তারপর হক লম্বা একটা হাসি ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

আমি বলি শিয়াভ মরে গেছে বলে ভেবোনা যে তোমার কাজ ফুরিয়ে গেল। কেননা এখনও ওর দলের লোকেরা বেঁচে আছে। শিয়াভ হল নতুন ধরণের এক সৈন্য বাহিনীর সক্রিয় সদস্য। যাদের কাজ হচ্ছে সমস্ত দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া। একত্রে ওদের দল বেশ পটু।

হক মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ধীরে ধীরে বলে—সে কথা আমার জানা আছে। তারপর বলে, তুমি কি চেরী ফুল ফুটতে দেখেছ ?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

বসন্তে ওয়াশিংটন শহরে চেরীর সমারোহ দেখা যায়।

শানিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। ওর কথা ঘোরাবার ক্ষমতা আমার জানা—ও যে আমাকে একটা কাজে ফাঁসাতে চায় বুঝতে পারছি। ওর সম্পর্কে আমার আরও জানা প্রয়োজন।

বলল—ওয়াশিংটনের মতন এমনি ধরণের মনোহর জায়গা আরও আছে, বোধহয়।

তোমার সুবিধে হবে না

হক হাসল।

ছুটি কেমন লাগে, নিক ?

ভুরু ধনুক হল এবং হকের বিস্ময় বোধ জাগবার আগেই জানতে চাইলাম—ফাঁদটা কি বলত ?

আর একটা সিগার ধরিয়ে হক বলল—ফাঁদ ?

বললাম—শুনেছ ত আমার কথা।

হক আহত নিরাপরাধের অভিনয় করল। কোনদিন কেউ যদি ওকে অস্কারের মতন একটা পুরস্কার দেয় আমি তার খরচ দেব হয়ত !

আমাকে সন্দেহ করছ কেন ? কখনো তোমার কাছে মিথ্যে বলেছি ?

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

বলল—ঠাট্টা নয়, ছোট খাট একটা ভ্রমণ কেমন লাগবে ?

ও চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি পাতল—যেন ছাদখানা বিশ্বের মানচিত্র।

একটা সুন্দর রমণীয় স্থান তোমার থেকে যা উত্তর মেরুর শীতের স্মৃতি দূর করবে।

কোনও মতামত না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা হলে কেমন হয়। নিসের মত জায়গা। একদম সমুদ্রের তীরে। শেষ বসন্তে ভ্রমণকারীদের ভিড় জমাট বাঁধার আগেই যাওয়া ভাল। বলল হক।

আরও অনেক কিছু বলতো। তাই বললাম—দেখ, তুমি ছুটির কথা বলছ, না কোথাও কাজের কথা বলছ ?

স্রেফ্ জবাব হিসাবে হক যা বলল তাও একটা প্রশ্ন—নিসে এখন কে আছে জান ?

বল, শুনি।

আমেরিকার একজন সুন্দরী সিনেমা অভিনেত্রী।

সত্যিই !

হাঙরের মতন ধূর্ত হক ! বলল—হাঁ, তাই-ই ! ও একা রয়েছে ওখানে। গত রাতেও প্যাবে ন্থ মেডিটারেনিতে ছিল একা, আর রুলেতে খেলে অজস্র হেরেছে। অথচ স্বান্ত্বনা দেওয়ার মতন কেউ ওর পাশে নেই।

হক সমবেদনায় মাথা নাড়ল।

বললাম—বেশ ত। আমি থাকব। কিন্তু কে বল ত ?

এবার জবাব দেওয়ার সময় ওর দৃষ্টি কুঞ্চিত হল। বলল—মেয়েটা নিচোল ক্যারা !

বলে উঠলুম—নিচোল ক্যারা ! সে ত বছর চারেক আগে বিমান দুর্ঘটনায় খতম হয়েছে।

বিমানের টিকিটগুলো আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল হক—তাই নাকি ?

॥ ২ ॥

লোকটা খেয়ালী।

ওর কাঁচের ঘরে দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছিলাম। নিজের কাজটুকু ছাড়া আর সব কিছু ও ভুলে যায়। পাতলা পাখি মুখ, শিঙের ফ্রেমে বাঁধানো চশমার আড়ালে দু'টো স্নায়বিক দুর্বল চোখ, লম্বা ঠোঁটের মতন নাক। হাড্ডি সার দেহে স্নায়বিক উত্তেজনা—ভাবখানা এমন যেন সামান্ত ভয় পেলেই উড়ে পালাবে। ছাই-জমা ডেস্ক। লোকটা তামাক-রস কষায়িত আঙুলে একখানার পর একখানা ছবি ওল্টাচ্ছে।

এই ছোট খাঁচার ও একা—নীরব। পিছনে সার সার ফাইল ভরা তাক যেন কবরখানায় সারি সারি স্মৃতি-ফসক সাজানো। হুবারট উইকলো এধরণের এক চীজ—ঘটনার পূজারী, স্মৃতির তত্বাবধায়ক, বিস্মৃত ঘটনা—তথ্যের পুনরুজীবন দাতা—আর এই ইউনি ন্যাশন্যাল নিউজ এজেন্সি ওর কর্মক্ষেত্রেই পরিধি।

নিউইয়র্কের মলিন পরিবেশ ভেদ করে বিবর্ণ আলোক বর্শা এই বিশাল ঘরের অনেক উঁচু জানালার খিলান ছুঁয়েছে—আর এটাই একমাত্র আলোর উৎস। ধুলো ভরা ভারি বাতাস যেন ঝুলে আছে।

এই সমাধি মন্দিরে সব অতীত ঘটনা জারকে নিষিক্ত—এক সাংবাদিক সেনাপতি যিনি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার শাসক, সেই খুনীযার ক্রিয়াকলাপ এক দিন অথবা এক সপ্তাহের জন্য মানুষ-জনকে জ্বালাতন করেছিল, সেই সব নায়িকা যারা ছিল আবেগের মূর্তি, তহবিল তছরূপতারী, খেলোয়াড়, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, নির্বাসিত রাজা-রাজড়া— যারা একবার এক মুহূর্তের জন্যও সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে, তারপর বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু হবার্ট তাদের ভোলেনি।

সেই সব নাম, ঘটনা, তারিখ আর খুঁটিনাটি তথ্য সব তার মনে কৃপণের ধন-ভাণ্ডারের মতন থরে থরে সাজানো রয়েছে। কোনও একটা ঘটনা যদি সঙ্গে সঙ্গে মনে নাও পড়ে তবে ওর ড্রয়ার হাতড়ালে মুহূর্তে সব পাওয়া যায়।

এধরণের লোক মনের মলধন খাটিয়ে অজস্র রোজগার করতে পারে—কিন্তু হবার্ট উইকলো তেমন মানুষ নয়। অচেনা মানুষ জনের পরিবেশে কেউ বহু সম্পদের বিনিময়ে কোনও খবর চায় ওর বাঁকা-চোরা মুখে একটা অসহায় তার শুধু ফুটে উঠবে। ও শুধু কাঁধ নাচিয়ে হাতের চেটো ওল্টাবে। দুর্বল ভাবে মাথা নাড়বে—আর ওর কপালে জমবে বিন্দু বিন্দু ঘাম—ওর নাক বেয়ে ঘাম ঝরে পড়বে।

হবার্ট উইকলো এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেধাবী মানুষ।

ওর সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়—খেয়ালী।

দ্বিতীয় পরিচয়—বন্ধু।

গলা ঝাড়লাম।

ও চমকে মুখ তুলল। এক হাতের ঠেলায় টেবিলের সব ছবিগুলো মেঝের উপর ফেলে দিল। মুখ লাল হয়ে উঠল। হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়তে চাইল—কিছু ডেস্কে পড়ে ওটা গড়িয়ে গেল।

বলে উঠল— উচ্ছন্নে যাক।

বললাম— রস ভায়া। কেবল আমি ত।

কোনও রকমে সিগারেটটা উদ্ধার করে টেবিলের নীচে থেকে ছবিগুলো তুলল।

ছবিগুলো টেবিলে গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কেমন আছ নিক ?

ঠিক আগের মতন। আর তুমি ?

নিজের কাজ করে যাচ্ছি।

এক গোছা ছবি ও র‍্যাকে সাজাতে সাজাতে বলল—বস।

তারপর নিজে চেয়ারে বসল, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ছাই উড়ে পড়ল!

এখনও সেই এ্যামালগেমেটেড প্রেসে কাজ করছ ত ?

এটাই এ্যাক্স-এর ছদ্মনাম—আমার গোপন কাজকর্ম ও ধারণার অতীত।

ঠিক বলেছ।

এবার মৃদু হেসে বলল—আজ আমার সাংবাদিক বন্ধুর জন্যে কি করতে পারি।

আমার কিছু খবর চাই।

টেবিলের ওধারে নড়ে চড়ে বসে বলল হুবার্ট—নাম বল।

বললাম—নিচোল ক্যারা।

ফ্রাঙ্ক ফুর্ট বিমান-বন্দরে ক্যারাভাল বিমান দুর্ঘটনায় উনসত্তর সালের তেসরা মার্চ সে মারা যায়, আরও তিরিশজন যাত্রীও এতে মারা গিয়েছিল···বিমান কোম্পানীর মালিক···।

হাত তুলে বললাম—হোয়া।

মনে করো না, আমি সব ভুলে গেছি।

বললাম—ও সব ভাবিনি। ঠিক বলছ, ও মারা গেছে ?

কোনও সন্দেহ নেই।

খবরটা যে মিথ্যে তা' কখনও শুনেছ ? সনাক্ত করণ নিয়ে সন্দেহ হয়নি ? যেমন সব শোনা যায় তেমন কোনও গুজবও ছড়ায়নি—ধর যেমন সত্যি সত্যি মরে নি, ভীষণভাবে বিকৃত দেহ, গোপন স্বাস্থ্যনিবাসে লুকানো এমনি সব ?

না। সত্যি সত্যি ও মারা গেছে। কেউ ওর মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ করেনি। এমন কোনও পত্রিকাও কোনও বিরুদ্ধ খবর ছাপেনি।

এবার চরম কথাটা বলি শোন! ধর, ঠিক নিচোল ক্যারার মতন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হল। দু'জনের মধ্যে হুবহু মিল। আমি কি করে বুঝব যে, ও ঠিক না বেঠিক ?

হুবার্ট সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। মাথার পিছনে দু'হাত রেখে

সোজা হয়ে চেয়ারে বসল। তারপর চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল—দেখ দৈহিক উচ্চতা, ওজন বা চোখের তারার রঙ এসব হুবহু মিলে যেতে পারে। মেয়েটি জন্ম থেকে স্বর্ণকেশিনী। ওসবের রেকর্ড আছে। তুমি জানতে চাইছ একটা স্পেশ্যাল কোনও চিহ্ন, যা না-কি ফিল্মে দেখা যায়নি।

ঠিক তেমনি কিছু?

ওর বাম উরুর উর্ধাংশে ভিতরের দিয়ে, প্রায় জঙ্ঘার মিলনস্থলে একটা বড় তিল আছে।

ঠিক বলছ ত?

গুজব নয়। মনে করতে পারছি না, তবে একখানা পত্রিকায় পড়েছিলাম, নিক, এরকম সঠিক খবর এর চেয়ে আর আমার জানা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে করমর্দন করে বললাম—জানি না, কি ভাবে তুমি এসব মনে রাখ। তবে তুমি আমার কাছে একটা বিস্ময়।

হুবার্ট তৃপ্তির হাসি হাসল। বলল—আরও নিশ্চয় কিছু তুমি জানতে চাও, নিক।

আমি ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালাম।

দেখ, বিগত ছ'সপ্তাহের মধ্যে তুমি দ্বিতীয় জন যে নিচোল ক্যারা সম্পর্কে জানতে এলে।

খুলে বল ত!

তুমি ত জান, আমাদের সংস্থা কেবলমাত্র প্রেসের সঙ্গে কাজ করে না। এটা ব্যবসায়িক সংগঠন। যে কেউ এখানে সংবাদ কিনতে পারে। তবে ওরা বেশীরভাগ ছবি আর বই কেনে। ছ'সপ্তা' আগে এক ছোকরা আমাদের অফিস থেকে নিচোল ক্যারার সব ছবিগুলো কিনে নিতে চাইল।

বললাম—এর আগেও নিশ্চয় তোমরা এধরণের অনুরোধ পেয়েছ?

মাঝে মাঝে। তবে তারা এসে ছবি দেখে প্রথম, তারপর অর্ডার দেয়। তবে এ ছোকরা না দেখেই সব কিনতে চাইল। তাই অস্বাভাবিক মনে হল।

তারপর কি হল?

পত্রিকায় ছাপার জন্যে কেউ কেউ নিচোল ক্যারার একখানা বা দু'খানা ছবি কিনতে আসে। কিন্তু এ একেবারে আমাদের কাছ থেকে ক্যারার সব ছবি কিনতে চাইল।

তারপর?

হুবার্ট এবার বলল—তোমার একজন বন্ধু আছে না উইলহেলমিন বলে ?

উইলহেলমিন আমার হাতিয়ার বন্ধু। ও ত কখনও আমার কাছ ছাড়া হয় না। যেমন আমার ছোরা হুগো আর ছোট্ট একটা গ্যাস-বম্ব পিয়ের সঙ্গেই থাকে।

এই ছোকরারও তেমনি একজন সঙ্গী আছে, তাকে বাম বগলের নীচে রাখে বুঝেছ !

কেমন দেখতে বল ত ?

ছোকরা ছিপি আঁটা আগুনের মতন। বুনো চেহারা। নিয়াণডারথাল মানুষের মতন মুখ চিরন্তন ছায়া ঢাকা। সান গ্লাসের আড়ালে দৃষ্টি আবরিত। ইঞ্চি খানেক লম্বা একটা কাটা দাগ আছে ওর বাম গালে।

ছবি নিয়ে ও কি করবে জানতে চেয়েছিলো না-কি ?

একখানা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে বলল হুবার্ট—দেখছি, তুমি প্রেমে পড়েছ।

কাগজখানায় ক্রেতার সাইন রয়েছে—জন স্মিথ।

দেখ, এখানে সবাই সংবাদ কিনতে পারে। সকলের খবর আমি জানব কি করে ?

বললাম—কিছু মনে কর না। হয় ত ছোকরা একেবারে নিরাপরাধ। কিংবা এটা সামান্য একটা ঘটনা চক্র।

আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

হুবার্ট বলল—ঠিক তাই। একটা ঘটনা-চক্র।

ওর কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম।

শুনলাম হুবার্ট বলছে—সাবধান নিক। খুব সাবধান।

॥ ৩ ॥

সাবধান। খুব সাবধান।

আটলান্টিক মহাসাগরের ত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড্ডীয়মান জেট বিমানের গর্জন ওর কথাগুলো চাপা দিতে পারছিল না। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। ছুটি পেয়েছি বটে তবে এটা সত্যি-কারের ছুটি

নয়। উচ্ছন্নে যাক হক। একটা সুন্দরী তরুণী হয় সে মারা গেছে, কিংবা যায়নি।

খাবারের ডিসের দিকে নজর দিলাম। বাদামী ঝোলের সমুদ্রে সুসিদ্ধ এক টুকরো মাংস যেন একটা দ্বীপ। আর একটা পিঁয়াজ দানবের চোখের মতন তাকিয়ে আছে।

আমার সামনে একটি ছায়া এগিয়ে এল।

ক্ষিধে নেই বুঝি? ষ্টুয়ার্ডেস জানতে চাইল।

মাথা নাড়লাম।

দীর্ঘ দেহী তন্বী—দু'টি লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল ট্রে তুলে নেওয়ার জন্যে।

স্কচের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললাম—এটা থাক। আমাকে ঘুমুতে সাহায্য করবে।

ওর পরিচ্ছন্ন চোখ দু'টো আমার মুখের উপর রেখে দুষ্টুমি হাসল।

বলল—ঘুমুবার একটা উপায় অবশ্যই।

হ্যাঁ, শুনেছি আরও বহু উপায় আছে।

তরুণী বলল—আছেই ত। আর সেগুলো তোমার লিভারের পক্ষে ভাল।

সোনালি টিপ একটা সিগারেট ধরলাম—মনে হয় ফুসফুসের পক্ষেও ভাল।

হ্যাঁ। ফুসফুসকেও ভাল রাখে। প্যারিসে থাকবে না কি?

বললাম—না। ওরলি বিমান বন্দরে নেমে আবার মিনিট চল্লিশ পরে বিমান ধরব।

ভারি লজ্জার কথা। আমি তোমাকে শহর দেখাতে পারতাম।

বললাম—তা ঠিক। হয় ত এর পরে সে সুযোগ পাব।

বোধহয়।

ও ট্রে তুলে নিয়ে চলে গেল।

ওর পায়ের দিকে নজর দিয়ে বললাম—পারলে আমাকে আর এক গ্লাস স্কচ দাও।

উচ্ছন্নে যাক হক, আবার ভাবনায় ডুব দিলাম। স্কচও আমাকে ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে পারছে না।—

অপরাহ্ন বেলায় নিসের বিমান বন্দরে পৌঁছলাম প্যারী ছুঁয়ে—এবং এখনও আমার মন বিষণ্ণতার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। হোটেল বো রিভেজে উঠলাম। একদিকে অপরাহ্নের রোদ ঝিকমিক ভূমধ্যসাগরের বুক—আর অন্ত-

দিকে একটার পর একটা হোটেল। একটু জায়গা পাওয়ার জন্য তারা যেন খেলার মাঠে দুষ্টু ছেলেদের মতন লড়াই করছে।

আমার ঘরের জানালা থেকে সমুদ্র নজরে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। জিনিষপত্র খুললাম। আমার অস্ত্র বন্ধুদের একটা তোয়ালেতে মুড়ে সমুদ্রের তীরে বালির মধ্যে রেখে এলাম।

ঘণ্টাখানেক সাগরবেলায় চোখ বুজে শুয়ে জলকল্লোল শুনে ফিরলাম ঘরে।

মনে হল আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল।

টেবিলের উপর এক টুকরি ফল রয়েছে। আনারসের বোঁটায় আটকানো এক টুকরো কাগজ। কোনএ ফরাসী দোকানদার রেখে গেছে!

তোমার ছুটির দিনগুলো মনোরম হয়ে উঠুক—হক।

সন অফ এ বিচ্। উত্তর মেরু থেকে ফেরবার পর থেকেই ও ছুঁচ ফোটাচ্ছে একটা কোনও কাজে আমাকে ঠেলে দিতে চাইছে, মাথায় ডাক্কাশ মারছে। প্রথম ও সন্দেহ করল, শিয়াঙ হয় ত আমার কবল থেকে পালিয়েছে। তারপর অস্পষ্টভাবে নিমন্ত্রণ করল একটা ধোঁয়াটে ছুটি ভোগ করতে। অতীতে কোনও কাজে পাঠালে হক আমাকে কাজটার বিস্তারিত খবর বলতো। বুঝতে পারতাম নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কোনটা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নিসেতে আমি কেন এলাম তা আমার কাছে একদম অজানা। আর হকেরই বা প্রয়োজন কি জানবার যে নিচোল ক্যারা বেঁচে আছে কি নেই?

ঘুষি পাকালাম। বুকের ভিতর রাগে রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে হাতুড়ি পিটতে লাগল। ঠিক আছে। ওই ধূর্ত শিয়ালটা তাহলে ওয়াশিঙটনে ড্যাপস্ত সারকেলে বসে সব কিছুর উপর নজর রাখছে। যদি তুমি কিছু নাও জান তবে কিছু একটা আবিস্কার করো। ঘটনা ঘটাও। কিছু জান না এমন বিশ্রী একটা অবস্থা সহ্য করা যায় না।

অভিযান। আর তাই আমার প্রয়োজন। ভাল লাগল। প্রতীক্ষার কাল শেষ হয়ে এল। রাত-অভিযানের জন্য স্নান করে পোষাক পরে নিলাম। ভিতর পকেটে আমার হালের পাশপোর্টখানা রাখলাম। ওখানা নিকোলাস এ্যাণ্ডারসনের নামে। যেখানে এখন যাচ্ছি সেখানে পিস্তল, বোমা আর ছোরা লজ্জার কারণ হবে অবশ্য নিরাপত্তার জন্য এগুলো একান্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

কাজেই আমার অস্ত্র বন্ধুরা যেখানে ছিল সেইখানেই রইল।

নিকোলাস একজন ভ্রমণকারী—তার এসব বন্ধুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য

এ্যাকসের খুনী সর্দার নিকোলাস কার্টারের এসব প্রতিক্ষণের সঙ্গী, এদের না নিয়ে পথে বেরোলে সে বোকা বলবে। দু'খানা একমুখো ক্ষুর জামার কলারের নীচে রাখলাম। আর একখানাকে সেঁধিয়ে দিলাম আমার পিঠের দিকে কোমরবন্ধের তলায়। ওরা এখন অদৃশ্য—কিন্তু স্বস্তিদায়ক আর মারাত্মক।

রাতের অভিযান সুরু করার আগে কিছু খাওয়া প্রয়োজন। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ-হাতি পথ ধরলাম। মোড় ঘুরতেই বন্দর এলাকা। সমুদ্র তীর বরাবর সুদীর্ঘ রাজপথ। লা ক্যাসিনে মোমবাতির আলোয় ভোজন সারলাম।

সময় কাটাতে লাগলাম। অভিযানের জন্য এখন আমি তৈরী, দৈহিক জড়তার অবসান হয়েছে। খাবার খেতে খেতে চারপাশে নজর বুলোলাম। বন্দরের ওধারে ইয়ট আর ট্রলারগুলো রাতের মতন নোঙর করছে। নীল আকাশ এখন প্রগাঢ় কাল। রাস্তার ওপারের রেঁস্তোরায় তারার মতন আলোর মালা। মদের গ্লাসে অন্তিম চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালাম মোমবাতির শিখায়।

যদি-ছুটি পেয়ে থাকি তবে তা' শেষ হয়েছে।

এখন শুধু কাজ।

নিরাবরণ স্তন'দুটো তরুণী-হাতে আড়াল করে সে তৃণের সমুদ্র থেকে উঠছে। চারিধারে অজস্র গাঢ় লাল রঙের ফুলের সমারোহ। যারা না কি বিবর্ণ ইন্দ্রিয় সুখ সর্বস্ব কাল আনন্দের এবং মর্মভেদী উত্তেজনার আশা করে তারা ওর পেছনে উত্তুঙ্গ হালকা হলুদ রঙ আমাদের অভ্যন্তরে প্রলোভনের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে। মূর্তির হয়ত একটা নাম ছিল কিন্তু কেউ তা লেখে নি। কিন্তু জুয়ার আড্ডার প্রবেশ পথের মূর্তির নাম রাখার প্রয়োজন নেই—ভাগ্য দেবী নামই যথেষ্ট।

নিসে শহরে প্যালে দ্য মেডিটারেনি একটা জঘন্য বা একটা খুব ভাল জুয়ার আড্ডা নয়—তবে প্রফেসন্যাল। আর জুয়ার আড্ডা পরিচালনার ব্যাপারে এরা খুব নাম করা। তা'ছাড়া ভ্রমণকারীদের এরা সেবা করে যারা না কি দশ কি কুড়ি ডলার পকেটে নিয়ে এখানে জুয়া খেলতে প্রবেশ করে। আর জুয়াড়ীদের একবার নেশা চাপলে তারা আরও আরও বেশী বাজী ধরে।

বাঁকানো দো-ভাঁজ সিঁড়ি নিলান গলে তিনতলায় উঠে গেছে। আমি সেক্রেটারিয়েটের দিকে পা বাড়ালাম। একদিকে টুপি রাখবার ঘর—দু'জন গোমড়া মুখো লোক ডিনার স্যুট পরে বসে আছে। সৎকারের সান্ধ্য পোষাক-

পরা কজন নারীও রয়েছে ওদের সঙ্গে। মানব-জাতি সম্পর্কে ওদের যে সন্দেহ তারই ছাপ ওদের দৃষ্টিতে। জনা কয়েক ভ্রমণকারী, যাদের না-কি নিসে সরকার কোনও প্রলোভনে এখানে আকৃষ্ট করেছে, তারা কাউন্টারে ভিড় করেছে।

আমার পাশপোর্ট খানা আর পাঁচ ফ্রাঙ্ক টেবিলে রাখলাম। রাত্রে এখানে ঢুকতে পাঁচ ফ্রাঙ্ক লাগে। পনেরো ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে এক সপ্তাহ, ত্রিশ ফ্রাঙ্কে একমাস আর ষাটে পুরো মরশুম এখানে প্রবেশ করা যায়।

মনে মনে জুয়া খেলছিলাম। ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলছিলাম একটিমাত্র রাতেই আমি যে কাজে এসেছি সে কাজে বিজয়ী হব। আর হকই এ-কাজে আমাকেও পাঠিয়েছে।

ওদের একজন আমার পাশপোর্টখানা মিলিয়ে হলুদ-রঙা একখানা অনুমতি পত্র দিন।

লে স্যালনস দ্য লা সির—জুয়ার আড্ডাঘর! একজন পাহারা দিচ্ছে দরজায়।

ঢুকলাম ভিতরে।

তিনধাক শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে একখানা বিশাল ঘরে। যেন ঘরখানা একটা ফুটবল খেলার মাঠ। বড় বড় জানালার গাঢ় লাল রঙের পর্দার ওপাশে বিশাল সমুদ্রের বিস্তৃতি! অলিন্দে জ্যোৎস্নার সমারোহে। জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ঘরের মাঝে ছোট ছোট টেবিল পাতা। কাম্‌ত, ডাইস, বারারাত, ব্ল্যাকজ্যাক, একারতি, ট্রেনটি এত কোয়ারন্তি—নানাধরনের জুয়াখেলার ব্যবস্থা। মাথার উপর হালকা লাল-কমলা রঙের শেড দেওয়া আলোক ঝরণা। রূপালি চাকা ঘুরছে কোথাও, তাস-শাফলের খসখস আওয়াজ—কিংবা ডাইস-টেবিলে তীর ছোঁড়ার শব্দ। সব জায়গায় বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার অবিরাম লালসা—আর তার বিনিময়ে পুরস্কার।

খুব দ্রুত ঘরের ভিতরটায় চক্কর দিলাম। গোটা দুয়েক বার রয়েছে—দাঁড়িয়ে এক গ্লাস মদ গলায় ঢাললাম। মরশুমের সুরুতে জুয়াড়ির ভিড় খুব কম—কয়েকটা টেবিলে খেলা বন্ধ। মাঝে জুয়াড়িদের ফিসফিসানি ছাড়াও একটা জোরালো কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুযোগ চলে যায়, লুঠে নাও বুলেত্‌ টেবিলের ঘূর্ণায়মান চাকায় বারবার প্রতিহত হাতির দাঁতের বলটা শব্দ করছে।

জপতার ব্যাপারে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আমেরিকানরা ছুটেছে ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের চারধারে। বাকারাত খেলছে বুড়ো ইংরাজরা। বুলেত্‌

টেবিলে ভিড় সব দেশের মানুষের। জনা কয়েক নীল সুটে শাদা জামা আর গাঢ় রঙের টাই পরা জাপানী ছিল, জন দু'য়েক আরব, বেশ কয়েকজন গ্রীক আরও বিভিন্ন দেশের লোক ছিল ঘরের মধ্যে।

ক'জন বৃদ্ধা চেয়ারে বসে মাথা নীচু করে পেন্সিল নিয়ে বাজে কাগজে হিসেব রাখছিল। প্রবেশ-পথের কাছেই একখানা টেবিলে দাঁড়ালাম। এবং এমন জায়গায় দাঁড়ালাম যেন ঘরে কে আসছে এবং যাচ্ছে তা নজরে পড়ে। অথচ আমি ছিলাম চোখের আড়ালে।

জুয়া-বোর্ডের ছোকরাকে আড়াই শ'ফ্রাঙ্ক মুদ্রা দাও, নিমেষের মধ্যে নোটগুলো টেবিলের দেরাজে অদৃশ্য হল। ওর ট্রেজারিতে ফুলে উঠেছে অজস্র নোটে। লোকটা আমাকে পঞ্চাশখানা হলুদরঙ ছোট ছোট চাকতি দিল। আমি ওগুলো ভরে নিলাম।

কিছুক্ষণের জন্য আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে লাগল বাজি ফেলার জন্য আহ্বান, চাকার আওয়াজ আর জুয়া-বোর্ডের ছোকরার থেমে থেমে চীৎকার চলে এস বন্ধু। ভাগ্য পরখ কর। সুযোগ চলে যায়, লুঠে নাও। বন্ধু, এমন মওকা আর পাবে না। প্রত্যেকবার দরজা খোলার সময় আশা করছিলাম, এবার এল। কিন্তু বৃথা আশা।

এবার আমিও বাজি ধরতে সুরু করলাম।

মাঝে মাঝে টেবিল আমার মুদ্রাগুলো আত্মসাৎ করছিল—আবার কখনও বা কিছু কিছু দিচ্ছিলও। আমার মন এখন বুলেতের চাকার সঙ্গে যে আধাআধি মিশে গেছে। আরও বড় বাজি ধরার জন্যে আমি তৈরী হচ্ছিলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পার হল। এবার একক বাজি ধরতে লাগলাম। প্রথমেই আমার নামের সব ক'টা ধরলাম—দশটা অক্ষর। ব্যস। দশ সংখ্যার উপর বাজি ধরলাম। হেরে গেলাম। এবার ষোলটা অক্ষর। বাজি ধরলাম ষোল সংখ্যার উপর। আবার গেলাম হেরে। ন'টা অক্ষর। ধরলাম বাজি ন' সংখ্যার উপর। জিততে পারলাম না। এবার দশ দু'টোর অক্ষর গুণলাম—দশ। ধরলাম বাজি।

সবুজ জুয়ার ছকের উপর শুধু আমার ফ্রাঙ্কগুলো পড়ে আছে—সাঁইত্রিশ থেকে একের মধ্যে আর কিছু নেই। জুয়া-বোর্ডের ছোকরা ঘড়ি দেখল। মস্তবড় চাকাখানা ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে চক্কর দিচ্ছে। যেন রাত-আকাশের একটা উল্কা, ঘুরছে ত ঘুরছেই—এমনিভাবে হাতির দাঁতের বলটাও ঠোক্কর খেতে খেতে

ঘুরছে এবং ওটা ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার মতন। আর ছোকরা যন্ত্রের মতন আওড়াচ্ছে—এস এস। সুযোগ চলে যায় লুঠে নাও। এক সময় চক্কর খাওয়া চাকার গতির বেগ কমে এল—থামল। এবং বলটাও লাফাতে লাফাতে পড়ল গিয়ে দশ সংখ্যার গর্তে। ছোকরা আমার দিকে তাকাল। একখানা গোলাপী রঙের একশ ফ্রাঙ্কের এবং একগোছের হলুদ রঙ চাকতি আমার সামনে বাড়িয়ে দিল।

এগিয়ে গেলাম। কয়েকখানা হলুদ রঙ চাকতি ঠেলে দিলাম ছোকরার দিকে ওগুলো আমার পরের বাজি। তারপর বাকিগুলো কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নীচু হলাম। মুখ তুলতেই নজরে পড়ল এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক আমার উল্টোদিকে টেবিলের ধারে। তখনও জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করছে।

যুবতীর ঝকঝকে নিভাঁজ মুখমণ্ডল—মধু সোনালি চুলের ঢাল পিছন দিকে টান করে একটা সবুজ বিবর্ণ ফিতে দিয়ে বাঁধা। গালের হাড় উঁচু এবং কালের কলঙ্ক পড়েনি ওর সৌন্দর্যে।

পরণে পাতলা শাদা পোষাক—কাঁধে টান করে আটকানো। ফলে ওর স্তন দুটো উত্তুঙ্গ হয়ে ওর দেহ সৌন্দর্যকে বাড়িয়েছে। ওর নিরুত্তাপ, সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণের আড়াল থেকে ওর স্তন-বৃন্ত দুটো আমার নজরে পড়ছিল শুধু।

একটা ছোট পার্স থেকে একখানা এক'শ ফ্রাঙ্কের নোট বার করে জুয়া বোর্ডের ছোকরাকে বলল—সব পাঁচ ফ্রাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে দাও ত।

ছোকরা কাঠের দেরাজে নোটখানা রেখে কখনো তৃপ্ত নয় সিন্দুকটার ঢাকনা টেনে দিল।

এক বগলে পার্সটা চেপে দু'হাতের চেটোতে হলুদ রঙ চাকতিটা—নিল—যেন একটা বাচ্চা অনেকগুলো খাবার ধরেছে হাতে। ওর চালচলনে এমন একটা নির্দোষ ভাব নজরে পড়ল হাসলাম। ঠিক সেই ক্ষণে ও টেবিলের ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকাল—ওর চোখে তারা দুটো যেন দু'খণ্ড উজ্জ্বল পান্না। তারপর গ্রীষ্মাকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এক ঝলক লজ্জার শিখা ওর বিস্ময়কর মুখমণ্ডলকে রাঙিয়ে দিল। ও দৃষ্টি নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল।

ওর মুখ-মণ্ডলে গম্ভীর বিষন্নতা ছায়া ফেলল। উপবিষ্ট খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে ও সাত সংখ্যাটার ওর হাতের কয়েকটা চাকতি ছুড়ল—। হেরে গেল। এবার বাজি ধরল উনিশ—আবার হারল। যুবতী বাজি তেত্রিশ ধরল সংখ্যার উপর—আবার হারল।

পর পর দশবার এক একটা গরমিল বিচ্ছিন্ন সংখ্যার উপর যুবতী বাজি ধরল এবং পর পর দশবারই হেরে গেল। আরও জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করছিল। উত্তেজনার আবেগে ওর স্তন দুটো কেবলমাত্র বস্ত্রাবরণের আড়ালে উঠা নামা করছিল। গোলাপী নখ হাতে ফুরিয়ে আসা সম্পদ আঁকড়ে ধরেছিল হাত দু'খানা। আর দু'বার জুয়া খেলতেই ওর সম্পদ এক হাতের মুঠোতেই ধরে গেল।

আমার কিন্তু একবারও মনে হল না যে ও জুয়া খেলছে খেলার নেশায়। ওর গলার নীচের দিকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল এবং একবার যখন রুলেতের চাকা চক্কর মারছে ও ঠোঁট কামড়াল। দেখলাম, বাম হাতে রাখা চাকতি-গুলো থেকে ডান হাতের আঙুল দিয়ে আর একটা চাকতি বেছে নিচ্ছে।

একবার দেখল চাকতি খানা। সে আওড়াল—এবার দয়া কর।

তারপর নয় সংখ্যার উপর বাজি ধরল। খেল সুরু হল। রুলেতের চাকা চক্কর দিতে লাগল—আর বলটাও আপন কক্ষপথে লাফিয়ে ঘুরছিল। চাকা-খানা এবার থামছে। কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল—সুযোগ চলে যায়, লুঠে নাও। এবার নীরবতা—জুয়াড়ীরা-প্রতীক্ষা-রত।

যদি কালাও হতাম তবু ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারতাম বাজি 'ধরার ফলা-ফল। দু' চোখের নীচের পাতায় দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরছে—এখুনি ঝরে পড়ে ওর চিবুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামবে। ওর দেহ এখন পাথর—সজোরে ঢোক গিলল। এবং এক সময় অশ্রু শুকিয়ে গেল।

নিজের হাতের দিকে বারেকের জন্য নজর দিল। এখনও ছ'খানা চাকতি রয়েছে। ওর শীর্ণ হাতের লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে চব্বিশ সংখ্যার উপর রাখল। চাকা যখন চক্কর দিচ্ছে ওর তখন দু'চোখ বুজিয়ে আছে। ফলা-ফল কিন্তু একটুও ওর পক্ষে ভাল হল না।

মিনিট দশেকের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে ও কাছে কেবল দু'টি চাকতি রইল। ওর দেহ মনে উত্তেজনা আর প্রবল নয়—শুধু মনে হচ্ছিল ও দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আর এতটুকু ইতঃস্তত করল না। সে একটা চাকতি তেরোর ঘরে রাখল। টেবিল ঘুরে ওর কাছে গিয়ে বললাম—ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন।

আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু ও ঠোঁট আর গাল তির তির করে কাঁপছিল—নিজেকে সংযত করতে পারছিল না। দু'চোখের

কোলে কোলে জল টল টল করছে। আমার দৃষ্টি এড়াবার জন্যে ও মুখ নীচু করল।

আমার দৃষ্টি ওর মাথা ডিঙ্গিয়ে আরও দূরে নিবদ্ধ ছিল। ওই পটভূমিতে দরজা খুলে গেল।

একজন লোক ঢুকল ঘরে।

ও ছিপি আঁটা আগুনের মতন।

॥ ৪ ॥

সিঁড়ির মাথায় এক লহমার জন্য দাঁড়াল লোকটা এবং তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে যুবতীকে খুঁজে বার করল। তারপর ছুঁচলো কালো জুতোর নীচে সিঁড়ি মাড়িয়ে কার্পেটের উপর নেমে এল।

ইতিমধ্যেই আমি টেবিল ঘুরে ওর পাশে এসে গেছি।

সামান্য ডানদিক ঘেঁষে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ও নিষ্ঠুর আনন্দে হাসল এবং সেই হাসিতে ওর মুখের কাটা দাগ বরাবর একটা ভাঁজ পড়ল। ও নিঃশব্দে এগিয়ে যুবতীর ডান কনুইয়ের একটু উপর বা মাংসল বাহুতে থাবা বসিয়ে কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করে বলল।

সে ভীত হল, মুখমণ্ডলে ভয়ের ছাপ পড়ল। দৃঢ়ভাবে এবং সাবধানে—কেন না একটু গোলমাল বাধাতে ওর ভয় হাচ্ছল—ওর থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। ওর থাবার চাপে যুবতীর নিভাঁজ মুখের চামড়া সাদা হয়ে গেল।

উল্টোদিক থেকে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম—যেন আমি কিছুই জানি না এবং বেশ খুশি খুশি ভাব আমার।

সজোরে বললাম—বা, এই ত তুমি। ভাবছিলুম হয় ত তোমায় হারিয়েছি। যদি রুলেত খেলে আশ মিটে থাকে তবে একটু মদ পান করলে কেমন হয়?

নীরবতার মাঝে জুয়াড়ী ছোকরার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

যুবতী আবার জুয়ায় হারল।

সস্তা সেন্টের গন্ধ লোকটার দেহে—ঠিক যেন পাঁকের গন্ধ। কাল সিল্কের পোষাক জুয়ার আড্ডার অজস্র আলোর মেলায় ঝক্‌ঝক্ করছে। লোকটা

হাত নামাল এবং কটমট করে আমার দিকে তাকাল। গন্ধ যাইহোক, সে যেমনই হোক লোকটার চাল চলন আর চোখ মুখের ভাব দেখে বোঝা যায় ও চিরকাল এমন জায়গায় খাওয়া দাওয়া করতে অভ্যস্ত যেখানে টুলে বসে খেতে হয় এবং খাবারে মাছি বসে থাকে।

লোকটা ফিস ফিস করে আওড়াল—তুমি কে হে বাপু?

ভাল চিহ্ন! ও কোনও গোলমাল করতে চায় না এখানে।

জবাব দিলাম—মিষ্টার স্মিথ, তাই না?

বলল—হুঁ।

ওর দিকে তাকাবার ইচ্ছা হল না। যুবতীকে বললাম—কি, ড্রিঙ্কের কি কি হবে? মনে হচ্ছে, এ সময় তোমার এক গ্লাস পান করা দরকার।

বলল—হাঁ, হাঁ। ধন্যবাদ। পান করতে নিশ্চয় পারি।

বেশ, চল। আমরা কি এবার যাব?

লোকটা বলল—মহিলার এখন এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।

বললাম—বেশ কথা বললে। কই মহিলা ত আমাকে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে বলে নি।

এবার লোকটা বলে উঠল—দেখ ছোকরা, আমার উপদেশ শুনে কেটে পড়। যেখানে তোমার প্রয়োজন নেই সেখানে নাক গলিও না।

বললাম—হ্যাঁ, কিন্তু যুবতী কি বলল শুনলে না। আমার সঙ্গে ও এখন ড্রিঙ্ক করতে যাবে।

লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল—আমাকে বার বার বলতে বাধ্য করো না।

জ্যাকেটের মধ্যে ও হাত ঢোকাল। ওর ট্রাউজারের কোমর বন্ধে কি আছে তা আমি যাতে দেখতে পাই সেজন্যেই ও আমাকে খানিকটা সময় ইচ্ছে করে দিল। ওর বুদ্ধির চেয়ে ক্ষমতা বেশি। আর জুয়ার আড্ডার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমি যা ভেবেছিলাম ততটা ভাল নয়।

এক লহমার জন্যে নজরে পড়েছিল। ওর কাছে রয়েছে একটা মেকসিক্যান ট্রেজো ২২ এক নম্বর মডেলের একটা পিস্তল আর সেটার উপর ওর সব ভরসা। মেকিসকোর অস্ত্র-কারখানা অবশ্য নাম করা নয়—তবে জাকাতলানের আর্মস ট্রেজো কারখানার তৈরী এই ছোটখাট আস্ত্রটা খুব চালু।

এক নম্বর মডেলের এই নম্বর মডেলের পিস্তলটা সাংঘাতিক এবং অস্বাভাবিক

ধরণের। সিলেকটার ঠিক রিসিফারের একটু উপরে বাঁ দিকে বসানো। সিলেকটারের স্যুইচ ঠিক করে ট্রিগারে চাপ দিলেই পিস্তল থেকে পর পর আটটা গুলি আপনা থেকেই ছুটে যাবে।

যুবতী শ্বাস নিয়ে বলল—পাগলামি করো না, গিডো।

বললাম—তুমি নিশ্চয় ওটা ব্যবহার করবে না।

একবার লেগে দেখ আমার সঙ্গে।

বললাম—জানি, তুমি ও কথাই বলবে।

যুবতীর বাহু ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

পিছন থেকে গিডো খিস্তি করল।

ওই প্রাগ ঐতিহাসিক মুখের ভুরুর নীচে অথবা ওর মনের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্যে লড়াই চলছিল কিংবা কেউ ওকে একটা কিছু করতে বলেছে। ওকে যা নির্দেশ দিয়েছে তাই ওকে করতে হবে। কেননা ওকে দেখে মনে হয় না যে, ও স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করার বুদ্ধি ওর আছে।

ইতিমধ্যে ওর আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে বাড়ছিল—পিস্তলের গুলি ছোঁড়বার সম্ভাবনাও উপে যাচ্ছিল। গিডো কাজ করতে অভ্যস্ত—কিন্তু চিন্তা করতে নয়। এবং একবার যদি ও কাজের যুক্তি খুঁজতে বসে তবে কাজের মধ্যে আমরা প্যারী শহর ঘুরে আসতে পারব।

ওই আগুনে লোকটার পিস্তলের সীমানা থেকে যুবতীকে বার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে হাঁটতে লাগলাম। গিডোর মস্তিষ্কের চেয়ে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশি সচল। প্রতিটি মুহূর্ত পার হচ্ছে আর আমার ধারণা সঠিক হচ্ছে—কোনও বিশ্রী ঘটনা ও ঘটাতে চায় না।

তিনটি সিঁড়ি পেরিয়ে দরজার কাছে পৌছতে আর কয়েকটা সেকেণ্ড প্রয়োজন—কিন্তু পিছনে একটা পিস্তলবাজ লোক কি করবে ভাবছে জানলে সময় আপনা থেকেই দীর্ঘ হয়।

এবার দরজা পেরিয়ে আমরা ভিতরের ঘরের ভিতর দিয়ে সিঁড়ির ডান দিক দিয়ে জোড়া খিলানের নীচ দিয়ে সোজা মেডিটারেনী হোটেলের প্রবেশ পথে হাজির হলাম।

এক লহমার মধ্যে বিপরীত দিকের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। তাকিয়ে দেখলাম গিডো সজোরে নেমে আসছে প্রায় আমাদের সঙ্গেই—রাগে ওর মোটা ভুরুর নীচে চোখ দুটো জ্বলছে।

ও তখনো আমাদের কাছ থেকে দু'তিনটে ধাপ পিছনে—আমরা হোটেলের সদর দরজা পার হয়ে রাতের রাস্তায় নামলাম। আনন্দের খোঁজে এখনও লোক আসছে—তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। পিছনে তাকাতেই নজরে পড়ল, একখানা কাল সিট্রোন এবং একখানা দীর্ঘ শব-দেহের মতন শাদা মার্সিডিস একেবারে হোটেলের প্রবেশ পথ পর্যন্ত গিয়ে থামল। ভাগ্যদেবীর মূর্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম গিডো জুয়ার আড্ডার উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে ছায়া-শরীরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। আর আমাদের দিকে ওর লোমশ হাত তুলে ঘুষি পাকাচ্ছে।

যুবতীকে বললাম—পা চালাও।

ও বলল—বুঝেছি।

আমরা প্রমানেদ দ্য এ্যাঙ্গলেস-এর দিকে মোড় ঘুরে এগোলাম। হালকা কুয়াশার আবরণ সাগরের দিক থেকে ভেসে আসছে আর রাজপথের আলোগুলো নরম চাঁদোয়ায় ঢেকে দিচ্ছে যেন। ভারি বাতাস আলোকস্তম্ভ থেকে ঝুলন্ত দীর্ঘায়ত তিনরঙা পতাকাগুলো রাজপথ থেকে উৎসবের সাজ পরিয়ে দিয়েছে। রাজপথে গাড়ীর চলাচল কমে এসেছে—মাঝে মাঝে দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের গর্জন মৃতরাত্রির আসন্ন প্রশান্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে।

সাগর বেলায় সামান্য শীতের আমেজ, রাত আঁধারে জলীয়-বাষ্প বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে, রাত গভীর হওয়ার আগেই দিন ও অপরাহ্নের আবহাওয়ার বিস্ময়তা কেটে গেছে।

নীরবে আমরা আলো ছায়ার ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম। ওয়েষ্টমিনস্টার হোটেলের বারান্দায়। হলুদ রঙ আলোগুলো জ্বলছিল, বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে টেবিলগুলোতে জ্বলছিল হলদে মোমবাতিগুলো। আর সেখানে বুড়ো অতিথিরা ঘুমের সঙ্গে লড়াই করার জন্যেই যেন কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। হোটেল ছাড়িয়ে বিধ্বস্ত ভিলা প্র্যাট—অন্ধকারে ঢাকা, বড় বড় পাম গাছের আড়ালে জানালার ভাঙা চোরা খড়খড়ি নজরে পড়ছে।

আবার পিছন ফিরে তাকালাম। গিডোর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের পিছু নিয়েছে।

এখন আমরা ওয়েষ্ট এণ্ড হোটেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—ওটা ছাড়িয়ে মুশি মাসেনা হোটেল। লোহার গেটের ওপাশে তালগাছগুলো আলোয় উদ্ভাসিত।

জ্যোছনায় আকাশ মুখ হোটেল নেগ্রেস্কোর গম্বুজটা নারীর উত্তুঙ্গ স্তনের মতন দেখাচ্ছে।

থেমে যুবতীকে আমার দিকে ফেরালাম। উত্তেজনায় জলন্ত মুখমণ্ডল, উদ্দীপ্ত দৃষ্টি। এক লহমার জন্য ওর দেহ আমার দেহ স্পর্শ করল।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল যুবতী—ধন্যবাদ। বহুৎ ধন্যবাদ মিষ্টার···।

বললাম—এ্যাণ্ডারসন। নিকোলাস এ্যাণ্ডারসন।

বেশ, ধন্যবাদ মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন।

এখনও আমাকে ধন্যবাদ জানাবার সময় হয়নি। বললাম—তুমি যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ তা মনে হচ্ছে না। জুয়ার আড্ডার ঘটনার জন্যে তোমার বন্ধু গিডো খুব খুশি হয়নি।

না। সে বলল—ও খুশি হয়নি। আরও ঝঞ্ঝাট হবে।

বললাম—একটা কথার জবাব দাও ত। তোমার নাম কি নিচোল ক্যারা?

অনেকক্ষণ ধরে ও আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। সুন্দর একখানা মুখে নির্দোষ মেয়েলি ছাপ আর আবেগের মিশ্রন—এখন সেই মুখে হতাশার চিহ্ন।

অনেক লোক তাই বিশ্বাস করে। যুবতী জবাব দিল—অন্ততঃ একজন তাই চায়।

ও সাড়া দিল ঠিকই—কিন্তু জবাব দিল না। আমি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ওর মুখমণ্ডলে হতাশার চিহ্ন নিঃশেষে উপে গেল। দুষ্টুমি করে মাথা দোলাল।

বলল—তুমি আমাকে মদ খাওয়াবে বলছিলে মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন। এখনকার চেয়ে ভাল সময় কি আসবে?

নেগ্রেস্কো বার ভরা-ভরতি। বিশাল ঘরে হালকা গোলাপি আলোয় বুড়িরা ঝোলা-চামড়া-ঢাকা দেহে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

একখানা নীল শাদা পাথরের গোল টেবিলের ধারে আমরা পাশাপাশি বসলাম। আর সেই টেবিল ঢাকা ছিল কৃত্রিম চিতাবাঘের চামড়ায়।

আর একবার যুবতীর বড় সুন্দর শরীর সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, ওর উষ্ণ নিটোল জঙ্ঘা দুটো আমার চেয়ার ঘেঁষে প্রলম্বিত, ওর উত্তুঙ্গ দুটি স্তন, ধ্রুপদীয় গোল মুখমণ্ডল, কোমল ঝকঝকে কেশদাম আর উত্তেজিত পান্নার মত দু'টি চোখ।

শাদা পোশাক পরা একজন ওয়েটার আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—সক

হোটেলেরই খাদ্যের বিশেষ ধরণের আস্বাদের মতন এই ধরণের ওয়েটারদের সেবাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যুবতীকে বললাম—কি পান করবে বল ?

একটি টিন-এজার তন্বীকে সোডা-শপে ছেড়ে দিলে যেমন হয় তেমনি সরল হাসি হাসল যুবতী।

বলল—আরে, মদের কথা ত একটুও মনে নেই। সত্যি কথা বলতে কি মদপানে আমি খুব আসক্ত নই, ভক্ত নই। তবে একবার যদি মদপানের ইচ্ছা হল তাহলে পুরো ককটেল শেষ করতে পারি।

ওয়েটার পায়ের উপর নিজের ভার বদলে অস্থিরতা প্রকাশ করল। আমায় বোঝাতে চাইল এইসব ছোটখাট কথার ঝুড়ির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা।

অলিভ-মেশানো বাদামের ডিসের নীচে রাখা কার্ডখানা যুবতী বার করল। বলল—আমি দেখছি।

কার্ডে লেখা রয়েছে : রয়্যাল নেগ্রেস্কো—১৪ এফ।

কাল জামের সিরাপ, কমলার রস আর শ্যাম্পেনের মিশ্রণ—কার্ডের উপর লেখা দেখেই বমি এল।

যুবতীকে বললাম—না, মনে হচ্ছে তুমি মদ রসিক নও।

ওয়েটারকে তাই আমি নির্দেশ দিলাম—এক পেগ রয়্যাল নেগ্রেস্কো আর পেগ বরবন দেওয়া স্কচ দাও।

আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ওয়েটার চলে গেল।

নেগ্রেস্কো বারটা গোপন আড্ডাখানা নয়। বরং এটা একটা সুন্দর খোলা-মেলা জায়গা—তাই ত এখানে আসতে লাগে। জুয়ার আড্ডা থেকে বেরিয়ে তাই সোজা এখানে চলে এসেছি। আরও খুশি হলাম যখন যুবতীও এখানে আসতে চাইল। খেলার এই মুহূর্তে আমার গা ঢাকা দেওয়ার ইচ্ছে নেই। যুবতী আর গিডো সম্পর্ক আমি আরও অনেক কিছু জানতে চাই। জানতে চাই সেই লোকটার সম্পর্কে যে ওই নৃশংস গুহামানবকে মেডিটারেনি হোটেলে পাঠিয়েছিল। এবং নিশ্চিত হতে চাই যে, কেউ আমাকে খুঁজে বার করার জন্যে বিপদের ঝুঁকি নেয় নি।

এতক্ষণ পর্যন্ত রাতের কাজ ভালই হচ্ছে। আমি মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছি। জুয়াখেলায় আমি কিছু অর্থদণ্ড পেয়েছি। গিডোও আমাকে দেখেছে। এবং হয় ত আমি ঠিকই আন্দাজ করছি যে, কোনও একজন আমার চোখের আড়াল

থেকে দ্রুত নেগ্রেস্কো বারের দিকে যেতে লম্প করেছে। তারপর রাত শুধু ভালই নয়—এখনও সজীব।

ওয়েটার এসে ডাকল—ম্যাডাম। কোমর ভাঁজ করে দেহ নত করল এবং একখানা গোলাকার শাদা কাগজের উপর মদের গ্লাস রাখল। কাগজখানার উপর ইম্পিরিয়াল এন এবং নেগ্রেস্কো শব্দগুলো লেখা। তিনটে নীল রঙের রিঙের মধ্যে নিসে শব্দটা ছাপা।

মঁশিয়ে।

আমি যুবতীর দিকে ঘুরে ড্রিঙ্কের গ্লাস তুলে ধললাম—সৌভাগ্য।

যুবতী মদের গ্লাসের কিনারার ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকাল। যে দুষ্টুমি, এবং আনন্দ-উচ্ছলতার ভাব কয়েক মিনিট আগে ওর মুখে ফুটে উঠেছিল তা' উপে গেছে। ওর চোখে আবার জল দেখলাম।

বললাম—না। আজকের রাত তোমার জীবনে সৌভাগ্য বহন করে আসে নি।

বললাম—দেখ, আমার কথাগুলো যদি কঠোর মনে হয় তো ক্ষমা করো। জুয়ার আড্ডায় তোমার খেলা দেখে মনে হল যে, ড্রিঙ্কিং-এর মতন রুলেত খেলাও তুমি কম বোঝ। তোমার মাথায় নানা বিচিত্র ধারণা আছে। বলল—জানি খেলা।

লোকেরাও তাই সব সময় বলে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই যায় ওখানে মজা করতে। তুমি এমন একটা ভাব করছিলে যেন কেউ তোমাকে এই ভয়ানক খেলায় নিয়োগ করেছে।

লাগল। বলল—না, মিস্টার এ্যাণ্ডারসন···।

বললাম—দেখ, তুমি বরং নিক বলে ডেক।

বলল—ঠিক আছে, নিক।

এই ত বেশ বলেছ।

না, আমি জুয়ার আড্ডায় মজা লুঠতে যাই নি।

বললাম—তুমি ত পঁচানব্বুই ফ্রাঙ্ক হেরেছ।

বলল দেখছি, তুমি আমার উপর কড়া নজর রেখেছিলে।

বললাম—দেখ, নিসে শহরে আমি একা এসেছি। আর তোমাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল।

মৃদু হেসে বলল—বোধহয়, আমি তাই ছিলাম।

আবার বললাম—তাহলে তোমার কাছে মাত্তর পাঁচ ফ্রাঙ্ক রয়েছে ?

যুবতী ওর হাতব্যাগ খুলল। দেখলাম, ওর মধ্যে রয়েছে একখানা শাদা রুমাল, পাশপোর্ট, ঠোঁট-পালিশ এবং শেষ হলুদ-রঙ চাকতিখানা। সে ওখানা বার করে শাদা পাথরের টেবিলের উপর রাখল। ঠক করে একটা শব্দ হল। ফিস-ফিস করে বলল—মাত্তর পাঁচটা ফ্রাঙ্ক।

বললাম—সংসারে মাত্র এই পাঁচটা ফ্রাঙ্ক তোমার আছে, তাই না ?

হাঁ। তাই দেখাচ্ছে, না ?

সত্যিই তাই।

যুবতী বলল - কিন্তু সত্যিকারের পাঁচটা ফ্রাঙ্কও নয়, এটা ও একটুকরো প্লাসটিক্।

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, জুয়ার আড্ডায় জেতবার জন্যে অত ব্যগ্র হয়েছিলে কেন ?

সেই রাতে দ্বিতীয়বার ওর দৃষ্টি আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ হল।

বললাম—তোমাকে গরীব মনে হয় না এবং ভুখাও দেখায় না। তোমার যে আশ্রয় আর পোষাকের অভাব আছে তাও নয়। তোমার জুয়া খেলার ধরণ দেখে আমার ধারণা হল না যে, ছুটি কাটানোর জন্য বা গাড়ী কিংবা জুয়েলারি কিনবার জন্য তুমি খেলছ। তোমার চোখে-মুখে লোভের চিহ্ন নেই।

না, তা ছিল না ?

ও বলল—হাঁ, ঠিক তাই।

আসার কারণ জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আর একবার ওর বুদ্ধি প্রখর সবুজ দৃষ্টি মেলে ধরল আমার মুখের উপর—ওর দৃষ্টি এখন উত্তেজনাহীন ঠাণ্ডা এবং সাগরের মতন গভীর।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি দেখলে আমার মুখে ?

যুবতী বলল—দেখলাম বিপদ। গণ্ডগোল।

বললাম—আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

হাঁ। তাও অনুভব করলাম।

বললাম—তাছাড়া হাতে তোমার রয়েছে মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্ক। এর বেশি তুমি পছন্দ করতেও পার না।

ওর বিনম্র আধ-খোলা দু'ঠোঁটের মাঝে সুন্দর সাজানো শক্তরুচি। ও মৃদু

অনিচ্ছুক হাসি হাসল। বলল—তোমায় বিশ্বাস না করলে চলে যেতাম। আর কাউকে খুঁজে বার করতাম।

এটা এত প্রয়োজনীয় ?

হাত বাড়িয়ে মদের গ্লাসটা তুলে নিয়ে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলল—হ্যাঁ।

আর এক পেগ নেবে ?

ও বলল—মদপানে আমি খুব অভ্যস্ত নই। তবু মনে ইচ্ছে, আর এক গ্লাস নেব। জানি না ভোলবার জন্যে কি আনন্দ করার জন্য মদ পান করছি। হ্যাঁ, নিক। আর এক গ্লাস নেব।

ওয়েটারকে ডাকলাম। এবং ও যতক্ষণ না আর একটা রয়্যাল নেগ্রেস্কো নিয়ে এল আমরা নীরবে বসে রইলাম।

যুবতী আবার চুমুক দিল, পান শেষ হলে মনে হল ও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে। বলল—হাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। আশাকরি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করবে। মনে হচ্ছে, তোমার মতন মানুষই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। অবশ্য এই সাহায্য তুমি আমার মতন একটা অতি সাধারণ মেয়ে যাকে একরাতে এক জুয়ার আড্ডায় দেখেছিলে তাকে করবে না। ওকে যেন আশ্বাস দিয়ে বললাম—তা আমি জানি।

আমি আর তুমি-ছাড়াও ওই ব্যাপারটা আরও ব্যাপক, অতি দূর বিস্তৃত। খুব অল্প দিনের মধ্যে আমাকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। দেখছ ত। দেখ, আমি টাকা চাই একজনকে ভাড়া করতে!

অকথিত প্রশ্ন আমার মনে—ভুরু তুলে আমি ওর দিকে তাকালাম।

যুবতী বলতে লাগল—একজন বিশেষ মানুষকে আমার দরকার। জানি না সে কত টাকা মজুরি নেবে। তুমি কি জান, নিক ? কত খরচ পড়বে ? একজন খুনেকে ভাড়া করতে ?

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে হলুদ-রঙ চাকতিটা তুলে নিলাম।

বললাম—পাঁচ ফ্রাঙ্ক ?

॥ ৫ ॥

এক লহমার জন্য, যুবতীর মুখের ভাব বিস্ময়ের কাছে ধরা পড়েছে এবং তারপর, ও-ওর আশ্চর্যজনক মুখ আমার দিকে ফেরাল। সে ঝুঁকল আমার মুখের কাছে, আমি ওর দু'চোখের দিকে তাকালাম, দু'খণ্ড পান্না যেন

জ্বলছে, ওর ঠোঁট দু'খানা আধ খোলা, আমার কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

পর মুহূর্তে ও জমে পাষাণ হয়ে গেছে। মুখের রঙ ছাই। ওর দৃষ্টি দূরে সরে গেছে—আমাকে ডিঙিয়ে নিগ্রেস্কো বারের পাশ-দরজায় আটকে গেছে। ঘুরলাম।

সব প্রথম দেখলাম গিডোকে—মৃদু হাসছে! এবার নজর পড়ল রোগা দীর্ঘদেহী একজন চীনার উপর—মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোকটা কাল পোশাক পরে আছে, মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন। এবং ওদের মাঝখানে, সাধারণ চোখে যাদের পরিচারক বলে মনে হয়, তাদের মাঝখানে একটা জঘন্য জীব দাঁড়িয়ে আছে—ওরই নাম ডক্টর লোয়ার ইন্সুরিস।

সেই মুহূর্তে আমি লোকটাকে দেখতে লাগলাম—মেয়েটিকে আমার ঠোঁটের খুব কাছে ঠোঁট আনতে দেখে তার মনে যে ভয়ানক রাগ হয়েছিল সেই রাগ সে আপ্রাণ চেষ্টা করে দমন করতে চাইছিল। সে নিজেকে বিনম্র ব্যবহারের পরিধিতে আটকে রেখে নিজেকে সহজ করে তুলতে ব্যগ্র ছিল। লোকটার পরণে সুন্দর কাট-ছাঁটের নীলরঙ ব্লেজার, ধূসর-রঙ কেমব্রিজ স্লাকস, গায়ের শার্টটা নিজেই প্রচার করছে যে, ওটা লণ্ডনের প্রখ্যাত দর্জিসংস্থা জেরিটি স্ট্রীটের টার্নবুল এবং এ্যাসাবের তৈরী, ওর জুতো জোড়া গিশি কোম্পানীর এবং গলায় একখানা সিল্কের স্কার্ফ।

পোশাক-আশাকের প্রতি অত্যন্ত যত্ন এবং সুপ্রচুর ব্যয় করা সত্ত্বেও ডক্টর ইন্সুরিসের চরিত্রের যে গুণটা সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে তা'হচ্ছে এক শক্তিমত্ত প্রকৃতির কাছে বুদ্ধির দাসত্ব।

তার চোখ দু'টো—যেগুলো স্ফটিকের দানার মতন তার মনের সত্যিকারের ইচ্ছাকে গোপন করে রেখেছে—সে দু'টো কালো রেশমী চুলে ঢাকা মাথায় বসানো। আর চুলগুলো সঙ্কীর্ণ কপালের উপর থেকে পিছন দিকে আঁচড়ানো। পাতলা গোলাপি এক জোড়া ঠোঁট, খ্যাবড়া নাকে একজোড়া ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র—এমন সমগ্র মাথাটা দেহের তুলনায় খুবই ছোট। অথচ দেহ বেশ লম্বা আর চওড়া—কিন্তু শক্তির বাহ্য প্রকাশ নেই, শুধু চিরন্তন আত্ম-সুখপরতার মাঝে সমাহিত বিনম্রভাব এর মূল। হাত দু'খানা অস্বাভাবিক। দীর্ঘ তালু—অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ। মোমবাতির মতন আঙুলগুলোতে ভোঁতা ভোঁতা নখ। যেন সার্জেনের কিংবা শ্বাসরোধকারীর হাত। মসৃণ, শ্মশ্রুহীন, গোল

মুখমণ্ডল এবং এক ধরণের বিশেষ রুগ্ন হলুদ-রঙ গায়ের চামড়া—যেন লোকটা গ্রন্থি চ্যুতির রোগে ভুগছে যার ফলে প্রথমে তার দেহ এবং পরে তার মনকে অস্বাভাবিক বাতিক গ্রস্থ করে তুলেছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় যেন ও মানুষকে উৎপীড়ন করে আনন্দলাভ করে এবং এই উৎপীড়নের দ্বারা সে তার ভয়ঙ্কর কাল ইচ্ছা, যা' তাকে শাসন করে, তার কাছে নতী স্বীকার করায়। শয়তানি যেন ওর দেহের প্রতি লোমকূপ হাতে নিঃসৃত হয়। দেখলাম, ওর গলায় জড়ানো স্কার্ফখানা খসে পড়ল এবং সঙ্গে ও কণ্ঠে দু'হালি মটর মালার মত ডুমো ডুমো আঁচল নজরে এল।

ওর মতন মানুষ এর আগেও আমার নজরে পড়ছে। ওদের মধ্যে ছিল সহজাত আত্মবিশ্বাস যার প্রভাবে তারা অকথিত বর্ম সম্পাদন করেছিলেন—এবং নিজের প্রতিভার উপর বিশ্বাস যার জন্যে তাদের ধারণা ছিল কুকর্মের শাস্তির হাত থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে। মুখ খোলার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে ডক্টর লোয়ার ইনুরিস এমন একটা লোক যার চরিত্রে মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নেই।

লোকটা হাসল। দেহ আনত করল। ওর বিশীর্ণ একখানা হাত ভুল অভিবাদনের ভঙ্গিতে এবং তারপর আমার দিকে এগিয়ে এল।

উঠলাম ওর সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য।

বলল—একবরে মনে হয়েছিল আমরা আপনাকে বুঝি হারিয়েছি। আর তাহলে সেটা হত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। মাপ করুন, আমি ঠিক শিষ্টাচার জানি না। নিজের পরিচয় আমার দেওয়া উচিৎ। আমি ডক্টর লোয়ার ইনুরিস।

করমর্দন করার জন্যে যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে কোনও চাপ ছিল না।

আমার আন্তরিকতা জানালাম। বললাম—ডক্টর, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশি হলাম। আমি নিকোলাস এ্যাণ্ডারসন।

ও বলল—একজন আমেরিকান মনে হচ্ছে।

বললাম—ঠিক তাই।

ও বলল—সুন্দর সব লোক। ইউরোপ তোমাদের কাছে অনেক কিছুর জন্যে ঋণী।

জবাব দিলাম—আপনি খুবই ভাল মানুষ তাই একথা বললেন, ডক্টর। আসল কাগজে যাই বলুক আমরা সবসময় এখানে সাদর অভ্যর্থনা পাই না।

ও বলল—হ্যাঁ, কেউ কেউ ভুলে যায়, কিন্তু আমি তাদের মতন নই। আমি তাদের দলে যারা বলে, সহ্যশক্তিই হচ্ছে উত্তম আচরণ।

আচ্ছা,আপনার জন্যে একটা ড্রিঙ্ক আনাই ডক্টর?

সে অপারগ হয়ে মাথা নাড়ল। বলল আপনার মহানুভবতা আমার ভাল লেগেছে; মিষ্টার এণ্ডারসন, কিন্তু রাজী নই। আমার এখানে আসাটা সামাজিক নয়, বরং খাঁটি পেশাগত।

আমি ওই লোকটি আর মেয়েটির মাঝে দাঁড়িয়েছিলাম—এবং মেয়েটি আমার পিছনে টেবিলের ধারে বসেছিল। ও মেয়েটির দিকে গলা বাড়িয়ে দিল এবং সযত্ন সংহত কণ্ঠস্বর আরও নামাল।

তার এই কণ্ঠস্বর ইঙ্গিত মুখর। এবং এই অনুচ্চারিত দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর ডক্টর ইসুরিসের প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রভাব শ্রোতার উপর জারি করার জন্য বলা হয়েছিল—প্রকাশ করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ক্ষমতা ও সুপরিস্ফুট আন্তরিকতা এবং এসবও যদি বিফল হয় তবে ওই লোকটিকে উত্তেজিত করা হচ্ছে আর তার সঙ্গী দু'জন ভয়ানক আঘাত হানতে সক্ষম।

লোকটি বলল—মিষ্টার এণ্ডারসন, আপনি যদি ইউরোপের এবং প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যদি সুপরিচিত হন তাহলে বোধহয় জানেন যে ডক্টর উপাধিটি নির্বিচারে দেওয়া হয়। কিন্তু আমি এই উপাধি অর্জন করেছি নিজের বুদ্ধিমত্তা আর পড়াশুনার মাধ্যমে। ভেষজ শাস্ত্রে আমি ডক্টরেট পেয়েছি, মিষ্টার এণ্ডারসন। শল্য-চিকিৎসায় আমি বিশেষজ্ঞ। ও বিশাল হাত দু'খানা শূন্যে ছুঁড়ল। যুবতীর দিকে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—এবং এই শল্য-বিদ্যা এক ধরণের যান্ত্রিক শিল্প এর সঙ্গে পরিচয় থাকায় আমি বুদ্ধিকে প্রোজ্জ্বল করার কাজ তুচ্ছ করিনি বলেই আমি বহু কষ্ট সহ্য করে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি একজন মনঃসমীক্ষক এবং খুব জটিল রোগীদের সারাবার চেষ্টা করি।

জানি দারুণ নৃশংসভাবে ওকে পিছন থেকে ছুরি মারা হবে। তবু বললাম—হাতুড়ে, এঃ।

ওকে থতমত খেতে দেখে বুঝলাম ফল হয়েছে। মুখে একটা শব্দ করে ও বলল—হাঁ, জানি। আমেরিকান তোমরা ওদের তাই বল। ভারি চিত্তাকর্ষক আর একদম আদিম নাম। কিন্তু আবার বলছি, ইংরাজী ভাষা বড় সম্প্রসারণশীল, অফুরন্ত দিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যাহোক। আমি বিষয়ান্তরে যাব না। বলছি শুনুন আপনার সাথে যে যুবতী সে রয়েছে আমার একজন রোগিনী।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলাম —ডক, আপনি বলছেন যুবতী মানসিক রোগিনী ?

ডক্টর ইনুরিস আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংযত রাখতে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর ধৈর্যশক্তির উপর বেপরোয়া আঘাত হানছি। বলল—সাধারণভাবে বললে তাই বলতে হয়। কিন্তু চিকিৎসকের দৃষ্টিতে বলতে হয় এটা আরও বেশী জটিল। কিন্তু চিকিৎসক রোগী সম্পর্ক ক্ষুণ্ন না করে অথবা শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের তথ্যাদি বর্ণনা না করেও বলা যায় যে, যুবতী ভয়ানক মনোবিকলঙ্গে ভুগছে !

বললাম—তাই দেখছি। মনে মনে বললাম—তুমি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ।

আপনাদের মতন অনভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না।

বললাম—আমিও তাই আন্দাজ করছি।

আমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডক্টর ইনুরিস বলল—আপনার মতন উদার চরিত্রের মানুষ দেখে বড় খুশি হলাম, মিষ্টার এণ্ডারসন। গিডো আমাকে বলেছে যে, তার সঙ্গে আপনার আচরণ—আপনাকে কেমন করে বলি বলুন ?—আচরণ ছিল বিবাদমান।

বললাম—আমার ধারণাও তাই। অবশ্য আপনার অনুচর গিডো ও যুবতী মহিলার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করে নি। আমি বলতে চাইছি যে, সে মহিলাকে পীড়ন করছিল এবং মহিলাও তার সঙ্গ ঠিক চাইছিল না।

ডক্টর ইনুরিস তার কপট হাসি দিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করল, বলল —আমি আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। দেখুন গিডো মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে এখান থেকে কাছেই ওঠে এবং তা' করে আমার রাগ এড়াবার জন্যে। আমার ত নিজস্ব চিকিৎসালয় নেই। একখানা বাড়ীতে যুবতী আমার চিকিৎসাধীন রয়েছে। এসময় যুবতীর পক্ষে আপনার আমার কাছে যা একটা সামাজিক দেওয়া-নেওয়া, তা'তে রত হওয়া পরামর্শ-বিরোধী হবে।

এবং ও বলতে লাগল—এইতো গত সপ্তাহে যুবতী ভিলা ছেড়ে বে-আইনি ভাবে বেরিয়ে জুয়ার আড্ডার দিকে গিয়েছিল। গিডো পেশার দিক দিয়ে মেল সার্স নয়—কাজেই তার কাজে গাফিলতি থাকতে পারে। তাই যুবতী সাময়িকভাবে পলায়ন করলে আমি গিডোর ওপর খুবই রাগ করেছিলাম এবং গিডো তখন আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তার রক্ষাধীন থেকে যুবতীকে সে

কোনও দিন পালাতে দেবে না। তবু আজ রাতে সে আবার ভিলা ছেড়ে এসেছে।

কাজেই এটা আমাদের কাছে সহজে বোধগম্য হবে যে গিডো,—হ্যাঁ কিভাবে ব্যাখ্যা করব?—যুবতীর উপর লুট হবে? ডক্টর ইনুরিস বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু করল—এটা আমি বুঝতে অক্ষম যে আর্গান একজন ভদ্রলোক হয়েও কেন যুবতীকে রক্ষা করার জন্য সাহস দেখালেন না নাকি আচরণ-বিধিতে অপরের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া আর কিছু নয়।

বললাম -দেখুন ডক্টর, ব্যাপারটা যে এতখানি জটিল তা আমার জানা ছিল না। আমার মনে হল যে, আপনার ঐ অনুচর গিডো ঠিক ভাল ব্যবহার করছে না।

সে বলল—আকৃতি প্রায়ই ঠকায়।

স্বীকার করলাম—তা করে বোধ হয়। আমার ত কখনও ওকে মানসিক রোগী বলে মনে হয় নি।

আমাকে যেন আশ্বস্ত করার জন্য আমার পিঠ চাপড়ে ডক্টর বলল—দেখুন সামান্য দেখেই সঠিক আন্দাজ করার আশা আপনার কাছে আশা করলে তা বেশী আশা করা হবে। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজেই এক বিস্ময়কর বস্তু।

বললাম—হয়ত বা তা হবে।

মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, আমিও আমার সহকর্মীরা ঐ যুবতীকে আপনার রতিসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভিলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করছি এবং তাতে রাজী হবেন। আপনি এবং যুবতী যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাছি না, কিন্তু আপনি যদি আমার একটা সু অর্থবহ উপদেশ শোনেন তবে যুবতী যা কিছু বলেছে তা অসুস্থতার ঘোরে বলেছে মনে করবেন। মাঝে মাঝে ওর মনে চেতনা জাগে তখন যুবতী যা' কিছু বলে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় এবং সেই চেতুনাটুকুর জন্যে আমি করছি ওকে সুস্থ করে তুলব। আর সুস্থ করে তুলব। আর সুস্থ করে তোলার সে ক্ষমতা আমার আছে।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম—ডক্টর, আমিও আশা করছি আপনি ওকে সুস্থ করে তুলবেন। এমন অনুপম সুন্দরী একটি যুবতী তার এমন অবস্থা···বড় লজ্জার কথা।

ডক্টর ইনুরিস বলল—আমিও তাই আশা করছি, কিন্তু চিকিৎসার ধারা খুব দীর্ঘ।

বললাম—ভারী বিশ্রী-ত।

বেশ অধীর হয়ে ডক্টর বলল—সত্যিই। কিন্তু আবার আমাকে যেতেই হবে। বড় আনন্দিত হলাম মিষ্টার এণ্ডারসন। সে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করল। গিডো এগিয়ে এল। কাজ করতে উদ্যত হল।

তার প্রয়োজন ছিল না। মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট পার্সটা বগলের নীচে নিল, তারপর এগিয়ে গেল তার দিকে।

ডক্টর মেয়েটির দিকে সহৃদয় হাসি ছড়াল।

অসহ্য অগ্রাহ্যের ভাব করে যুবতী ডক্টর ও গিডোর পাশ দিয়ে ঘুরন্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওই দরজা দিয়েই ওরা ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেই দীর্ঘ ক্ষীণ চেহারার টানে ম্যাণ্টা ওর পথ আটকাতে চাইল কিন্তু যুবতী আরও এগিয়ে যেতে ডক্টর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়াল, চীনেম্যান লাট্টুর মতন ঘুরে ওর পথ ছেড়ে দিল—এবং যুবতীকে অনুসরণ করল। গিডোও ওদের পিছনে চলল।

ডক্টর ইনুরিস আমাকে শুনিয়ে বলল—এই কাহিনী আপনাকে দুঃখ দিল। মাথা নেড়ে বললাম বড় বিশ্রী ব্যাপার। এমন সুন্দরী একটি মেয়ে···।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ডক্টর ইনুরিস বলল—আপনি মেয়েটিকে ভুলে যান···।

বললাম চেষ্টা করব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কোমল সুরে বলল ডক্টর—না না। তার দরকার নেই।

বললাম—ওঃ আমি শুধু অবস্থাটা জানব।

ডক্টরের মুখ কাল হয়ে উঠল—যা ভাল বোঝেন করবেন।

আমিও তাকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তার মোড়ে মৃত্যু শ্বেত মারসিডিস গাড়ীখানা দাঁড় করানো ছিল। মনে পড়ল, জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আমরা যখন আসি তখনও গাড়ীখানা ওখানে ছিল। যুবতী, গিডো এবং চীনেম্যানটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল।

ডক্টর টুকিকি দিয়ে বলল—কি এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?

চীনেম্যান পিছনের দরজাটা খুলে দিল, তারপর সামনে এগিয়ে গেল এবং চালকের আসনে বসল।

ওর অনুপম দীর্ঘ পা দু'খানি বারেকের জন্য ঝলমল করে উঠল, যুবতী গাড়ীর

পিছনের আসনে গিয়ে বসল। দেখলাম, ওর পায়ে হাইহিল জুতো পরে না। তবে জুতো জোড়া ওর পায়ে সুন্দর মানিয়েছে। কয়েক বছর আগে নিচোল ক্যারা যখন বেঁচেছিল তখন এ ধরনের জুতোর খুব চল ছিল।

আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার ?

আপনি যদি মঁশিয়ে যেতে চান, নিয়ে যাব। তবে মাপ করবেন বলছি বলে, ও বাড়ীখানা অদ্ভুত।

ওর রেনোর পিছনের দরজা খুলে আসনে বসতে বসতে বললাম—সত্যি ? কেন বল ত। কিন্তু দাঁড়িও না চল।

ভ্রমণ-বিল সীদের রাস্তা ধরে গাড়ীখানা পশ্চিমদিকে ছুটল, তারপর পিছিয়ে এল প্রথম বাঁকের দিকে।

চালক বলল—কেউ থাকে না ওখানে। ওখানা বাড়ী।

জানতে চাইলাম—সম্প্রতি ওদিকে গেছ না কি ?

না। সত্যি বলতে কি আমি ওখানে যাইনি। তবে মঁশিয়ে, বহুকাল ধরে ও বাড়ীতে কেউ থাকে না। এবং তা আমি ভালভাবেই জানি। কয়েক সপ্তাহ, বোধ হয় মাস খানেক হবে। রাতের বেলা আমি ওখান দিয়ে আসছিলাম রাস্তা আর ভিলার মধ্যে উঁচু পাথরের দেওয়াল—এবং দেওয়ালে সংলগ্ন বন্ধ লোহার গেট। গেটের ভিতর দিয়ে তাকিয়েছিলাম। আলো জ্বলছিল না। বসতি নেই এমন স্থান দেখলেই বোঝা যায়। ওই ভিলাটা জনমানবহীন।

জানতে চাইলাম—বাড়ীখানা কার জান ?

না মঁশিয়ে, জানি না। আবার কখনও নতুন লোকজন দেখলে বুঝতে হবে মালিক বাড়ী ভাড়া দিয়েছে।

গাড়ীর গতি বাড়ছিল। দেখলাম, পিছনে হোটেল বো-রিভেজ মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ী একটা চওড়া বাঁক ঘুরে বন্দরের রাস্তা ধরে নামছিল। এবং সমুদ্রের ধার থেকে পাহাড়টার মাথা সোজা উঠে গেছে তার গা বরাবর গাড়ী নিচে নেমে এল।

চালক বলল—ওই ভিলাতে সব সময় নতুন নতুন মুখের আবির্ভাব হয়।

বললাম—রাস্তা দিয়ে চল।

হ্যাঁ, মঁশিয়ে। তাই যাচ্ছি।

আমরা এবার চড়াইয়ে উঠছিলাম। নিসে শহর আমাদের পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেক নীচে শান্ত সাগরের বুক পাতলা কুয়াশার

ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিল শূন্যে। ও ছুটে এল কাছে। আনত মুখে সতর্ক দৃষ্টি ওয়েটার বিলখানা শ্বেত পাথরে টেবিলের উপর বাড়িয়ে দিল। ওর হাতের দিকে তাকাতে একখানা হাতে লেখা চিরকুট নজরে পড়ল। যুবতীর মদের গ্লাসে চাপা দেওয়া রয়েছে চিরকুটখানা।

গ্লাস তুলে চিরকুটখানা বার করলাম। ডক্টর ইসুরিস এবং আমি যখন মিথ্যের ঝুলি খুলেছিলাম, যুবতী তখন খুব ব্যস্ত ছিল।

ভুরু আঁকবার কাল পেন্সিল দিয়ে যুবতী চিরকুট খানা লিখেছে। ভিলা নারকিসা। ক্যাপ ফেরাত। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বাঁচাও। লেখার নীচে কোনও নাম সই নেই। অথচ মেয়েটি যে কে তা এখনও আমি জানি নে।

কিন্তু মেয়েটি যে একটু আগে কি ছিল তা জানি, ছিল প্রকৃতিস্থ। ডক্টর ইসুরিস যা কিছু বলুক না কেন! সুন্দরী এবং বেপরোয়া। জোরজুলুম ছাড়া ওই অশুভ ডক্টরের চেয়ে সে বরং আমাকেই অনেক বেশি বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যুবতী যে কে সেটাই এখনও রহস্যে ঢাকা!

রাত ফুরোবার আগেই আমি এ রহস্য ভেদ করতে চাইছি।

তবে আমাকেই আগে বাড়তে হবে। ঘড়ি দেখলাম। রাত একটা বেজে গেছে—এবং ডক্টর ইসুরিস ত আগেই ভেগেছে। বিল মিটিয়ে দিলাম। নিরুৎসাহ হল ওয়েটার। নেগ্রেস্কো হোটেলের সদর দরজা পার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অজস্র ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। ট্যাক্সি লাইনের মাথায় একখানা রেনো গাড়ী—তবলা চালক মাথা পিছনে হেলিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মারতেই ও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল। ধর্ত জানোয়ারের মতন বোকা-বোকা হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল। যেন একজন ঘুঘু সৈনিক হাসছে।

বেশ সপ্রতিভভাবে সোজা হয়ে বসে আওড়াল—মঁশিয়ে।

জানতে চাইলাম— ক্যাপ ফেরাত চেন?

বলল— নিশ্চয়।

ভিলা নারকিসা কোথায় জান?

হ্যাঁ।

ডকটর ইসুরিস যুবতীর পাশে বসল। গিডো দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামনের আসনে চীনেম্যানের পাশে উঠে বসল। মোটর তখন চলছিল মোড় ঘুরে গাড়ী চলে গেল।

আমি গাড়ীখানার উপর নজর রেখেছিলাম—ওর লাইসেন্স প্লেটখানার নম্বর পড়লাম। আগের মোড়ে পৌঁছে গাড়ীখানা গতি কমাল। পিছনের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, ডক্টর হাত তুলে ওই সুন্দর মুখে চড় মারছে।

তারপর আরও ভাল মতলব মাথায় এল। মাকড়সার মতন বিশাল হাতের থাবা ঝুলে পড়ল এবং নিমেষের মধ্যে কেবল বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনি এগিয়ে গেল।

ভুতুড়ে গাড়ীখানা তখন মোড় ঘুরছিল—ডক্টর লোথার ইন্থরিস ধীরে ধীরে আঙ্গুল বসাল—আনন্দের হাসি ছড়াল তার সারা মুখে। তারপর যুবতীর শ্বাসনালীটা চাপতে লাগল।

ঘুরে আবার বারে ফিরে এলাম। যদি যুবতীকে দ্রুত খুন করার ইচ্ছে ডক্টর ইন্থরিসের সঙ্গে থেকে থাকে তবে গিডোই সে কাজ ডক্টরের হয়ে করতে পারবে।

তবে ডক্টর ধীরে মৃত্যু ঘটানোই বেশী উপযুক্ত বলে মনে করবে। এবং আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর সে ধরণের মৃত্যু ঘটাতে ডক্টর মোটর গাড়ীর পিছনের আসন বেছে নেবে না—তার জন্যে উপযুক্ত এবং সুসজ্জিত স্থান বেছে নেবে।

আমি এবার এসে টেবিলে বসলাম, ওয়েটারও আমার উপর সতর্ক নজর দিল—সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডক্টর ইন্থরিস তার দলের সাথে রাস্তায় স্বল্প বাক্যালাপ সাঙ্গ করে আমাকে ফিরে আসতে দেখে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, ও আমায় নিরাপত্তার জন্যে না ওর বিলের পাওনার জন্যে চিন্তিত হয়েছিল। সন্দেহ হল যে, ও আমার জন্যেই বেশী চিন্তিত—ও কি বুঝতে পেরেছিল যে আরও অন্যান্য টুরিষ্টদের মতন আমি মদের দাম এবং ওর বখশিশ দিতে সক্ষম এবং ওর দু'ধরনের পাওয়া সম্পর্ক একটুও আশঙ্কিত নই।

তারপর ড্রাইভার ঝুঁকল এবং আসনের নীচে হাত তোকাল। সোজা হয়ে বসল এক সময়, ওর হাতে একখানা লোহার চাকার হাত। হাসতে হাসতে বলল —আপনার হয়ত দরকার হতে পারে?

হয়ত কাজে লাগতে পারে, তবে আমি খালি হাতে যাব। তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।

চালক বলল কোন কিছু ভাববেন না। তবে ভিলাটা ভারী অদ্ভুত, পুরনো বাড়ী খুব বাস্তবহীন, ও এমন জায়গা, যেখানে কেউ আদর অভ্যর্থনা আশা করে না।

বললাম—কখনও যাইনি ওখানে, তবে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি।

বলল—আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। দৃষ্টি আপনার সহজ হবে।

জানতে চাইলাম—সেনাবাহিনীতে ?

জবাব দিল—না বিদেশ মন্ত্রকে ? কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বোজান। গাড়ী পৌঁছলে আমি ডাকবো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এসে একটা জায়গায় থামল। বলল ঠিক আছে। চোখ খুললাম চারিধারে নিস্তব্ধ কাল আঁধার। চালককে এক মুঠো ফ্রাঙ্ক দিলাম। বলল—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।

চালক গাড়ীর ভিতর থেকে বাইরে ঝুঁকল—সোজা এক ভিলার সামনে। ডান দিকে। পাথরের দেওয়াল, অন্তত তিন মিটার উঁচু। মাথায় লোহার গোঁজা। অবশ্য ভিতরে চুরি করার মতন দামী কিছু নেই। অন্তত একমাস আগেও ছিল না। যাগগে আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।

নিঃশব্দে রাস্তার উপর গাড়ী পিছনে চালাতে চালাতে সে হাসছিল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আর যখন চালকের আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না তখনই হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতেই পরখ করে নিলাম যে, স্নায়ুগুলো ঠিক জায়গায় আছে কি-না ?

শ্যাওলার জ্যবড়া দাগ পুরোনো গায়ে শেষ বৎসর সংক্রামক ব্যাধি লোহার গেটটা জং ধরা। ভিতরে ধূসর কুয়াশায় আবরণ ঠেলে যে সবুজ গাছগুলো মাথা তুলেছে গায়ের উপর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আর মাটিতে প্রথম বর্ধিত ঘাসের চাবড়াগুলো শবদেহের মুখে দাড়ির মতন।

রাস্তা থেকে খুব অল্পই নজরে পড়ছিল, একটা পরিস্কার পথ, ভিজা দুমড়ান ঘাসের—ডগাগুলো—সম্প্রতি কোনও গাড়ী এই পথে চলাচলের চিহ্ন। খুব উঁচু উঁচু প্রাচীন বৃক্ষগুলো যেন ভিলা আর রাস্তার মাঝে প্রহরীর মতন দণ্ডায়মান।

এক মুহূর্তের জন্যে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। শুধু নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার উপস্থিতি বুঝে জেনেও কুকুর ডেকে উঠল না। প্রায়ই আমার যে ইন্দ্রিয় জানাল—না তেমন কিছু জানাল না—প্রহরী নেই।

গায়ের কোটটা খুলে পাঁচিলের মাথায় ছুঁড়ে দিলাম—অনুসন্ধি ও সুদের মত ক্ষত বিক্ষত করার জন্য পাথরের উপর কাচের টুকরো বসানো। আমার কোট আমাকে কাঁচের টুকরোর হাত থেকে বাঁচাবে। লাফিয়ে উঠলাম, ধরবার একটা

নিরাপদে বস্তু পেলাম এবং তারপর বিশেষ কায়দায় ডিগবাজী দিয়ে পাঁচিল টপকে ওধারে পড়লাম আর পড়বার আগে কোটটা পাঁচিলের মাথা থেকে টেনে নিলাম।

পাঁচিলের গোড়ায় গুঁড়ি দিয়ে বসে শুনতে চেষ্টা করলাম। শুধু নীরবতা মাথা নীচে বুঁজিয়ে গাছের আড়াল দিয়ে রাস্তার সমান্তরাল পথে হাঁটতে লাগলাম।

ভিজে ঘাসে পা ফেলে ফেলে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। কুয়াশা আর সবুজ গাছ গাছড়া ও সাগর জলের গন্ধ মেশা বাতাস আমার চারিধারে পাক দিচ্ছিল।

আমি চড়াইয়ে উঠছিলাম। এবং সহসা বড় বড় কক্ষের ভিতর দিয়ে এক পলক আলোক আমার নজরে পড়ল। মুহূর্ত মধ্যে আমি খোলা জায়গায় হাজির হলাম। গাছ গাছড়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে দেখলাম চলাচলের পথটা আমার ডানদিক থেকে বামদিকে প্রলম্বিত—তারপর আবার বামদিকে ঘুরে ভিলার সদর দরজায় পৌঁছেছে, মৃত্য সাদা মারসিডিস গাড়ীখানা কুয়াশার আড়ালে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মতন ড্রাইভ-ওয়ের ওপর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ওই ভিলাটা—ওটা রাতের সমুদ্র-বাতাসের মুখে ঠাণ্ডা পাষাণের মূর্ত্তির মতব দণ্ডায়মান—যেন ওটা কুয়াশার আবরণে মোড়া আবছা এক দুঃস্বপ্নের কেন্দ্র। অনেক উঁচুতে একটা ঝুলে পড়া জানলার ফ্রেম—খুব সাদা এক টুকরো পরদা চাঁদের আলোয় পত পত করে উড়ছে—যেন দৃষ্টিহীন চোখের মতন ঝুঁকে সব কিছু দেখতে চেষ্টা করছে। ভিলার উপরের দুটো তলা একদম অন্ধকারে ঢাকা। শুধু নীচের তলার তিনটে জানলার আলোর আভাষ।

গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আমি সারা বাড়ীখানা একবার চক্কর দিয়ে এলাম। পিছনের অংশ দূরের বিপরীত পাশটা এবং সামনের অংশটা একদম অন্ধকার। ঘাসের চাবড়া পেরিয়ে বাড়ীর কাছাকাছি এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার ডান দিকের একেবারে শেষ জানলাটার পাতলা পর্দা। গুঁড়িমারা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকালাম

এটা রান্নাঘর। একখানা কাঠের টেবিলের পাশে বসে আছে দীর্ঘাঙ্গ চীনে-ম্যান আমার দিকে তার পিঠ গরম চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

আবার হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো জানলাটার দিকে এগোলাম, স্যাঁৎসেতে অবস্থাকে ধন্যবাদ—আমার পায়ের শব্দ জাগছে না। মাথা তুললাম। একখানা ছোট ঘরের মধ্যে নজর পড়ল, ঘরে আসবাব পত্রের মধ্যে রয়েছে শুধু একখানা

খাট। আর সেই খাটে শুয়ে আছে গিডো—দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সে এক খানা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে। দেখলাম ও গায়ের কোট খুলে ফেলেছে এবং কাঁধ থেকে ঝোলান খাপে কোমর বন্ধের কাছে ওর পিস্তলটা গোঁজা।

তৃতীয় আলোকিত জানালার ঘরখানা প্রথম দু'খানার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। হামাগুড়ি দিয়ে ওই ঘরখানার দিকে যেতে যেতে ডক্টরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সে বলছিল দেখ বাপু তোমার ব্যাপারে ধৈর্য থাকতে বহু চেষ্টা করেছি। এবং দেখলাম ধৈর্য্যের পুরস্কার হিসাবে কৃতজ্ঞতা তোমার কাছে আশা করেছিলাম কিন্তু পেলাম শুধু অবাধ্যতা আর বিশ্বাসঘাতকতা। বলতে দুঃখ পাচ্ছি। আমার ধৈর্য্য ফুরিয়ে গেছে।

এখন আমি জানালার সোজাসুজি এসে পড়েছি। জানালাটা উন্মুক্ত। ডক্টর শাসাচ্ছে—তার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট। জানালার দিক পর্যন্ত মাথা তুললাম। আরও পাতলা সাদা পর্দা টাঙানো, কিছুটা গোটানো, পাতাল খড়ের মাকড়সার জালের মতন ঘরের মধ্যে ঝুলছে।

জানালার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে আমি খুব সহজেই ডক্টর ইমুরিস আর যুবতীকে চিনতে পারলাম। ঘরের কেন্দ্রের দিকে তাকানোর জন্য কোনও পর্দাই আমার দৃষ্টি ব্যহত করল না।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে লাগলাম, নজর পাতলাম স্বচ্ছ পর্দার মধ্যে ডক্টর তার কোটখানা খুলে ফেলেছে। স্কার্ফ আবার জড়িয়েছে—কিন্তু তবু দু'একটা আঁচিল বাইরে বেরিয়ে রয়েছে ওই রেশমি বাঁধনের আড়াল থেকে।

আগে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি পোষাক পরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীরব মূর্ত্তি, স্কুলের মেয়ের মতন হাত দু'খানা পিছন দিকে যেন অসদ আচরণ করার জন্য ধমকানি শুনছে···মাথা সামান্য আলত, আর উজ্জ্বল চুলের গোছা রঙচটা সবুজ ফিতে দিয়ে আগের মতন জড়ানো।

ডক্টর আওড়াল—দেখ, আশা করেছিলাম তুমি আমার কাজের প্রশংসা করবে। ভেবেছিলাম, তুমি স্বেচ্ছায় মেয়েমানুষ যে সম্পদ দান করতে পারে সেই সম্পদের ডালি নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসবে এবং আমার সুস্পষ্ট ও চিরন্তন আনুগত্যের মূল্য শোধ করবে। হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি বলছি ওটাই ছিল আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু বোধ হয় আমি বেশী

কামনা করেছিলাম। এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। এবং তাই জানি যে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় না দেয় তবে তা জোর করে আদায় করে নিতে হয়।

যুবতী সোজাসুজি ওর দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্ট উচ্চারণ করল—তুমি একটা নীচ।

ডক্টর ইন্নুরিসের মুখমণ্ডল রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে হাত উঠাল এবং তারপর নামিয়ে নিল।

বলল—আজ রাতে এই দ্বিতীয়বার তুমি তোমার ওই অসাধারণ সুন্দর মুখ পীড়নে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য আমাকে উত্তেজিত করেছ। কিন্তু আমার পীড়ন করা উচিত নয়, করব কি? আমি নীচ, হীন, হ্যাঁ, আমি তাই। আমার দেহ তোমার মনে করুণা জাগাতে পারেনি। অপরেও আমাকে তাই বলে।

যুবতী বলল—আমাকে ভুল বুঝ না তো ডক্টর। তোমার দেহের কথা আমি বলিনি। আর বলার অধিকার আমার নেই।

ডক্টর বলল—ও?

সে বলল—না।

তাহলে কি?

সে জবাব দিল—তোমার উপর আমার বিরক্তির কারণ তুমি একটা কথার অযোগ্য শয়তান।

ডক্টর শব্দ করে হাসল—একটা তীক্ষ্ণ খিল খিল হাসির আওয়াজ তার কুৎসিত শব্দ গলা থেকে বেরোল। বলল—শয়তান। শয়তানির কতটুকু তুমি জান যে, এত সহজে কথাটা বলে ফেললে। কিন্তু শীঘ্রই শয়তানির অনেক কিছু তুমি জানতে পারবে, আর আমি হব তোমার পথ প্রদর্শক, তোমার শিক্ষক, তোমার সঙ্গী।

যুবতী বলে উঠল—কখখোনো না।

ডক্টর ইন্নুরিস বলল—হ্যাঁ গো। ঠিক বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু করছি। এই এখানে। তোমার ঘরে। তোমার বিছানায়।

যুবতী ডক্টরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল।

ডক্টর মাথা নাড়ল। নরম গলায় বলল—না। ওতে তোমার কোন ভাল হবে না।

যুবতী ভয়ে পিছনে হঠে গেল।

আমি এবার এগিয়ে যেতে চাইলাম—সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ার আর তারপর পিছিয়ে ডক্টর ইন্নুরিসের মৃদু, জেদী, তেলতেলে কণ্ঠস্বর এবং

প্রতিরোধক্ষম ব্যবহারকে নীরব করে দেব। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিরব রইলাম এতক্ষণ ত ও কিছু করেনি—শুধু কথা বলছে! যুবতী ওর বাক্ চাতুরি সহ্য করতে পারবে। এবং আরও অপেক্ষা করলে অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে এই বিপদগামী লোক এর এবং যে সকল মুখ ও ত্রুটিবিহীন নারীর উপর সে উৎপীড়ন করে চলেছে তার সম্পর্কে আরও কিছু জানবার।

নিষ্ঠুর হাসিতে ওর মুখ ভরে গেল—দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে এল।

সে বলল—দেখ, এবার আমি তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। আমার পক্ষে যা দেওয়া অসম্ভ তা আমি তোমায় দিয়েছি। এখন তোমার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব তা কি তুমি আমাকে দেবে কিংবা আমি তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেবো?

যুবতীর রূঢ় কণ্ঠস্বর। বলল—তুমি আমাকে উপভোগ করতে পার ডক্টর কিন্তু তুমি জান এবং আমিও জানি যে কোনদিন তুমি আমার মন পাবে না।

ডক্টরের সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল দারুন রাগে তার চোয়াল বন্ধ হল ওর কপালে একটা শিরা ফুটে উঠল—যেন ওর মাংসহীন চামড়ার নীচে একটা নীলচে সারা বিলবিল করছে। যুবতীর কাছে এগিয়ে গেল, যুবতী শান্ত ভাবে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—যেন এই মুহূর্তে এখানে লোকটির অস্তিত্ব নেই।

অস্বাভাবিক লম্বা হাত বাড়িয়ে ডক্টর একটানে যুবতীর খোঁপা থেকে ফিতেটা খুলে নিল—গোলাপী চুলগুলো যুবতীর ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

রাগে ডক্টরের সারামুখ যেন জ্বলছিল—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাগ আরও তীব্র হয়ে উঠল এবং সবুজ কোমর বন্দী টেনে খুলে দিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিল। একটু থেমে নিজেকে সংযত করতে চাইলো। এবং নিজেকে সংযত করে এবার ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ওই যুবতীকে প্রচণ্ডভাবে গাল দিতে প্রস্তুত হল। আর যুবতী একই ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যেন ওই লোকটার অস্তিত্ব ওর কাছে একটা গুঞ্জন রত মস্তিকা ছাড়া আর কিছু নয়।

ডক্টর আবার এগিয়ে গেল। লম্বা হাতের বাঁকানো আঙুলগুলো দিয়ে ওর পোষাকের গলার কাছটা চেপে ধরল ইচ্ছে করেই যুবতীর দুই স্তনের মাঝখানের কামনা মাঝ উপত্যকায় মুঠো থামিয়ে রাখল।

ও কব্জি ঘোরাল এবং যুবতীর দেহ থেকে পোষাকটা ছিঁড়ে পড়ল। ও যখন তার দেহ থেকে পোষাক ছিঁড়ছিল যুবতী তখন ধীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এবং পোষাকটাকে পায়ের কাছে খসে পড়তে দিল।

এই উত্তেজিত লোলুপ দৃষ্টির আঘাত থেকে নিজের অনাবৃত স্তনদুটোকে ঢাকবার জন্যে যুবতী এতটুকু নড়ল না।

ওর হাত দু'খানা পাশেই ঝুলে রইল।

যুবতীর পরণে এখন শুধু সাদা প্যাসষ্টি আর মোজা।

ডক্টরের শ্বাস হওয়া হিস-হিস আওয়াজ হচ্ছিল সে বলল—এবার। এখন আমি ওর উপর নজর রেখেছিলাম আর আমার ভিতরে একটা দুরন্ত ইচ্ছা জাগছিল ওর সরীসৃপের মতন ঘাড়ে রক্ষা কষাবার জন্য এবং সে ইচ্ছা আমি অবহেলা করছিলাম। ঠিক তখন ও যুবতীর প্যান্ট টেনে খুলছিল তার সুমসৃন জঙ্ঘার উপর দিয়ে।

নিচোল ক্যারা সম্পর্কে হুবার্ট ঠিকই বলেছে—ও যদি নিচোল ক্যারা হয় তবে ও হবে স্বাভাবিকভাবে স্বর্ণকেশী।

বিছানাটা রয়েছে আমার ডানদিকে—এক কোণে দেওয়াল আর জানালার মাঝে। যুবতী নিথরভাবে দণ্ডায়মান আমার ডানদিকে এবং ডক্টর ইন্নুরিস রয়েছে বিছানাটা আর যুবতীর মাঝামাঝি।

হাঁটু গেড়ে বসে উত্তেজনায় তার শ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে সে তার প্যান্টি টেনে খুলছিল গোড়ালির কাছে। হুকুম করার আগেই যুবতী প্যান্টি খুলে সরে দাঁড়াল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডক্টর লোথার ইন্নুরিস এগিয়ে গেল, যুবতীর বাম হাতখানা চেপে ধরে তাকে বিছানার দিকে টানতে লাগল।

আমি যুবতীকে এক পা এগিয়ে যেতে দিলাম—তারপর আরও এক পা। পা ও জঙ্ঘার উপর অংশে কোনও তিল নেই। না, একটাও নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি জানলাটা খুলে ফেললাম এবং গোররাট পেরিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম।

ডক্টর ঘুরে আমার দিকে তাকাল।

যুবতী মেঝের উপর পড়ে থাকা তার পোষাকের দিকে পিছিয়ে গেল।

ডক্টরের গলায় জড়ানো স্কার্ফখানা খসে পড়ল—ওর সেই কুৎসিৎ ঘিনঘিনে আঁচিলগুলো বেরিয়ে পড়ল। আমাকে আমাদের ব্যবধান কমিয়ে আমার আগেই ও বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে ফেলল।

সে চেঁচিয়ে উঠল—গিডো! গিডো!

॥ ৭ ॥

চোখের কোন দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যুবতী তার দলা পাকানো পোষাকটা পায়ের কাছে তুলে নিয়ে নিজের লজ্জা স্থানগুলো চাপা দিল। আর আমার ঠিক সামনে ফাঁদে পড়া জানোয়ার মতন ডক্টর ইন্নুরিস ওৎ পেতে সময় গুনছে মারাত্মক গিডোর পৌছানোর অপেক্ষায়।

দরজা দিয়ে পালাবার জন্য ও একটু ব্যস্ত নয়। আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা বলে উঠল—লোকটা হয়ত অন্ধকার বারান্দারায় ছুটে পালাতে শঙ্কিত হচ্ছে কারণ ওর মাথা মোটা অনুচর হয়ত ওকে ভুল করে বাইশ ক্যালিবারের গুলিতে ফুঁড়ে ফেলবে। এবং আমিও মনে মনে ছবি এঁকে নিলাম ওই গুজামাধব তার বিছানা ছেড়ে উঠেছে বগলের নীচে থেকে স্বয়ংক্রিয় ট্রেজো পিস্তলটা হাতে নিয়ে যুবতীর ঘরের দিকে নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে আসছে।

দাঁড়ির মধ্যে কোনঠাসা মুষ্টিযোদ্ধার মতন ডক্টর ইন্নুরিস দু'হাত সামনে বাড়িয়ে একমাত্র দেওয়ালের এপাশে ওপাশে দুলছে।

সময় আর বেশি নেই। ডক্টর এমন একটা ভাব করছিল যেন সবরকম দৈহিক উৎপীড়ন করার সে অধিকারী কিন্তু এই করে সে আর গিডো তা পেরে উঠল না। লড়াইতে তার যোগদানের ফলে সে শুধু সংখ্যাই বাড়াবে।

আমি আমার বাম কাঁধ আর বাম হাতে প্রচণ্ড আঘাত করলাম ও সহ্য করতে পারলাম। হেলে পরল আমার ডান দিকে। আমি আবার ঘুঁষি চালালাম দারুণ আঘাত করলাম ওর চোয়ালে—সোজা আছড়ে দেওয়ালের গায়ে। দু'চোখে গোল গোল হয়ে লাফিয়ে উঠবার আগে—তারপর চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল জলরক্তের ধারা নামল ওর গোলাপী ঠোঁট জোড়ার কষ বেয়ে।

ওর এই অবস্থা দেখে মজা লুঠবার সময় আমার ছিল না।

ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল দরজাটা সজোরে খুলে গেল।

গিডো দাঁড়িয়েছিল ওখানটায়। ওর হাতের ট্রেজো তাক করে ছিল আমার দিকে।

সে হুঙ্কার ছাড়ল—দাঁড়াও।

দু'হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ভেবে দেখলাম উৎপীড়িত যুবতীর

রক্ষাকারী নিকোলাস এ্যাণ্ডারসনের এই মুহূর্তে গিডোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও বিশেষ কারন নেই। একেবারে প্রয়োজনের অস্তিত্ব নেই।

অকাম্পত পিস্তলের নল। তখনও ডক্টর চেতনাহীন। গিডো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল— তুই একাজ করেছিস। আমার বোঝা উচিৎ ছিল এমনটা ঘটবে কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস হয় না যে। তার মানে আমাকেই ফ্যাঁসাদে ফেললি এটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তখনই তোকে বলেছিলাম, কেটে পড়। ছোকরা। এবার তোকে নির্ঘাত আপসোস করতে হবে।

গিডোর স্তেনদৃষ্টি যুবতীর উপর পড়ল এবং বিস্মিত হল। ধমক দিল—এই পোষাক পরে নে। ব্যাঙকে ডাক। বল, ডক্টরকে সাহায্য করা দরকার। আর দেখ কোন লেখা দেখাতে যাস নি।

যুবতী আমাদের দিকে পিছন ফিরে খাটের নীচ থেকে একটা সুটকেশ টেনে নিল। বেছে নিল কিন্তু পোষাক—তারপর পরতে লাগল।

আমাকে বলল গিডো—এই দেওয়ালে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত তোল।

তাই করলাম। গিডো নিয়মমত আমার দেহ হাতড়াল। বোধহয় ও এমনভাবে বহুবার লোকের দেহ হাতড়েছে তাই ও এসব কিছু জানে। ওর ধারণা ছিল যে পিস্তল ছাড়া কিংবা ছোটখাট একটা বোমা ওর ভাগ্যে জুটে যাবে এবং সেটা আমার পকেটেই থাকবে কিন্তু সেগুলোর বদলে যে তিনখানা ক্ষুর থাকবে তা ওর অজানা। তাছাড়া গিডোর ত চিন্তা করার কথা নয়।

তাই ও বলল—না তুই একদম নির্ভেজাল। ঘুরে দাঁড়া মাথার পিছনে হাত রাখ এবং যতক্ষণ না বলি অমনি করে থাক।

ঘরের বাইরে থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল। যুবতী ফিরে এল—সঙ্গে চীনেম্যানটি তার হাতে একখানা তোয়ালে আর এক গামলা জল। এই সর্বপ্রথম আমি ওর হাত জোড়া দেখলাম। প্রত্যেকটা আঙুলের নখ পাঁচ ইঞ্চিও লম্বা ছোরার মতন বড় বড়।

গিডো বলল—ডক্টরকে ছাখ চ্যাঙ।

চীনেম্যান ঘাড় নাড়ল।

গিডো যুবতীকে ধমক দিল—এই স্কেচ কারী, এখান থেকে ভাগ্। বেশী চালাকি করিস না। তোর অনেক খেল দেখেছি। আমার সাথে লাগতে এলে তোদের দুটোকেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব, নিকেশ করে ফেলব।

চীনেম্যানটা ডক্টর ইমুরিসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখে ভিজে তোয়ালে

চেপে ধরছিল। ডক্টর কাতরাল—তার মাথাটা কুৎসিৎ ঘাড়ের উপর লটপট করছিল। দৃষ্টি মেলে তাকাল। চীনেম্যান আরও জলের ঝাপটা দিল। ডক্টর শেষে ওকে এক পাশে হটিয়ে দিল ওর লম্বা নখের খোঁচা লাগাবার ভয়ে।

বলল—আমাকে ধরে তোল চ্যাঙ।

ওর দু'বগলে হাত দিয়ে চীনেম্যান ওকে টেনে তুলে পায়ের উপর খাড়া করে দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ডক্টর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল —চ্যাঙ, আমাকে ব্র্যাণ্ডি এনে দে।

চীনেম্যান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এল একটা গ্লাস নিয়ে। পান করার আগে ডক্টর গ্লাসের মধ্যে নাক ডুবিয়ে মদের গন্ধের শ্বাস নিল। অন্য হাতে তোয়ালের উপর হাত চুকিয়ে ক্ষতস্থান পরখ করল।

তারপর বেশ কষ্ট করে হেসে আমাকে বলল—না, সত্যিকারের কোনও ক্ষত হয়নি, মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন। অন্ততঃ আমার হয়নি। আর তোমার কথা ধরলে, একেবারে ভিন্ন ফল ফলেছে।

বললাম— দেখ।

গিডো আমাকে বাধা দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল—চুপ!

একটা ইয়াপিপ কুকুরকে যেন সহবত শেখাচ্ছে এমনিভাবে হাত নেড়ে ডক্টর ইন্দুরিস বলল—যথেষ্ট হয়েছে গিডো, চুপ কর।

গিডো তার দিকে কটমট করে তাকাল। এটা পরিস্কার যে, ওদের সম্পর্কের মূল স্নেহের মাটিতে প্রোথিত নয়। আমার ও যুবতীর উপর নজর রাখার সময় দরকার বুঝলে ডক্টর ইন্দুরিসের দিকেও পিস্তলের নল ঘোরাতে গিডো সমান খুশি হবে।

দেখ মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন এখন তোমার আমায় মধ্যে একটা শেষ বোঝাপড়া করার সময় এসেছে। আমি ত নেগ্রেস্কো হোটেলে তোমাকে আগেই বলেছি যে মেয়েটির উপর তুমি এত ভীষণ অনুরক্ত হয়েছো সে কিন্তু একজন রুগ্না যুবতী। এবং এখানে তোমার উপস্থিতি তার রোগ জটিল এবং বর্ধিত করেছে। যে নাটকীয় পদ্ধতিতে তুমি যুবতীর প্রতি তোমার অনুরক্তির ছাপ আমার দেহে অত্যন্ত যন্ত্রণার মাধ্যমে এঁকেদিয়েছো তা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না, কেননা সত্যিকারের কোনও ক্ষতি আমার হয় নি। কিন্তু তুমি ত জান, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এবং যখন কোনও রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমি গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকি তখন কোনও রকম বাধা সহ্য করি না।

বললাম—দেখ ডক্টর, এই ঘরে যদি কেউ সত্যিকারের রোগী থেকে থাকে তবে সে তুমি।

আর একবার দেখলাম, সদাশয় চিকিৎসক ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা এবং মনের ভিতরকার জলন্ত বিকৃত রোগের প্রকার রোধ করার জন্য ওর প্রচেষ্টায় ভয়ানক শক্তি।

ওর সারা দেহে কাঁপন জেগেছে। ও আর এক চুমুক মদ পান করল। মদ গিলবার সময় গ্লাসের তরল পদার্থের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ও বুঝতে সুরু করেছিল যে, আমি যতটুকু দেখেছি ও শুনেছি বলে ও সন্দেহ করছিল আমি তার চেয়েও বেশি শুনেছি এবং জেনেছি। ওর বোকার মতন হাসি দেখে ও বলল মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন, ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার ঘটে থাকে—অশিক্ষিত দর্শকের কাছে আমার সেই প্রয়োগ কেমন মনে হতে পারে? —অর্ধ-অসভ্যতা। আপনার মতন অপেশাদার লোকের কাছে ও দৃশ্য একটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে তবে আমার সহকর্মীদের কাছে তর্ক সঙ্গে সঙ্গে বোধগম্য হবে।

বললাম—সংক্ষেপে স্যার, ডক্টর ও সব কথায় আমি ভুলব না। এবং যদি মনে করে থাক ভুলব তবে তুমি একটা পাগল। আমি সন্দেহ করতে সুরু করেছি তুমি একটা ঘোর উন্মাদ। তোমার পেশার পক্ষে একটা কলঙ্ক।

ডকটর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে তার ফেনায়িত মদের গ্লাসে নাক ঢুকিয়ে গভীর শ্বাস নিল।

সে দুঃখের হাসি হেসে বলল—খুব খারাপ, সত্যিই খুব খারাপ লাগছে তোমার কাছে। তুমি একটা আহামক মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন। তখন যদি তুমি আমার কথা শুনতে তাহলে এতক্ষন হোটেলের আনন্দমন পরিবেশে ডুবে থাকতে পারতে। তার বদলে তোমার পাগলামি আমার মতলবে তোমাকে মাথা গলাতে বাধ্য করল এবং মশাই এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

বললাম—দেখ সে দুর্ভাগ্য তোমার। আমার মনে হয় যে যুবতীর নয়। কগন্যাকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ডক্টর বলতে লাগল—বীরত্ব দেখতে আমার হাসি পায়, মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন। বোধহয় আপনার অনেক দেশবাসীর মতন আপনার অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমী চলচ্চিত্রের মধ্যেই প্রোথিত মূল। আলি কিন্তু ঘটনার উপর আস্থাশীল। এবং আশা করি আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে। কেননা অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি জেনেছি যে, ভীরুদের চেয়ে বীরেরা আকস্মিক মৃত্যুর

চিৎকার হয় বেশী। এবং আমি নিশ্চিত যে, তারা এবং তাদের পরিচালকরা এটা একেবারেই চায় না। কিন্তু দর্শনের কথা অনেক বলেছি। এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে, এর দ্বারা তুমি তোমার অথবা ওই যুবতীর বিশেষ কোন কাজ করনি। এবং আমার কাছে একমাত্র সামান্য বাধা ছাড়া আর কোনও দামই নেই মিষ্টার এ্যাণ্ডারসন।

বললাম—দেখা যাবে ডক্টর।

সে বলল—সত্যি। এবং এখুনি তোমায় তা দেখাচ্ছি।

তারপর হাতের মদের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ডক্টর বলল—চ্যাঙ সব জিনিষপত্র গুছিয়ে গাড়ীতে তোল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এখান থেকে সরে পড়ব।

আমার দিকে এবার তাকাল। বলতে লাগল—মিঃ এ্যাণ্ডারসন, বুঝতে পারছি তুমি আমাকে বেশ কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছ। এ জায়গা আমাকে ছাড়তেই হবে। অল্পক্ষনের মধ্যেই গিডো চ্যাঙ আমি এবং যে যুবতীর ভালর জন্য তুমি মাথা ঘামাচ্ছিলে সে এখান থেকে চলে যাবে। আমরা একটা নতুন ডেরায় চলে যাব সেখানে তোমার মতন ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা থাকবে না। ওর পাতলা কাল ঠোঁট জোড়ার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে পড়ল এবং তার দু'চোখের দৃষ্টি আছড়ে পড়ল যুবতীর উপর—এবং ঘটনা তখন অব্যাহত পরিনামের দিকে এগিয়ে যাবে।

গিডো তখন আমার দিকে তাক করা পিস্তলটা বাঁকিয়ে বলল—আর সেই আদমিটার কি হবে?

ডক্টর জবাব দিল—আঃ গিডো ধৈর্য ধর সময় এলে সব বলব মিঃ এ্যাণ্ডারসন। তুই ইতিমধ্যে ওকে পাতাল ঘরের মধ্যে কোথাও বেঁধে রাখ আর যেন পালাতে না পারে। তোর সঙ্গে চ্যাঙও যাবে। তারপর চ্যাঙের সব গোছগাছ হলে আর তোরা দুজনে মালপত্র সব গাড়ীতে গেলে দেখব কি করতে পারি যাতে এই যুবতীর সঙ্গে বিচ্ছেদের জ্বালা মিষ্টার এ্যাণ্ডারসনের পক্ষে সহনীয় হয়।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করে গিডো আমাকে বলল—চল হে।

বারান্দায় চ্যাঙ আমাকে সঙ্গ নিল। ওদের দল অনভিজ্ঞ নয়। আমার দিকে নজর রেখে একটু দূরে চ্যাঙ পিছু হাঁটছিল—যেন আমার নাগালের বাইরে থাকাই তার ইচ্ছা। আর গিডো আমার বেশ কিছুটা দূরে থেকে অনুসরন

করছিল—যাতে সহসা আমি পিস্তলটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারি।

বারান্দার শেষে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি পাতলা করে নেমেছে। নীচে একখানা খুব ছোট ঘরে আমরা পৌঁছলাম। নাই একখানা চেয়ার এবং চুনকাম করা একখানা টেবিলের উপর ছাদে আঁটা একটা আলো—ঢাকনাহীন বালবটা হোলডারে শুধু আটকানো। মৃদু আলোর শিখায় একখানা সুন্দরভাবে ভাঁজ করা সংবাদপত্র টেবিলের উপর নজর পড়ল।

টেবিলের নীচে সুন্দরভাবে জড়ানো এক বাণ্ডিল আমকোড়া দড়ি—যেন এই মুহূর্তে কাজে লাগবে বলেই রাখা হয়েছে।

গিডো বলল—বস।

লোকটা বেশ কাজের। এক মিনিটের মধ্যে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে আমার হাত দুখানা এবং চেয়ারের পায়ার সঙ্গে আমার পা দু'খানা বেঁধে ফেলল।

বলল—চ্যাঙ এবার তুই যা।

চীনেম্যানটা নীরবে ঈষৎ মাথা নুইয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি বয়ে উঠে গেল।

গিডো বলল—ওকে পাঠিয়ে দিলাম তোকে একটা খবর বলব বলে।

বললাম—ও। তাই।

আমার চোয়ালের নীচে পিস্তলের নল দিয়ে ঠেলা মেরে মাথাটা পিছনে সরিয়ে নিতে বাধ্য করল গিডো। তার পর বলতে লাগল—দেখ ছোকরা ডক্টর ভাবছে তুই একটা তামসা। তোকে দেখলে তার হাসি পায়। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আজ রাতে তাই আমাকে অনেক জালিয়েছিস। এবং আমার তা অপছন্দ। তাই একটা কথা বলছি শোন। ডক্টর হয়ত তোকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু আমি তা চাই না। ইন্সুরিস যাই বলুক যাওয়ার এক ফাঁকে ওখানে এসে তোকে আমি খুন করে যাব। ডক্টর হয়ত সাময়িক ভাবে এর জন্যে আমার উপর খুব খুশি নয়। দু' এক ঘণ্টা পরে ডক্টর সব কিছু ক্ষমা করে নেবে। তাহলে তুই মরবি আমি খুশী হব।

ভাবলুম এই বানরটাকে একটু লোভ দেখান যাক। তাই বললাম দেখ গিডো আমার কাছে অনেক টাকা আছে তোমায় দিতে পারি।

লোকটা বলল—পার ব্যস্। ওরা যখন কাকুতি মিনতি করে খুব ভাল লাগে।

বললাম—তুমি খুব ধনি হয়ে যাবে যদি আমাকে ছেড়ে দাও।

পিস্তলটাকে সজোরে চেপে ধরে ও ঝুঁকল। ফিশ ফিশ করে বলল—দেখ তোকে একটা কথা বলি। তুই নির্ঘাত মরবি ছোকরা। তারপর পিস্তল নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হল। চাবি লাগাবার আওয়াজ শুনলাম।

এবং আমি আমার কোমরবন্ধের মধ্যে আঙুল ঢোকালাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লুকোনো জায়গা থেকে ক্ষুরখানা টেনে বার করে হাতের বাঁধনের উপর ঘষতে লাগলাম। গিডো খুশী মতন কাজ করতে পারে নিকোলাস এ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে। কিন্তু নিক কার্টার একদম ভিন্ন ধাতুর তৈরী।

সমস্ত বাঁধন কাটতে আমার তিরিশ সেকেণ্ড সময় লাগল।

কাঠের রেলিংয়ের উপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম। কাগজের কলেবর বেশ ভারী আর বড়। কাগজখানা মাঝখান থেকে খুলে একবার ভাঁজ করলাম। একটা ঠোঙাকে যেন আধাআধি ভাঁজ করা হল। হাতল সহ একখানা থালি হল। মাথার দিকটা পাথরের মতন শক্ত। এটা সস্তায় হাতিয়ার তবে সাঘাতিক মারাত্মক।

টুকরো টুকরো দড়ি দিয়ে পা দু'খানা চেয়ারের পায়ের সঙ্গে আলতো ভাবে জড়িয়ে রাখলাম। খবরের কাগজের তৈরী লাঠিখানা নিয়ে মাই-পিঠ চেয়ারের পিছনে হাত দুখানা রাখলাম।

বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না।

সিঁড়ি দিয়ে নামার পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। তারপরই চাবি খোলার শব্দ।

গিডো—লালচে মুখ—সজোরে দরজাটা দু'হাট করল। বলল—বেজন্মা শালা বলছে চ্যাঙ তোকে খুন করবে। শালা আমাকে শাস্তি দিতে চায়। দাঁড়া ওদের দু'টোকেই মজা দেখাচ্ছি। ও যখন তৈরী হবে তুই তখন একটা মড়া।

বললাম—অমন কাজ করো না, গিডো।

পিস্তল উঁচিয়ে আমার আরও কাছে ধমক দিল—নে, নে, ঈশ্বরের নাম কর—। আমি হ্যাঁ করলাম, ঈশ্বর—যেন ওকে শোনাবার জন্যে কিছু বলছি। এবং পরক্ষণেই হাত ঘুরিয়ে লাঠিখানা দিয়ে ওর পিস্তল ধরা হাতের নীচে সজোরে আঘাত হানলাম—পিস্তলটা ছিটকে ওর মাথা টপকে ও পাশে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

গিডোর দু'চোখ বিস্ফারিত হল। আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য কুঁকড়ে গেল

এবং থেঁৎলানো বাহু ঘষতে লাগল। পিস্তলটার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। নীরবে ফুসফুস কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলছিল কারন ওর মূত্রগ্রন্থিতে আঘাত লেগেছিল।

বারেকের জন্যও ওর কুতকুতে দুটো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখের ওপর থেকে সরে যায় নি।

ও যত পিছোচ্ছিল আমি তত এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ও আর হাত থেৎলানো বাহুতে কুলোচ্ছিল না। পিছনে হাত দিয়ে পিস্তলটা ধরবার চেষ্টা করছিল।

সহসা ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল পিস্তলটা তুলে নেওয়ার জন্য। হাতখানা পুরোপুরি বাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম, তারপর ওর কনুইয়ের উপর লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলাম।

হাত ভেঙ্গে গেল ও জানোয়ারের কণ্ঠে কাতরাতে লাগল।

উপরতলার কোথাও থেকে ডক্টর ইমুরিসের কণ্ঠস্বরে ভেসে এল। সে ডাক ছিল। গিডো এই গিডো, কোথায় তুই ?

অন্ধকার পাতাল ঘরে গিডো এখন কোনঠাসা হয়ে পড়েছে—যন্ত্রনায় মুখের পেশীগুলো কুঁচকে যাচ্ছে। যখন হাতখানা বাড়িয়ে পিস্তলটা ধরতে চাইছে, বাঁচবার ওটাই একমাত্র পথ। ওর হাতের আঙ্গুলগুলো পিস্তলের বাঁট খুঁড়েছে—এবং ঠিক আমি পিছন থেকে হাত ঘুরিয়ে ওর নাকের গোড়াটা লক্ষ্য করে লাঠির আঘাত করলাম। নাকটা গেল থেঁৎলে—এবং হাড়ের টুকরো ভেঙ্গে ওর খুনের নেশাগ্রস্ত মস্তিস্কে ঢুকল।

ওর রক্তাক্ত মুখ থেকে কানফাটানো যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার বেরিয়ে এল। এবং তারপর একটু পিছিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল—এবং ওর নিশ্চল দেহ লুটিয়ে পড়ল।

হাঁটু গেড়ে বসে বাম হাতে লাঠিখানা ধরে ডানহাত বাড়িয়ে দিলাম পিস্তলটার দিকে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম কালো পোশাকে মোড়া একটা শীর্ণ দেহ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দু'খানা সোজাসুজি সামনে বাড়ানো—আর ওর চারখানা ছোরার মতন লম্বা নখ থেকে কাল তরল পদার্থ ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে।

সে সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়াল এবং সেই প্রথম আমি চ্যাঙকে কথা বলতে শুনলাম। যেন সমাধি ক্ষেত্রের অশরীরি কথা বলছে এবং আর দুটো কথা

আমার ধমনীর রক্ত হিম করে তুলল। ল্যাকেট্রা ডেকটস। ও আওড়াচ্ছিল কথা দুটো।

ওর অর্থ আমার জানা—তাই ওর নখ থেকে কি ঝরছে তাও বুঝতে পারলাম।

কাল বিষবা মাকড়সার জমানো থকথকে বিষ।

॥ ৮ ॥

এবং এখন সবটাই আমার কাছে পরিস্কার। আর ভুল করার ফাঁক নেই। হয় দ্রুত এবং নিখুঁত ভাবে আমি চ্যাণ্ডকে খতম করব—আর না হয় ও আমার কাছে এগিয়ে আসবে এবং ভয়ানক বিষ-মাখানো নখ আমার দেহের মাংসে ফুটিয়ে দেবে—পৃথিবীর কোনও জীবই এমন বিষ ধারন করে না। এমন কি প্রেইরির ভীষণ র‍্যাটলস্নেকের চেয়েও এই বিষ পনের গুন শক্তিশালী। কিন্তু মৃত্যু—যদি সেই মৃত্যু জীবনের সান্ত্বনা হয় তবে হাজারো মাকড়সার দেহ থেকে নিঃসৃত বিষের সমান এই থকথকে অনিল বস্তু অনেক দ্রুত ফল দেবে—আর সেই বিষই ওর ছোরার মতন নখগুলো থেকে ঝরে পড়ছিল।

ও আমার দিকে এমন ভাবে এগিয়ে আসছিল যেন আমি নিরস্ত্র—পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নামছিল। আর ওর পিছনে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল ডক্টর ইসুরিস—তার নজর নীচের দিকে, মুখে খুশির হাসি। ডক্টর ইসুরিস হাত নেড়ে বিদায় জানাল—যেন এক জোড়া পিংপং খেলোয়াড় বিদায় নিচ্ছে। তার পর ওখান থেকে সরে গেল।

ঘরের মাঝামাঝি সরে এলাম, চুনকাম করা চৌকো টেবিলখানা এখন আমার আর আগুয়ান চ্যাণ্ডের জন্য রয়েছে।

ওর মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন নিথর শ্বাস-প্রশ্বাসের উঠানামা—কালো চোখ দুটো নিস্তেজ।

দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। এখন আর শৌখিন লড়াইয়ের সময় নেই।

আমার হাতে রয়েছে গিভোর পিস্তল ট্রেজো মডেল। ট্রিগার টিপার পর গুলি ছোটে।

আমি ট্রিগার টিপলে পর পর আট-আটটা গুলি ছুটবে—আর আমি চাই সব কটা গুলি চ্যাণ্ডের বুকে লাগুক। কিন্তু যদি মাথা তাক করে গুলি ছুঁড়ি তাহলে গোটা কতক গুলি পিস্তলের ঝাঁকানির জন্যে বাইরে ছুটে যাবে।

ঘরের বাইরে ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াল চ্যাণ্ড—ছায়াতে দাঁড়ানোর জন্য ওর শীর্ণ মুখমণ্ডল অদৃশ্য ছিল। এবং তারপর কাল হাতায় ঢাকা ওর লুকানো হাত দু'খানা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল—যেন মৃত্যু গীতিনাট্যের একটা দৃশ্যের মতন মোহাচ্ছন্ন করতে চাইছে—এবং এম'নভাবে সে দরজা পার হল।

আমি দু'হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলাম। ধীরে ধীরে, সর্পিল গতিতে সেই শোকবহ হাত দু'খানা বিশাল বানমাছের মতন এগিয়ে আসছিল—এবং মাঝে মাঝে তার একটা নখ থেকে বিষের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল মেঝের ওপর।

আমার মুঠোতে পিস্তলটা কাঁপছিল, কিন্তু গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছাটা সংযত করলাম। আমি চাইছিলাম চ্যাণ্ড ঘরের ভিতরে আলোতে আসুক।

অপেক্ষা করার উত্তেজনায় অস্থির পেশীসমূহ—আমি পেশীসমূহকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য সাবধানে পিস্তলটা নামালাম।

এবং ঠিক তখনি চ্যাণ্ড ঘরের মধ্যে ঢুকল।

দু'হাতে গুলি ছোঁড়ার আর সময় নেই। সময় নেই··তাক্ করে গুলি ছোঁড়ার।

পিস্তলটা উঁচিয়ে ট্রিগার টিপলাম।

একটা বিস্ফোরণ ঘটল—কিন্তু তা'হল সম্পূর্ণ নীরবতা।

গিডোর মূল্যবান মরণ হাতিয়ার আটকে গেছে।

চ্যাণ্ড টেবিলের ওপাশে এসে দাঁড়াল, ওর আঙুলগুলো আমার চোখকে বলে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। ঈষৎ মাথা নীচু করে আমি কাগজের লাঠিখানা চালালাম—কিন্তু ও হাত দুখানা সরিয়ে নিয়েছিল, তাই শুধু বাতাস কাটল।

ও এবার টেবিল ঘুরে আসতে লাগল। ও এগিয়ে আসছিল—এবং আমিও দু'জনের মধ্যে সমান ব্যবধান করে যাচ্ছিলাম।

মাঝে মাঝে ওই থকথকে তৈলাক্ত জীবাণু-মিশ্রিত বস্তুটা এক দলা ধুলোর মতন ওর আঙুল থেকে ঝরে পড়ছিল—আর অন্বেষণ করছিল আমার চোখ দুটো। আমি আমার পকেটে পিস্তলটা গুঁজে রাখলাম—আমার হাতের

লাঠিখানাও চালাচ্ছিলাম, কিন্তু বাতাস ছাড়া আর কিছুই নাগালে পাচ্ছিলাম না।

চ্যাঙ প্রতি আউন্স ঘন বিষ কোন দিকে ছড়াচ্ছে এবং কি তীব্র তার শক্তি ও কত মারাত্মক তাই দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং কি মোহাচ্ছন্ন প্রক্রিয়া সে সৃষ্টি করছে—জানি এমনিভাবে প্রাচীন যুগে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করা হত এবং তার পরিণাম হত মৃত্যু। মাঝে মাঝে প্রক্রিয়ার বদলে নতুন পুষ্টি করছিল। অঙ্গীনমুখী নখগুলো এগিয়ে আসছিল আবার পরমুহূর্তে হাতগুলো দূরে সরে যাচ্ছিল। কাজেই ওই বলে মূর্তির পদক্ষেপ ও চলাচলের উপর নজর রাখার জন্য আরও আরও তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। এক মুহূর্তের অসাবধানতার ফল হবে তীক্ষ্ণ নখের মাংস পেশীতে প্রবেশ-জনিত যন্ত্রণা—এবং তারপর তীব্র যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটবে মৃত্যুর মধ্যে।

অবশ্য যদি না চ্যাঙের প্রথম মৃত্যু হয়।

আমার লাঠি দিয়ে ওর চোয়ালে আঘাত হানলাম, এবং যখন ও মাথা সরিয়ে নিচ্ছিল ঠিক তখনই বাম হাতের চাপে টেবিলটা ওর পেটে চেপে ঠেসে ধরলাম—ও হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে গেল—উল্টে পড়ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যে দেহের ভার-সাম্য ঠিক করে নিয়ে আবার আক্রমণ শানাল।

আমি টেবিলখানাকে ঠেলে নিয়ে ওর দিকে এগোলাম।

চ্যাঙ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সহসা ও তার বামহাত আমার চোখ তাক করে বাড়িয়ে দিল। বড় দেরী হয়ে গেছে, আমি মাথা সরিয়ে নিলাম—কারণ জানি এটা আক্রমণের একটা ভান। ওর ডান হাতের নখে বিষ-মাখানো—ও সেই হাত তাক করে রেখেছে আমার উল্টানো হাড়ের শিরায় নখ ফুটিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমি এই হাতের চাপে টেবিলখানা সরাচ্ছিলাম।

শেষ মুহূর্তে চ্যাঙকে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়তে দেখে আমি টেবিলখানা টান দিয়ে পিছিয়ে আনলাম। চ্যাঙ দেরী করে ফেলেছিল—ওর নখহীন আঙুল-গুলো পিছলে যাওয়ায় তর্জনীর লম্বা নখ টেবিলে গেঁথে ভেঙ্গে গেল। আমি ডানহাতে লাঠি দিয়ে ওর মাথায় মারলাম। ও একটু ডানদিকে সরে নীচু হয়ে আমার আঘাত এড়াতে চাইল কিন্তু মুহূর্তমধ্যে টেবিলটা ঠেলে ওর দেহে

প্রচণ্ড আঘাত হানলাম। পুরস্কারও পেলাম। বিস্মিত চ্যাঙের মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে এল।

চার ইঞ্চি লম্বা নখ টেবিলে গেঁথে তিরতির করে কাঁপছে।

আবার টেবিলখানা ওর দিকে সজোরে ঠেলে দিলাম। চ্যাঙ আর ঠকতে রাজি নয়। টেবিলখানা তার মতলব হাসিল করতে দিচ্ছে না। ও বামহাতে আমার মুখ আর চোখে আঁচড়াতে চাইছে এবং ডান হাতে আঁকড়ে রেখেছে টেবিলখানা—ও আমার শক্ত হাত থেকে টেবিলখানা সরাতে চায়। আমাদের মধ্যে রয়েছে চুনকাম করা টেবিলখানা—আর নরম কাঠে গেঁথে রয়েছে চার ইঞ্চি লম্বা নখটা যেন একটা ছোট তীর। আর সেই মুখে মাখানো ভয়ানক মারাত্মক বিষ।

ঈষৎ নীচু হয়ে চ্যাঙের বামহাতের আঘাত এড়িয়ে গেলাম। তারপর ওর টেবিল ধরা ডান হাতের উপর প্রচণ্ড আঘাত করলাম। চ্যাঙ পিছিয়ে গেল ওর দু'চোখে দারুন উত্তেজনা।

এক মুহূর্তের অসাবধানতার জন্য ও কি দেখেছে তা' আমি জানি। টেবিল ঠেলবার সময় আমি যখন নীচু হয়েছিলাম তখন আমার ঘাড় আর পিঠ ছিল ফাঁকা ওর বামহাতের আক্রমনের মুখে একদম প্রতিরোধহীন।

ও যদি সে সময় টেবিলের নীচটা ধরে নিজের জায়গায় খাড়া থাকতে পারতো তবে ডানহাতের কব্জিতে মোচড় খাওয়া যন্ত্রণা সহ্য করেও বাম হাতের নখগুলো আমার ঘাড়ে বসিয়ে দিত।

আমি ওকে একবার এই লোভ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আর ও লোভ দেখাবার আমার ইচ্ছা নেই কিন্তু চ্যাঙ ভাবছিল হয় ত আবার আমি অসাবধান হব। আবার টেবিলখানা ওর দিকে ঠেলতে লাগলাম—ঘোরাতে লাগলাম হাতের লাঠিখানা এবং টেবিলখানা নাগালের মধ্যে পেয়েই চ্যাঙ উৎসুকভাবে ডানহাতে টেবিলের ধার চেপে ধরল। আমরা দু' জনে এখন টেবিলের দু পাশে নিজের নিজের জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছি—এবার দুজনের মধ্যে টাগ্ অফ ওয়ার। ওর বাম হাতে আমার মাথার কাছে ঘুরছে—আর ওর এই অবিরাম আক্রমণের মুখে আমি নিজেকে রক্ষা করছি।

সহসা আমি চকিতে হাঁটু গেড়ে বসে টেবিলটা নীচে থেকে উঁচু করে ধরলাম।

চ্যাঙের ডান হাতের দ্বিতীয় লম্বা নখটা এবার ভেঙ্গে নীচে মেঝেতে পড়ে গেল।

ওর মনে বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং এই প্রথম ওর দুচোখে আমি ভয়ের ছাপ দেখলাম। ওর ডানহাতের অস্ত্রগুলো এখন একদম ভোঁতা!

আমি আবার টেবিলখানা চেপে ধরলাম। ওর বাম হাত সামনে বাড়ানো —ও খুব জোরে টেবিলের নীচের দিকটা আঁকড়ে ধরল। আমরা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলাম—ঠিক যেন দুজনে ডুয়েল লড়ছি একটুকরো রুমালের মতন জমিনের ওপর—সামান্য নড়াচড়া করা যায় এবং মৃত্যু একেবারে সামনে।

চ্যাঙের মারাত্মক বিষ মাখানো নখগুলোর নাগালে এগিয়ে গিয়ে এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে হাতের লাঠির এক আঘাতে ওর মুখ ছিন্নভিন্ন করার লোভ আমি সামলে নিলাম।

ধীরে ধীরে অনুকুল হাওয়া আমার দিকে বইছিল। বিষের ছোরাগুলোর অর্ধেক এখন অবশিষ্ট। এখন আরও কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারি।: এখন চ্যাঙই প্রথম টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বর্শার মতন ওর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। লাঠি ফেলে দুহাতে ওর কব্জি চেপে ধরলাম—এবং ওর আঙুলজোড়ার নখ ঘুরিয়ে আমার হাতের সংগে নখ ফোটাবার চেষ্টা করছিল। ওর ক্লান্ত দেহ সোজা টেবিলের ওপর—মুখ নীচের দিকে। এক হাতে ওর কব্জি ধরে আর এক হাতের চাপ ওর ঘাড়ে রেখে আমি মোচড় দিলাম। আমার দেহের চাপ আর প্রচণ্ড মোচড়ে ও ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে গেল। নীরব যন্ত্রণা কাতর ছবি ওর মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চাপ ছেড়ে দিতেই চ্যাঙের হাতখানা টেবিলের ধারে আছড়ে পড়ল অসহায় ভাবে। চ্যাঙ অমনিভাবে পড়ে হাঁফাতে লাগল—তার চোখ জোড়া যন্ত্রনার আর ঘৃণায় জ্বল জ্বল করছিল।

একটু পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একই সময় আমাদের দু' জনেরই নজরে পড়ল—ভাঙা নখটা তখনও টেবিলে গেঁথে রয়েছে—জানি, তখন হাতের যন্ত্রনা অবহেলা করেও চ্যাঙ ওই হাতাস্তে চায় চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্যে।

আহত ডান হাতের চাপ দিয়ে ও সোজা হয়ে উঠল—আমি ওর বামদিকে একটু সরে গেলাম—এবং সোজাসুজি হাত পুরিয়ে ক্যারেড প্রথায় ওর ঘাড়ে ঘুষি মারলাম—টেবিলের উপর ওর মুখখানা ঠুকে গেল।

ভয়ঙ্কর ভাবে আর্ত চিৎকার করে উঠল লোকটা—এবং সে সোজা হতেই

মনে হল একটা কাল বিষধর বোড়ো সাপ টেবিলের উপর মাথা তুলছে। এবং দেখলাম, মৃত্যু ওকে কি ভয়ানকভাবে আঘাত হেনেছে।

ভাঙা নখের টুকরোটা ওর ডান চোখে বিঁধে আছে।

ওর সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল—এবং তখনও আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছিল। দেহ ওর কুঁকড়ে গেল—এবং একসময় টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মৃত্যু দেখবার সময় ছিল না—চ্যাঙ ও গিডোর মড়া আগলাবার জন্যে ওই ঘরেও আমার থাকবার ইচ্ছা ছিল না।

এখন ডক্টর ইমুরিসের সঙ্গে পাঁজা করতে হবে।

এক এক লাফে দু'ধাপ করে সিঁড়ি পার হতে লাগলাম।

মাটির নীচের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কানে গেল মারসিড গাড়ীটার চিৎকার। চোখের সামনে দেখলাম লোকটার সঙ্গে যেন লড়াই করছে যুবতী মেয়েটি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলাম। গাড়ী খানা তখন গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। ডক্টর ইমুরিসকে লোহার গেট খুলতে হবে। আমি কিন্তু তার আগে ওকে মেরে ফেলতে পারি। হয়তো ইমুরিসও তাই ভাবছিল।

হঠাৎ বসবার দিকের দরজা গেল খুলে আর যুবতী মেয়েটা রাস্তার দিকে ছিটকে পড়ল।

আমি যুবতীর দিকে ছুটলাম। গাড়ীটা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

ডকটর ইমুরিসকে দেখা গেল হেড লাইটের আলোর সামনে ছুটছে।

কিন্তু তখন কি আর ওকে ধরা যাবে?

যুবতীর পাশে বসে ওর মাথাটা ধীরে ধীরে কোলের ওপর টেনে নিলাম। তার দেহ তখনও কাঁপছে। ইমুরিসকে দেখা গেল না।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কুয়াশা গেছে অদৃশ্য হয়ে। সাগরের দিক থেকে এখন সাগরের তাজা বাতাস আসছে।

কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এল। তার চোখের রঙ স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে।

আমি তাকে শক্ত করে ধরে বলি—কোন ভয় নেই। লোকটা বলে গেছে। আর কোনদিন এখানে আসবে না।

ওকে ধরে থাকতে আমার মনে হল যে ওর হারিয়ে যাওয়া সাহস আবার ফিরে আসছে।

অবশেষে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি বুঝলাম এবার আমার খেলা শেষ হয়েছে।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

রকেট গতির দুরন্ত ক্রাইম থ্রীলার এখানে হত্যার ছায়া

অ্যালেস্টেয়ার ম্যাকলীন

সানফ্রানসিসকো। ডালি সিটি।

তার মাঝে একটা লেকের ধারে বসে আছে লয়েড। সে এখন হাসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে অনেক দিন ধরে সে হাসতে ভুলে গেছে।

সে হলো ব্রায়ানের দলের নেতা, দৃঢ় এবং সাহসী।

যেখানে সে বসে আছে সেটা একটা গ্যারেজ, আশেপাশে ছড়ানো আছে ত্রিশটি চেয়ার। তার পাশে বার। পেছনে অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই ধরনের বাস কেনা হয় ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর জন্যে।

লয়েড এটা কিনেছে নব্বই হাজার ডলারে। দুটো কিনেছে দুজন শিল্পপতি, শেষ তিনটি কিনেছে মার্কিন সরকার।

ঐ তিনটে সাদা বাস দাঁড়িয়েছিল সান ফ্রানসিসকোর একটা গ্যারেজে।

দরজা বন্ধ। কয়েকজন পুলিশ ভোঁতা বন্দুক নিয়ে ঝিমোচ্ছে। তাদের ঝিমুনি সহজে ভাঙবে না।

লয়েডের বাসের মধ্যে আছে বুলেট প্রুফ কাঁচ। কেননা রাষ্ট্রপতি আসছেন। আর আছে সোফা সেট আর সোনার টেবিল। বারের জায়গায় সুন্দর ফ্রিজ তাতে ভর্তি ফলের রস। কেননা আরবের এক শেখ রাষ্ট্রপতির অতিথি হিসেবে এদেশ সফর করবেন। তিনি মদ্দ পান করেন না।

এই বাসের সঙ্গে রয়েছে একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র। এখানে পাঁচটি চ্যানেল আছে। যার একটি হোয়াইট হাউসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। অন্যগুলো পালাক্রমে পেন্টাগান এয়ার ফোর্সের হেড কোয়ার্টার্স, মস্কো এবং লণ্ডনে খবর পাঠায়।

গ্যারেজের পেছনের দরজা দিয়ে কয়েকটি লোক এসে ঢুকল বাসটিতে। তারা

একটা তিন ইঞ্চি লম্বা জিনিষ অ্যাডহিম টেপ দিয়ে এঁটে দিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে চটপটে স্বভাবের লোকটির নাম রিচার্ড। কাজটা সেরে তারা লরেওকে ফোন করল।

লরেক বলল—তুমি আর জ্যাক ফ্ল্যাটে চলে গিয়ে অপেক্ষা কর।

সানফ্রানসিসকোর শহরের উত্তর দিকে মেরিন সাউথ লিটো শহরের পাহাড় গুলিতে দেখা গেল দুজন লোককে। তারা একটা ভাঙা চোরা শেভ্রলে গাড়ী নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। লোকগুলোর পোষাক অপরিচ্ছন্ন, দেহ নোংরা।

সূর্যের প্রথম আলোতে উদ্ভাসিত আকাশ। চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। দক্ষিণে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত সোনালী সেতু। পূর্বদিকে কুখ্যাত আলজট রাজ-দীপ, যেখানে আছে কারাগার। উত্তরে সৌজয় দ্বীপ। পূবদিকে আছে আনবেল দ্বীপ। তারপরে পারলো উপসাগরে মিশে গিয়েছে সাগরের সুমহান বিস্তারে।

ওরা বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। একটু আড়ালে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার এবং আর একজন গাড়ী থেকে নামল। তারপর ওপরের কোটগুলো খুলে ফেলতেই দেখা গেল ঝকমকে ক্যালিফোর্নিয়ার পাহারাদার পুলিশের পোষাক পরা দুজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। বাকী চারজন গাড়ীটার বনেট খুলে কাজ করার ভান করতে লাগল, ড্রাইভারের নাম ক্লাসিয়াম, তার সঙ্গী জোন্স, ক্লাসিয়াম আগে ছিল সার্জেন্ট।

দুজনে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে ঢুকল।

—আমি সাজেন্ট ক্লাসিয়াম, এ হল জোন্স।

বেশ মেজাজী চালে কথাগুলো বলে ক্লাসিয়াম পকেট থেকে একটা লম্বা নাম লেখা ফর্দ বের করল।—তোমরা নিশ্চয়ই মেহোলী পার ফ্রাঙ্ক;

—হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা কি করে জানলে? আমার লোক দুজনের মধ্যে যার বয়েস বেশী সে তেজের মত মুখ করে প্রশ্ন করল।

—পড়তে পারি বলে, ক্লাসিয়াম বেশ বিরক্ত হয়ে বলল—তা হলে দেখা যাচ্ছে আমার বড় সাহেব তোমাদের কিছুই জানায় নি। যাক সে কথা··· আজ রাষ্ট্রপতি এই পথ দিয়ে যাবেন, ফলে রুটিন মাফিক সব কিছু চেক করে দেখতে হবে। সময় কম, তাড়াতাড়ি করো। এখান থেকে বিচমণ্ড ব্রিজ পর্যন্ত চেক করায় কথা। চারটে জিনিষ জানতে হবে— ১। এখানে নতুন লিফট্ বদলাবে? ২। কজন আসবে? ৩। টহলদারী গাড়ীগুলো কোথায়? ৪। সেল কোথায়?

ছোকরা মতন ফ্রাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—সকাল আটটায়, আটজন, সাধারণতঃ চারজন থাকে, গাড়ীগুলো……

—আমরা দেখতে চাই।

চাবি নিয়ে সব দেখান হলে সেলের ভেতরটাও দেখতে চাইল ক্লাসিমানরা। সেখানে ঢুকেই পিস্তলের বাঁটের আঘাতে ফ্রাঙ্কসকে অজ্ঞান করে হাত পা বেঁধে ফেলল। ততক্ষণে জোন্সও অপর জনকে এনে ফেলল।

তারপরই দেখা গেল টহলদারী গাড়ী নিয়ে ক্লাসিয়ামরা বাকী চারজনকে তুলে নিচ্ছে। তাদের পোষাকেও ততক্ষণে পালটে গেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া টহলদারী পুলিসের ইউ এস ১০১ মার্কা গাড়ীটা উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। এবং মাউন্ট তামালপাই ষ্টেট পার্কের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ক্লাসিয়াম একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে লয়েডকে ডাকল :

—পি-ওয়ান ?

—বলছি।

—ঠিক আছে।

—ভাল ! অপেক্ষা করো।

॥ ২ ॥

এপাশে নব হিজ পাহাড়ের মাথায় ছকটা হোটেল বাড়ীর সামনের বাগানে ছ'জন লোককে দেখা গেল। দুজন গেটের পাহারাদার, দুজন পুলিশ দুজন সাদা পোষাকে। এরা নিজেদের মধ্যে ইশারায় বড় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে দেখিয়ে কি সব বলার চেষ্টা করছিল।

শেষ পর্যন্ত পোষাক-পরা একজন পুলিশ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—গুড মর্নিং স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, এখানে আমাদের একটা কাজ ছিল।

—কি করে জানলেন যে আমার কোন কাজ নেই ? তারপর কোন কথা না বলে একটা কার্ড ওকে দেখাতেই পুলিশটি বেশ ঘাবড়ে গিয়ে—মাপ করবেন স্যার, আপনাকে স্যার চিনতে পারি নি স্যার, মিঃ জেনসেন, আমার অপরাধ নেবেন না স্যার।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এ পাশে সব ঠিক তো ?

মাথা নেড়ে কোন ক্রমে ওখান থেকে পালিয়ে চলে এল বাগানের মধ্যে।

—কিরে লোকটাকে ভাগাতে পারলি না ?

—যা না, চেষ্টা করে দেখ। এফ. বি. আইয়ের ডেপুটি ডাইরেক্টরকে ভাগিয়ে আয় না।

—ওরে বাপ। তাই নাকি।

হোটেলের একটা বেয়ারা বেরোতেই মিঃ জেনসেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। বেয়ারা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে বলল—জেনসেন, বড্ড বেশী ঝুঁকি নিচ্ছু। হোটেলের জানলায় এফ. বি. আইয়ের লোক মেশিন গান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

—আমার জন্যে ভেবো না। ধরা আমি পড়বো না।

বেয়ারা চলে এল। তারপর সেই দুজন পুলিশের চোখের সামনে জেনসেন একটা ওয়াকি-টকি বের করে ডাকল পি, ওয়ান।

—বলছি। লয়েডের গলা আগের মতই উদ্বেগশূন্য।

—সব কি ঠিকমত চলছে।

—চমৎকার। পি, ওয়ান এবার এগোতো শুরু করছে। প্রতি দশ মিনিট পরপর যোগাযোগ কর। বুঝেছ ?

—হ্যাঁ। আমার জোড়াটি কেমন আছে ?

লয়েড নিকের গাড়ীর পাটাতনের দিকে তাকাল। হাত পা বাঁধা অবস্থায় অবিকল ব্রায়ানের মত দেখতে এফ, বি, আইয়ের মেজকর্তা।

—ভালই আছে।

টম ভিকসন খুব অনায়াসে তার গাড়ীটা উত্তর-পূর্ব দিকে সাদার্ণ ফ্রি-ওয়ের রাস্তায় হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছিল।

টম ভিকসন গাঁটাগোট্টা মানুষ। কদম ছাঁট চুল। অত্যন্ত ধূর্ত। পিটার লয়েডের ডান হাত।

লয়েড ভিতরে এসে একজনের পাশে বসল। তার নাম ইরোন্সি। সে কারুর সামনে গেল না। ভাল্লুকের মত লোম সারা গায়ে। মুখটাও বীভৎস।

ওয়াকি টকি বাজল। বেজিল থেকে জেনসেনের ডাক—পি, ওয়ান ?

—বলছি ?

—সবকিছু ঠিকমত চলছে। ৪০ মিনিট।

—ধন্যবাদ।

লয়েড অন্য একটা যন্ত্রের সুইচ টিপল।

—পি-ফোর ?

—পি-ফোর বলছি।

—এগিয়ে এসো।

চুরি করা টহলদারী গাড়ীটা নিয়ে ক্লাসিয়াস বড় রাস্তায় এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে মাউন্ট সমান পাই রাডার স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেল।

লয়েড আর একটা সুইচ টিপল - পি-থ্রি ? রাষ্ট্রপতির মোটর যাত্রার বাসটাতে যারা বিস্ফোরক ফিট করে এসেছিল তাদের সাংকেতিক নম্বর হল পি-থ্রি।

—সব ঠিক আছে।

—অপেক্ষা করো। লয়েড আবার একটা যন্ত্র তুলে নিল—পি-ফাইভ—সব কিছু ঠিক মত চলছে ৩০ মিনিট।

—পি টুইন ব্রারান আর ব্রাডল। ওদের নির্দেশ দেওয়া হল কাজে এগোতে।

রাডার স্টেশনের গেটে ওদের কার্ড দেখে প্রহরী বলল—দেরী করে ফেললেন যে স্যার।

—হ্যাঁ, সোজা জেলিকবাটারে উঠব।

—না, আগে কমাণ্ডারের ঘরে যান।

কমাণ্ডার ওদের চিনতে না পেরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পিস্তল চালু হল। কমাণ্ডারকে বাথরুমে পুরে টেবিলের ওপর রাখা একটা বোতাম টিপল।

—টাওয়ার ?

—হ্যাঁ স্যার।

—লেফটেন্যাণ্ট অ্যামাব্রিজ আর মার্তিনেজকে এক্ষুনি যেতে দাও। গলার স্বর নকল করতে ক্লাসিয়াস অদ্বিতীয়।

লয়েড আবার রাষ্ট্রপতির বাস গ্যারেজের পিছনে অপেক্ষমান পি-থ্রি-কে ডাকল।

—ওরা তৈরী হচ্ছে স্যার।

সেই দৈত্যাকৃতি তিনটি বাসই এখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। যে বাসটায় বিস্ফোরক ফিট করা হয়েছিল সেটি ছিল সাংবাদিকদের জন্যে। তার পিছন দিকে

বড় বড় সিনে ক্যামেরা দাঁড় করানো। সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান ছাড়াও চারজন মহিলা ছিলেন গাড়ীতে। একজন যুবতী তাহাদের বয়েস সঠিকভাবে বলা শক্ত যাত্রীদের মধ্যে আরও তিনজন ছিল যারা সরকারের আগ্নেয়াস্ত্র চেনে ক্যামেরা টাইপ রাইটার আছে। এই বাসটাই প্রথমে থাকবে। এই বাসে এমন একজন যাত্রী ছিল যে ক্যামেরাও চেনে, আগ্নেয়াস্ত্রও চেনে। তার নাম রেডসন।

দ্বিতীয় গাড়ীটা রাষ্ট্রপতিদের জন্য। সুরক্ষিত ফোর্টনক্স দুর্গের মত তবে সচল। পিছনের বাসেও সাংবাদিক।

রাষ্ট্রপতির বাসে কর্মচারী মোটে তিনজন, ড্রাইভার তাদের কাছে সুন্দরী একটি মহিলা, বেতার ঘরে একজন।

রেষ্টন খবর দিল প্রথম বাস বেরিয়ে গেল। রাষ্ট্রপতির বাস বেরুচ্ছে। পিছনেরটাও তৈরী।

টম ডিকসন তাদের বাসটা নিয়ে এই গ্যারেজের সামনে হাজির হল। ইয়োন্সি তৎপরতার সঙ্গে ওয়াশিংটন ডি সি-র নম্বর প্লেট এঁটে দিল তাদের বাসে।

ড্রাইভারের সাদা কোটে নিজেকে ঢেকে লয়েড এগিয়ে গেল পিছনের বাসের দিকে। টম ডিকসন পিছনের দিকে। কয়েকটা গ্যাস বোমার কাজ, সাংবাদিকদের দলে ভিড়ে যাওয়া পুলিশ সুদ্ধ সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবে কয়েক ঘণ্টা পরে। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

পি-টু ?

— বলছি। এইমাত্র ক্লিয়ারেন্স পেলাম।

কড়া পাহারার মধ্যে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সম্মানিত অতিথিদের হোটেল থেকে বাসে তোলা হল।

অতিথি বলতে প্রধান দুজন, আরবের তৈল সম্রাট, পৃথিবীর অর্দ্ধেক তেল যে দেশে পাওয়া যায় সেই দেশের রাজা, সঙ্গে তাঁর ছেলে যুবরাজ। এ ছাড়া শেখ ইমাম আর শেখ আয়ান। রাজা ও যুবরাজের তৈল-মন্ত্রী।

তারপর বাসে উঠলেন জেনারেল স্কর্টল্যাণ্ড। এর প্রতি রাষ্ট্রপতির বিশেষ পক্ষ পাতিত্ব আছে বলে শোনা যায়। তারপর মন্ত্রনাদাতা হ্যামসেস। অত্যন্ত পেটুক। তারপর মুইর, আণ্ডার সেক্রেটারী। অবশেষে সানফ্রানসিসকোর মেয়র মন মরিসন।

৫০ গজ দুর থেকে নতুন বেলট লাগান লয়েডের বাস রাষ্ট্রপতির গাড়ীকে অনুসরণ করল।

বেশ কিছু ব্যবধান রেখে বাস তিনটে ছুটে চলল। সামনে পিছনে পুলিশের মোটর সাইকেল আর জীপ।

এটা কোন বিলাস সফর নয়। তারা চলেছেন গোল্ডেন গেট পেরিয়ে এমন এক জায়গায় যেখানে মার্কিন সরকারের খরচে একটা তৈল শোধনাগার তৈরী করা হবে আরবদের তেলের জন্য। জায়গাটা সান রাফগায়েল।

॥ ৩ ॥

গোল্ডেন গেট সেতু পৃথিবীতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের এক মহান কীর্তি। লোহা লস্কর দিয়ে তৈরী এক মহাকাব্য যেন। ১৯৩৭ সালের মে মাসে জোসেফ বি ষ্ট্রাউস এটার নির্মান কার্য শেষ করেন।

দু'পাশে সাড়ে সাতশো ফিট উঁচু দুটো বিরাট টাওয়ার। লম্বায় পেছনে দু মাইল। তখন খরচ পড়েছিল ৩৫০০০০০০ ডলার। এর তলাটা জল থেকে ১০০ ফিট উঁচু। বড় বড় যুদ্ধ জাহাজও যাতায়াত করতে পারে তলা দিয়ে। আত্মহত্যা করার পক্ষে সুন্দর জায়গা।

মাথার ওপর হেলি কপটারের পাহারা দেখে যুবরাজ খুব খুশি। রাজাও।

—তাহলে নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন ত্রুটি নেই দেখছি ?

মেজাজে অথচ নম্র ভদ্র সুরে রাষ্ট্রপতি বললেন—মনে করতে পারেন যে আপনি ফোর্টনক্স দুর্গের মধ্যেই আছেন।

॥ ৪ ॥

সবকটা গাড়ী গোল্ডেন গেট ব্রিজের মাঝামাঝি পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে পরপর পাঁচটা ঘটনা ঘটল।

পিছনের বাসে লয়েড একটা সুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বাসের ড্রাইভারের সিটের তলায় একটা বিস্ফোরণ ঘটে ব্রেকটাকে বিকল করে দিল।

টম ডিকসন নিজের গাড়ীটিকে হঠাৎ থামিয়ে দিতেই পিছনে আসা জিপটা ধাক্কা খেল।

লয়েড দ্বিতীয় বোতাম টিপল। গতি মন্থর হয়ে আসা প্রথম বাসের পিছন

দিকে বোতলের আড়ালে আর একটা বিস্ফোরনের সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল গাড়ীর মধ্যে। আরোহীরা সবাই অজ্ঞান হয়ে গেল।

সবকটা গাড়ীই আস্তে আস্তে থামল। পাইলট মোটর সাইকেল পুলিশরা ফিরে এল। ইতিমধ্যে কায়দা করে টম ডিকসন, ইয়োন্সি সবাই মিলে বাকী পুলিশদের হাত কড়া পরিয়ে দিল।

ধীরে সুস্থে টম ডিকসন রাষ্ট্রপতির গাড়ীতে উঠে ঘোষনা করল তাঁরা যেন নড়াচড়া বা অন্য কিছু করতে চেষ্টা না করেন। তাদের হাইজ্যাক করা হয়েছে।

জেনারেল স্কর্টল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছি আপনি সব সময় পিস্তল কাছে রাখেন, দয়া করে ওটা দিন।.....দুঃসাহস দেখাবার চেষ্টা করবেন না। জেনে রাখুন আপনারা গায়ের জোর না দেখালে আমরাও দেখাবো না।

আরবের রাজা রাষ্ট্রপতির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—ফোর্টনক্স দুর্গে নিরাপদেই আছি, কি বলেন?

—বিশ্বাস করো কুপার, রাষ্ট্রপতিরা আমার হাতে বন্দী, কোন রকম বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করলে তাঁদের দারুন ক্ষতি হবে। বেশ তো নিজেই কথা বলে দেখো রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। তার আগে বলে রাখি ব্রিজের দুটো মুখই বন্ধ। আমাদের মাথার ওপর দুটো হেলিকপ্টার উড়ছে। ওরা আমাদের লোক। প্লেন নিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না। তাহলে ওরা রাষ্ট্রপতির গাড়ীর ওপর ভেঙ্গে পড়বে। আর একটা কথা তামাল পাই রাডার কেন্দ্রও আমাদের দখলে। যদি অন্য কোন উল্টো পথে যাওয়ার চেষ্টা করো তবে রাষ্ট্রপতি, রাজা আর যুবরাজের মৃতদেহ ভেট পাবে। আর তা না করলে সব ঠিক থাকবে। বুঝেছো?—লয়েড শেষ বারের মত প্রশ্ন করল।

দেশের পুলিশ সর্বাধিনায়ক হেনড্রিক্স বোকার মত বলল—হ্যাঁ।

প্রথম গাড়ীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকগুলোকে তল্লাসী করে রিভলবার সমেত তিনজনকে পাওয়া গেল। তাদের হাত কড়া পরিয়ে দিল ইয়োন্সি আর বার্টলেট।

ওপাশে লয়েড রাষ্ট্রপতির গাড়ীতে গিয়ে উঠল। এবার যেন সবাই বুঝতে পারলেন এই দলপতি।

সবাইকে সুপ্রভাত জানিয়ে লয়েড পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল।

—কি চাও তুমি, জোচ্চোর কোথাকার। রাষ্ট্রপতি রাগে ফেটে পড়লেন।

—ভদ্রভাবে কথা বলুন রাষ্ট্রপতি, সামান্য মুক্তিপন চাই আমরা। লয়েড যথারীতি ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছিল।

—ভদ্রতা তোমার কাছে শিখবো নাকি! জানো কি ক্ষতি দেশের তুমি করছো…

লয়েড হাসলো। ক্ষতি ? ক্ষতি তো করছেন আপনারা। সান রাস্যায়েল কয়েকদিন পরে গেলেও চলবে। পেট্রোল দেবার নাম করে এই দুটো লোক আমাদের রক্ত চুষতে এসেছে। রাজা আর যুবরাজকে দেখালো লয়েড।

জেনারেল কটল্যাণ্ড উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো লয়েড তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনারা সময় নিন।

তারপর উঠে গিয়ে রাষ্ট্রপতির বাসের কেন্দ্রের মাধ্যমে হেনড্রিক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন লয়েড।

—দেখো আমি যা চাইব, সঙ্গে সঙ্গে যেন পাই।

—বেশ তো।

—আচ্ছা এই খবরটা এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে তো ?

—হ্যাঁ, সানফ্রানসিসকের অর্দ্ধেক লোক ব্রিজের ওপর এই নাটকটি দেখছে। জেনব্রিক্সের গলায় ঝাঁঝ।

—আরও প্রচার চাই। আমার অনুরোধ হল মিলিটারীর ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে এখুনি ব্রিজের দুমুখে জালের বেড়া তৈরী করে দাও। দক্ষিণ দিকে গাড়ী যাবার আসবার গেট রাখতে হবে।

—বেড়া কেন।

—এখানে প্রায়ই কুয়াশা হয়, আর আড়ালে যেন তোমরা না আসতে পারো। আর গেট কেন চাইছি ? রাষ্ট্রপতি, রাজারা আমার অতিথি, ভাল ভাল খাবার চাই। তাছাড়া প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্সও যেন আসতে পারে। আর দেখো যেন ওই সব গাড়ীর সঙ্গে এফ, ডি, পাইয়ের এজেন্ট না আসে। আর ভুলেই যাচ্ছি, রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে মুক্তিপণ নিয়ে কে কথা বলবে ?

হেনড্রিক্স শান্ত স্বরে জানালো উপরাষ্ট্রপতিকে আসতে বলা হয়েছে।

—চমৎকার। তোমার বুদ্ধির তুলনা নেই হেনড্রিক্স।

—বাজে কথা ছাড়ো, আর কি চাই বলো।

—তাহলে সেক্রেটারী আরও ষ্টেট আর সেক্রেটারী অফ ট্রেজারীকেও পাঠাও আরে না, না, দূতদের বন্দী করব কেন। কথা দিচ্ছি।

॥ ৫ ॥

ধীরে ধীরে ডেক্সটারের জ্ঞান ফিরল। পাশের চেয়ারে লতিয়ে পড়ে আছে কোন এক টেলিভিসন কোম্পানীর রিপোর্টার, অপরূপ সুন্দরী একটি যুবতী তার নামটাও অদ্ভুত এপ্রিল ওয়েডনেসডে। হয়ত তার মা বাবা ওর জন্ম মাস আর বারটাকে ভুলতে চান নি।

এপ্রিলের কাঁধে ঝাঁকানি দিতেই সে চোখ মেলল—কি হয়েছে?

—মজা করবার জন্যে কেউ গ্যাস বোমা ছুড়েছিল আমাদের গাড়ীতে। ডেক্সটার জানালো। তবে ব্যাপারটা সহজ নয়, আমরা একঘণ্টারও ওপর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। চলুন বাইরে যাওয়া যাক। ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

হঠাৎ এপ্রিল গাড়ীর মধ্যে কয়েকজনকে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় দেখতে পেল।—ব্যাপারটা সুবিধের নয় দেখছি।

ওরা বাইরে এল, পুলিশের পোশাক পরা ইয়োন্সি হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ওদের লক্ষ্য করছিল।

—তাজ্জব, পুলিশের হাতে বন্দুক। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

—শীগগীরই বোঝা যাবে। হঠাৎ কোত্থেকে লয়েড তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। অপেক্ষা করুন সব জানতে পারবেন।

ব্রায়ান দৌড়ে এল—মিঃ লয়েড মাল্টি তামাল পাই, শীগগির আসুন।

ফোনের কাছে যেতেই লয়েডকে ক্লাসিয়াস সামনে যে রাজার প্লেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে হেনড্রিক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল লয়েড। ভয়ের কিছু নেই। মিল্টন আর কোয়ারী আসছেন, ষ্টেট আর ট্রেজারীর সেক্রেটারী দুজন।

এপাশে প্রথম গাড়ী থেকে সবাই নেমে এসেছে। পুলিশের লোকদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ক্রাইসলারের কাছে। যে পুলিশ জীপের আরোহীদের সঙ্গে এদের বন্দী করে রাখবে।

বাকীদের লক্ষ্য করে লয়েড বলল—আপনারা ভয় পাবেন না। যারা চলে যেতে চান তারা যেতে পারেন, তবে আমার কাহিনী শোনার পর আশা করি কেউই যেতে চাইবেন না।

সব কথা শোনার পর কোন সংবাদিকই যেতে চাইল না। এমন জবর ঘটনা

জীবনে একবারই ঘটে। তবে হ্যাঁ, লয়েড জানিয়ে রাখল, থাকতে হলে কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমরা ব্রিজে দাগ দিয়ে রেখেছি, তার বাইরে যেন কেউ কখনও যাবেন না। গেলেই মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ রাতে সবাইকে গাড়ীর মধ্যে থাকতে হবে।

তারপর শুরু হল পরিচয়ের পালা। গ্রাফটন এসেছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে, ডার্ভগান রয়টারের। আরও অনেক কাগজের প্রতিনিধি ছিল।

লয়েড কিন্তু এদের দুজনকে বেছে নিল। প্রশ্নোত্তরে জানা গেল গত তিন মাস ধরে লয়েড এর প্রস্তুতি চালিয়েছে।

এও জানা গেল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ব্রিজের ওপরই টেলিভিসন আসছে। আর আসছেন সরকারী প্রতিনিধিরা আলোচনা করতে।

লয়েড় কথাটা জানাবার জন্যে রাষ্ট্রপতির গাড়ীর দিকে এগোচ্ছে এমন সময় ইয়োন্সির উচ্চতম কণ্ঠস্বরে শোনা গেল—মিঃ লয়েড ওই দেখুন।

মাইল খানেক দুরে জলের বুকে কুয়াশার আড়াল থেকে যুদ্ধ জাহাজের মাস্তুল দেখা গেল।

লয়েড তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গেল—হেনড্রিক্স, তুমি কি রাষ্ট্রপতির কান দুটো আলাদা ভাবে পেতে চাও?

—কেন কি ব্যাপার?—হেনড্রিক্স সরল ভাবে প্রশ্ন করল।

—ন্যাকামী রাখো। যুদ্ধ জাহাজ আসছে কেন?

হেনড্রিক্স খবর নিয়ে জানালেন ভয়ের কিছু নেই ভাটার সময় ওই যুদ্ধ জাহাজটা ব্রিজের তলা দিয়ে বন্দরে ফিরে যায়। সে নিজে জামিন থাকছে এ ব্যাপারে।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে ছুটলো, একজন বাদে। সে হল ডেক্রটার। ৮ ইঞ্চি লম্বা একটা গোল চোঙ্গার মতন জিনিষকে সে একটা পাতলা সবুজ রঙের লাইলন দড়ি দিয়ে বেঁধে পকেটে পুরে ধীরে ধীরে বাস থেকে নামল।

তারপর কার মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে জাহাজটা যেখান দিয়ে যেতে পারে তাই আন্দাজ করে সবার অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি সেই সুতোটা ঝুলিয়ে দিল ব্রিজের তলায়। গোড়াটা ব্রিজের পেরেকের গায়ে জড়িয়ে দিল শক্ত করে তারপর কয়েকটা ফটো তুললো ক্যামেরা দিয়ে যেন কিছুই হয়নি।

জাহাজটা ঠিক সেইখান দিয়েই চলে গেল। এপাশে রাষ্ট্রপতির বাসে শেখ

ইমান হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে লয়েডকে আক্রমণ করলো। ড্যান ইফেনের কুঁদোর ঘায়ে ইমানের আঙুলগুলো ভেঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সারা আমেরিকা টেলিভিসনে ব্রিজের ওপরকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

লয়েড বিজয়ীর মত ঘোষনা করল তার উদ্দেশ্য। টাকা চাই। কুড়ি কোটি ডলার।

অবিশ্বাস্য। তা হয় না। রাষ্ট্রপতি জানালেন তাঁর জীবনের দাম অত নয়।

—কিন্তু এই রাজা আর যুবরাজ? দেশের সুনাম কি কুড়ি কোটি ডলারের চেয়ে কম দামী? লয়েড সোজাসুজি জানতে চাইল।

ভেবে দেখার সময় নিয়ে চলে গেলেন মিলটন আর কোয়ারী। সঙ্গে হেনড্রিক্সও ছিল।

—কে এই পিটার লয়েড?

—এর বাবা হলেন বিখ্যাত ব্যাংকার লয়েড। পিটার নিজেও শিক্ষিত। ডক্টরেট ডিগ্রী আছে। তারপর অপরাধ জিজ্ঞাসা নিয়ে চর্চা করতে করতে নিজেই ক্রিমিনাল হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত ১০।১২ টা ডাকাতি করেছে। ধরা পড়েনি। পড়ে না। দারুন বুদ্ধি।

নিজেদের জায়গায় পৌঁছতেই হেনড্রিক্সের হাতে ৮ ইঞ্চি লম্বা সেই চোঙ্গাটি তুলে দেওয়া হল।

—আমারই নাম তো দেখছি।

॥ ৬ ॥

এপাশে ডেক্রটার গিয়ে সেই সবুজ সুতোটি ধরে টান দিল। হাল্কা উঠে এল দড়িটা ঠিক সেই সময় এপ্রিল ওয়েনেসডে হাজির সেখানে—মাছ ধরারই উপযুক্ত সময় আর জায়গা বটে মিঃ ডেক্সটার। তাঁর ঠোঁটে মৃদুহাসি।

ডেক্সটার কথা পাল্টালো—তোমার মত সুন্দরী সঙ্গে থাকলে হনোলুলু পর্যন্ত.....

—যথেষ্ট হয়েছে, আর তোষামোদ করতে হবে না।

আবার যোগাযোগ হল মিল্টন আর কোয়ারির সঙ্গে।

—শুনুন কুড়ি কোটি ছাড়াও আরও কুড়ি কোটি চাই গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্যে। ওর ওপর আমার খরচ খরচা বাবদ আরও আটকোটি ডলার।

—তা নাহলে ?

—ব্রিজটা উড়িয়ে দেব। ব্রিজের দুই থামের মাথায় বিস্ফোরক লাগানো আছে।

মেয়র মরিসন আর থাকতে পারলেন না, ঝাঁপিয়ে পড়লেন লয়েডের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। এবারেও টম ডিকসন।

—এবার আপনাদের সিদ্ধান্ত জানান। নাকের রক্ত মুছতে মুছতে লয়েড ফোনটা আবার তুলে নিল। ঠিক আছে, আমিই সময় দিচ্ছি। বলে সকলে এবার। সারা পৃথিবীতে আপনাদের ব্যাংক ছড়ানো আছে। বিশেষ করে ইউরোপ ব্যাংকগুলো থেকে একই সঙ্গে আমার লোকেদের কাছে টাকা দিতে হবে। তারা নিরাপদে ফিরে গিয়ে আমাদের জানালেই এরা মুক্তি পাবেন।

—তোমরা পালাবে কি করে ? মিল্টন জানতে চাইলেন।

—কেন দুটো হেলিকপটার আমাদের এখানেই অপেক্ষা করছে, তাতে করে এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে রাষ্ট্রপতির বিমানে করে……

—রাষ্ট্রপতির বিমানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিও তো সঙ্গে থাকবেন। ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা দ্বীপের মালিক আমার বন্ধু। সেখানে যাবো। তারপর টাকা পয়সা ভাগ করে আসবো এখানে।

—তোমার সাহস তো কম নয় ?

—তা একটু বেশীই বলতে হয় বিনয়ের সঙ্গে জানালো লয়েড। তাছাড়া ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে আমাদের ক্ষমা করা হয়েছে লিখিয়ে নেবো।

—তুমি একটা শয়তান—পাগল মিল্টন বিস্ময়ে হতবাক।

—দুটোর যে কোন একটা, আবার নম্রগলায় উত্তর দিল লয়েড।

এপ্রিল আর ডেক্সটার ব্রিজের ধারে বসেছিল খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে।

—কি ভাবছ ? এপ্রিল মিষ্টি করে জানতে চাইল।

—যা ভাবছি, তা সাহস করে তোমায় বলতে পারি ?

—পারো।

—তোমার কোন রোগ আছে ?

—না।

—তবুও তোমায় অসুস্থ হতে হবে। আর আমার একটা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে বাইরে একজনকে।

—ওরে বাব্বা, তা পারবো না। লয়েড ধরলে……

—ভয় পেয়োনা। মেয়েদের লয়েড কিছু বলে না। কোন ক্ষতি করেনা। রাজী ?

জোর করে এপ্রিলকে সরিয়ে দিয়ে ডেক্সটর এগিয়ে গেল অ্যম্বুলেন্সের ডাক্তারের কাছে। কথায় কথায় দুজনে একমত হয়ে উঠল। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে ডেক্সটর ডাক্তার ও'হারার সাহায্য চাইল।

প্ল্যান মাফিক এপ্রিল গ্রাণ্ডটনের কাছে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ও'হারার অ্যম্বুলেন্সের মধ্যে।

এবার গেল লয়েডের কাছে। সে এসে দেখল ছাইয়ের মত রক্ত শূন্য মুখ নিয়ে ষ্ট্রেচারে শুয়ে আছে এপ্রিল। ডাক্তার ও ও'হারা জানালো সম্ভবত এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যাথা। এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

লয়েডের সন্দেহ কাটল এপ্রিলকে ভাল করে পরীক্ষা করার পর। গাড়ীটাও মোটামুটি মার্ক করল। অথচ এপ্রিল যেতে চায় না। এমন একটা দুর্লভ ঘটনা থেকে সে বাদ পড়তে দেবে না নিজেকে। মরি সেও ভাল।

হেসে ফেলল লয়েড।—ঠিক আছে সোনামনি হয়েই চলে আসবে, কথা দিচ্ছি আমি।

ও'হারা চলে গেল এপ্রিলকে নিয়ে, সঙ্গে গেল আটখানা সিগারেটের আকারের একটা রিল। তার মধ্যে কিছু গোপনীয় খবর।

॥ ৭ ॥

হ্যাগেনবাক কথা বলছিলেন অ্যাডমিয়াল নিউসন আর জেনারেল কার্টারের সঙ্গে। হ্যাগেনবাক এফ. বি. সাইয়ের বড় কর্তা। তার মতে তাড়া হুড়ো করার দরকার নেই। অথচ নিউসন আর করেটার একটা হেস্তা নেস্তা করতে চান এক্ষুনি।

হ্যাগেনবাক কোন কথা না বলে ডেক্সটরের পাঠানো কাগজটা তুলে ধরলেন—যুদ্ধ জাহাজ নিউ জার্সির মাধ্যমে ডেক্সটর এই খবরটা পাঠিয়েছে—পড়ছি শুনুন।

"দয়া করে অপেক্ষা করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না। বল প্রয়োগ আদৌও করবেন না। পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছি। ট্রান্স রিসিভারটা ব্যবহার করতে পারছি না, এদের স্বয়ংক্রিয় বেতার তরঙ্গ ধরার যন্ত্রটা অবিরাম কাজ করে চলেছে। দুপুরে আরও খবর পাঠাচ্ছি।"

—ডেক্সটার কেমন লোক ?

—নিষ্ঠুর, উদ্ধত, স্বাধীনেতা, যা করে নিজের মতে করে।

ম্যাগেনবাক জানালেন।

—এরকম মাথামোটা লোক···

—মাথামোটা নয়। আমার হাতে গড়া লোক।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি মিলটন, কোয়ারী আর হেনড্রিক্সের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছিলেন। তারা জানতেন না যে ঐ গাড়ীর মধ্যে রাষ্ট্রপতির চেয়ারের তলায় লাগানো একটা ছোট যন্ত্রের সাহায্যে সব কথা বাইরে টেপ রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অস্থির হয়ে লয়েড বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—কি সিদ্ধান্ত করলেন, টাকা দেবেন ?

রাষ্ট্রপতি, আরবের রাজা আর যুবরাজকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তা হয় না। সাফ উত্তর দিল লয়েড।

ডেক্রটার নিজেদের গাড়ীর মধ্যে বসে তার ক্যামেরার তলায় বিশেষ খোপে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট বেতার যন্ত্রটা পকেটে পুরে ক্যামেরাটা টিক করছে। হঠাৎ গাড়ীর মধ্যে টম ডিকসন ঢুকল।

—কি ব্যাপার বাইরে এত হইচই, অথচ আপনি এখানে বসে ?

—কি করব বলুন, যা কাজ সব তো টিভিই সেরে দিচ্ছে। তাছাড়া ক্যামেরা লোড করতে হলে অন্ধকার দরকার।

—অদ্ভুত ক্যামেরা তো আপনার। দেখি।

খুটিয়ে দেখল টম কি যেন। না নির্দোষ ক্যামেরা। তারপর প্রথম সুযোগেই পকেটের ট্রান্স রিসিভারটা নদীর জলে বিসর্জন দিল ডেক্রটার।

টিভিতে দেখা হল কি ভাবে দুজন মাকড়সা-মানুষ ব্রিজের থামের ওপর উঠে গেছে বিনা লিফটে। তারা ওখানে ইলেকট্রনিক যন্ত্র সমেত বিস্ফোরক লাগিয়ে দিল।

—এতে তো তোমরাও মরবে ! রাষ্ট্রপতি বললেন।

—না। ওই বিস্ফোরন ঘটবার সুইচটি আছে হেলিকপটারে। বুঝেছেন? সবাই হতভম্ব হয়ে লয়েডের শয়তানী বুদ্ধির কথা চিন্তা করতে লাগল।

টেলিভিসানের সুইচটা অফ করে উপরাষ্ট্রপতি রিচার্ডস বললেন—স্বীকার করতে বাধ্য যে ওই শয়তানটা দারুন আঁটঘাঁট বেঁধে কাজে নেমেছে।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ঘরের মধ্যে হ্যাগেনবাক ছাড়াও ডঃ ওহারা আর এপ্রিল ছিল।

—তাহলে এখন কি করা হবে? রিচার্ডস সবার উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

—ডেক্রটারের খবরটা পাঠোদ্ধার হোক আগে।

—হ্যাগেনবাক শান্তভাবে উত্তর দিলেন। কথা শেষ হতে না হতেই একজন এসে কাগজ দিয়ে গেল। হ্যাগেনবাক পড়তে শুরু করলেন!

"এগুলো যত তাড়াতাড়ি পারেন পাঠান ৪০০ গজ লম্বা নীল অথবা সবুজ পাতলা দড়ি। সংবাদ পাঠানোর জন্যে জলে ভাসতে পারে এমন লম্বা কৌটো, আলোর সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাবার উপযোগী মুখ ঢাকা টর্চ, তাছাড়া চাই—সুগন্ধি স্প্রে করার এয়ারো মল একটা, দুটো পেন—একটা সাদা, একটা লাল। আর একটা ক্যাপ এয়ার পিস্তল। এগুলো ছাড়া আমি এক পাও এগোতে পারব না।

—হায় ভগবান এগুলো কি জিনিস—জেনারেল কার্টার জানতে চাইলেন।

ডাঃ ও'হারা আর এপ্রিলের দিকে তাকিয়ে একটু ইতঃস্তত করে হ্যাণ্ডেলবাক বললেন—আগের গুলো তো বুঝতেই পারছেন এয়ারোসেলটা হল অজ্ঞান করার গ্যাস ভরতি শিশি। পেন দুটোও তাই, তবে সাদাটা সাময়িকভাবে অজ্ঞান করে রাখে, লালটা একটু বেশিক্ষণ। বেশিক্ষণ মানে প্রায় পাকাপাকি ভাবে। ক্যাপ পিস্তলের গুলিতে সাইনাইভ বিষ লাগানো থাকে।

এপ্রিল লাফিয়ে উঠল। ডেক্সটার লোকটা তাহলে খুনী।

—আদৌ নয়। আমাদের সবচেয়ে দক্ষ অফিসার।

কাগজটায় আরও কিছু কথা ছিল লয়েড সম্বন্ধে। "অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস লয়েডকে ডোবাবে। ১৭ জন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে লড়া মুস্কিল। তবুও আমি সেটা বলছি। লয়েড আর টম ডিকসনই দলের সেরা বুদ্ধিমান। প্রয়োজন পড়লে এদের সরাতে হবে। ব্রিজের তলায়

রাতে সাব মেরিন পাঠাতে হবে। আমি খবর দেবো, নেবো। ওদের হাতে একটা ক্ষুদে বেতার যন্ত্র পাঠাবেন।"

'কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে দুজনকে ব্রিজের থামের মাথায় পাঠাবার চেষ্টা করুন।'

"খাবারের সঙ্গে অজ্ঞান হবার কত ওষুধ মিশিয়েও চেষ্টা করা যেতে পারে. তবে ট্রেগুলো চেনবার জন্যে হাতলের তলায় একটু চলজ উঠিয়ে দেবেন। যাতে আঙুল বুলিয়ে চেনা যায়।"

শেষ পর্যন্ত সবাই ডেক্রটারের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে রাজী হলেন।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যে ৬টার সময় এপ্রিল ফিরে এল ব্রিজে ডঃ ও'হারার স্যাম্বুলেন্সে করে। এপ্রিলকে অসুস্থ দেখালেও ও বেশ চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। লয়েড ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলল।

সবাই টিভি প্রোগ্রামে চলে গেলে ডেক্রটার এপ্রিলকে একলা পেয়ে কাছে এগিয়ে এল।

—যাও, যাও, খুনীর সঙ্গে আমার কোন কারবার নেই। এপ্রিলের গলায় ক্ষোভের সুর। আমি সব শুনে এসেছি। এমন কি সানসাইড পিস্তল পর্যন্ত।

অনেক কষ্ট করে ডেক্রটার এপ্রিলের মান ভাঙালো। তারপর দুজনেই এসে টিভির কাছে বসলো।

ওদের লক্ষ্য করছিল লয়েড। টিভির প্রোগ্রাম শেষ হতেই লয়েড এগিয়ে এল ওদের কাছে। কথায় কথায় বলল—তোমায় কিন্তু ফটোগ্রাফার মনে হয় না ডেক্রটার।

—যেমন তোমাকে ডাকতে মনে হয় না। হেসে উত্তর দিল ডেক্রটার।

—তুমি কোন কাগজের সঙ্গে যুক্ত ?

—লণ্ডন টাইমস।

—কিন্তু তুমি তো আমেরিকান।

—চাকরীর কি কোন জাত আছে।

—এখানে কতদিন থাকবে ? লয়েড প্রশ্ন করল।

—কালকেই আমার চীন যাবার কথা। তবে এখানে বেশী আকর্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

—তোমার ক্যামেরাটা অদ্ভুত।

—হ্যাঁ' টম ডিকসনও তাই মনে করে খুঁটিয়ে দেখেছে এটা।

তাই নাকি। লয়েড তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

একটু অপেক্ষা কর ডেক্রটার লয়েডের সঙ্গী সাথীদের ফটো তুলে বেড়াতে লাগল। এমনি করে ব্রিজের রেলিংয়ের পরে ডঃ ও'হারার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডেক্রটার।

—স্যার জিনিষ এসেছে ?

—হ্যাঁ। পেন দুটো আমার বোডে গোঁজা আছে কেউ সন্দেহ করবে না। সানসাইড পিস্তল বা যন্ত্রের ক্রিয়ায় চালু করার যন্ত্রের তলায় লুকোনো আছে। তবে বাক্সটা নীল করা গালা দিয়ে।

—আর দড়ি এবং টিনের চোঙ্গা ?

—ল্যাবরেটারী স্যাম্পেল লেবেল আটা চারটে টিনের মধ্যে পাবে। এয়ারোসলটা আছে আমার টেবিলের ওপর। তাতে লেবেল আঁটা "চন্দন গন্ধ।" প্রথম দুটো তিনটে স্প্রে চন্দনের গন্ধ বের করে। পরের গুলো···হ্যাঁ, সাব-মেরিন দাঁড়াবে ঠিক প্রথম গাড়ার তলায়।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল। আচ্ছা, মুখ ঢাকা টর্চ লাইট ?

— ওটাও দেওয়ালে ঝোলানো আছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ডেক্রটার জেনারেল কর্টল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্ট, করছে।

—আমার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন না জেনারেল ?

—তুমি কে হে যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—হ্যাগেনবাক কথাটা শুনলে খুশী হবেন না।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে জেনারেল কার্টল্যাণ্ড বললেন হ্যাকেনবাগের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক।

— উনি আমার মাইনে দেন।

—তোমার নাম ?

—পল ডেক্রটার।

ওর পরে তুমিই হবে বড় কর্তা।

—ততদিন আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। হেসে উত্তর দিল ডেক্রটার। সব কথা ডেক্রটার তাকে জানালো। মুগ্ধ হয়ে গেলেন কার্টল্যাণ্ড।

—শেষ কথা স্যার, আপনার পিস্তলের খাপটাতো আমি দেখতে পাচ্ছি। যথাসময়ে একটা পাঠিয়ে দেবো।

—ধন্যবাদ।

॥ ৯ ॥

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় খাবার এসে পৌঁছল। লয়েড এসে ডেকে নিয়ে গেল ডেক্রটারকে।

—মাঠো তুমিই প্রথম শুরু করবে।

তার মানে সন্দেহের শিকার হয়ে আমি তোমার গিনিপিগ হবো। ডেক্রটার রাগত স্বরে কথাটা বলল।

শেষ পর্যন্ত তাকে খেতে হল ছটা বেতেলের মদ একটু একটু করে।

হঠাৎ খাবারের গাড়ীতে যে লোকটা এসেছিল সে চেঁচিয়ে উঠল। দেখা গেল দূরে হ্যানসেন রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করছেন। পাশেই খাবারের ট্রেটা পড়ে আছে।

লয়েডের মুখটা কালো হয়ে উঠলে। ডঃ ও'হারা এলেন। ততক্ষণের হ্যানসেন মারা গেছেন।

বিষ বিশেষজ্ঞ এসে পরীক্ষা করে বললেন খাবারে বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লয়েড হাসতে চাইল সতেরোটা ট্রের খাবারে তাই আছে কিনা। কারণ তারা দলে মোটে ১৭ জন।

বিশেষজ্ঞরা বললেন, না ১২টা ট্রেতে।

লয়েড কঠিন মুখ করে ডেক্রটারকে বলল—তুমি একটা প্লেট নিয়ে যাও।

—বাঃ আবার গিনিপিগ? বুঝেছি, তুমি জানতে চাও ট্রেগুলো ডেক্রটার বুঝতে পারল। এটাতে বিষ নেই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল ডেক্রটার।

লয়েড এবার পড়ল হেনড্রিক্সকে নিয়ে।

—তুমি নিশ্চয়ই বলবে, বিষের ব্যাপারটা তুমি কিছু জানো না।

—বিশ্বাস কর লয়েড।

—ঠিক আছে, আর একদফা খাবার পাঠাও, এবার খাবার সবার আগে টেষ্ট করবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আর টিভিকেও খবর দাও আসতে। তোমরা যে ব্রায়ানের হত্যাকারী বা সবাইকে জানাতে চাই।

ডেক্রটারের কথায় ডঃ ও। এপ্রিলকে ইনজেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কারণ এবার লয়েড ডাক্তার আর এপ্রিলকে জেরা করবে।

ঠিক তাই হল। এপ্রিলের অজ্ঞান হবার ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না লয়েড। তাছাড়া লোকটা আয়ারল্যাণ্ডের লোক।

লয়েড খোঁজ নিল খাবারের গাড়ী খাবার আগে ও ঘরে ডেক্রটার, ডাক্তার আর এপ্রিল কে কোথায় ছিল, কথা বলেছিল কি না। দেখা গেল ডেক্রটার আর ডাক্তার এক সঙ্গে ছিল কিছুক্ষণ।

ডেক্রটারের ওপর সন্দেহটা ঘনীভূত হল। টম ডিকসনকে ভার দেওয়া হল ডেক্রটারের কথাগুলো যাচাই করার। মিনিট পনেরো পরে এসে টম ডিকসন জানালো লণ্ডন টাইমস ডেক্রটারকে স্বীকার করেছে, ওর পাসপোর্ট, স্পেনের টিকিট হংকং যাবার সব খবরই ঠিক।

—ঘড়ি আর জুতোর ফলস হীল দেখাব না কি লয়েড?

—একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

—আমার ব্যাপারে তোমরাই বা কি কম করছ। ডেক্রটার চাপারাগ চাপতে পারল না।

টিভিতে বিষ—বিশেষজ্ঞরা জানালেন বিষ ক্রিয়ায় হ্যামসেনের মৃত্যু হয়েছে।

টিভির শেষে উপরাষ্ট্রপতি রিচার্ডস রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আর হেনড্রিক্স জেনারেল কাটল্যাণ্ডের সঙ্গে অনেকক্ষণ একান্তে আলাপ করে চলে গেলেন। যাবার আগে টাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিল লয়েড।

লয়েড কোয়ালস্কিকে ডাকল।

নজর রেখেছিলে?

—হ্যাঁ, স্যার, ডেক্রটার এদের কাছে আসে নি।

—আশ্চর্য, হিসেব মিলছিল না লয়েডের।

হঠাৎ লয়েডকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল ডাক্তার ও আয়া।

—একবার সার্চ করব।

—করুন, তবে সাবধানে।

মুখঢাকা টর্চটাকে দেখিয়ে প্রথম কাত করল লয়েড—চোখের তারা দেখবার যন্ত্র।

এয়ারোসল্স যন্ত্রটা নিয়ে বোতাম টিপল লয়েড। সুন্দর চন্দনগন্ধ।—বা বেশ সৌখীন লোক আপনি ডাক্তার।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া চালু করার যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল—এটা সীল করা কেন?

—জিবাণুমুক্ত অবস্থায় আছে। দরকারের সময় একে মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না বলে। তাছাড়া আপনি এত করছেন এতে রাষ্ট্রপতির যে কোন মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ দোনামোনা করে লয়েড চলে গেল। ডাক্তারকে অবিশ্বাস করার তেমন জোরালো কারন নেই।

সারা ব্রিজ তন্নতন্ন করে খুঁজলো টম ডিক্যাম আর তার দলের লোকেরা। না, কোথাও কোন ফাটল নেই, সন্দেহের করেন নেই।

থাকবে কি করে। সন্দেহ করার মত জিনিষটা আগেই হেনড্রিক্সের মারফৎ পাচার হয়ে গেছে।

নিজেদের দপ্তরে ফিরে মিলটন, কেরানী, হ্যাগেনবাক আর হেনড্রিক্স আলোচনা করছিল। হেনড্রিক্স মোজার মধ্যে থেকে একটা চিরকুট বের করে হ্যাগেনবাগকে দিলেন। পাঠোদ্ধারের জন্যে সেটা যথাস্থানে পাঠান হল।

ঠিকরে আসতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আজকের রাতটা ঝড় বৃষ্টি হবে। আমি চাই দক্ষিণ-পশ্চিম লিঙ্কন পার্কে আর পূর্বদিকে ফোর্ট ম্যাসনে পেট্রলটায়ার জাতীয়-জিনিষ দিয়ে আগুন লাগানো হোক রাত ১০টা আন্দাজ। ১০টা বেজে ৩ মিনিটে লেসার বিষ দিয়ে বেতার ধারক যন্ত্রটিকে নষ্ট করতে হবে। তারপর আমি আলোর সংকেত দেব। ঠিক তার পনেরো মিনিট পরে সারা ব্রিজের আলো নিভিয়ে দিতে হবে ১০ মিনিটেয় জন্যে আর সেই সময় চায়না টাউনে আতসবাজী জ্বালাতে হবে প্রচুর মাত্রায়।

মাঝরাতে সাবমেরিন যে ট্রান্সমিটার লাগনো বেতার যন্ত্র পাঠায় তবে এত ছোট যাতে ক্যামেরার তলায় বসানো যায়।

—পাগল, বদ্ধ পাগল তোমাদের এই ডেক্রটার—রিচার্ডস বলে উঠলেন।

দূরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ডেক্সটার আর এপ্রিল গাড়ীর মধ্যে

ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে কোয়ালস্কি প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ডেক্রটারকে দেখে যাচ্ছিল। গাড়ীর ভিতর বার্টলেট হাতে মেসিনে পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

ঘড়ি মিলিয়ে ডেক্রটার প্রস্তুত হয়ে রইল। ৯টা বেজে গেছে। এবার কোয়ালস্কি এল, দেখে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন সাদা পেনটা হাতে নিয়ে কি যেন করল ডেক্রটার। সঙ্গে সঙ্গে পাদানী থেকে হুমড়ী খেয়ে পড়ল কোয়ালাস্কি। আধহাতের মধ্যে বাস আর বার্টলেট লাফিয়ে পড়ল নীচে। সঙ্গে সঙ্গে রেডাসন ও। সাদা পেনটা আবার নড়ে উঠল। ৩ বারে ঘুরে পড়ল বার্টলেট। একজনের জন্য এবং অন্য জনের ঘাড় থেকে সুক্ষ্ম ছুঁচটা সরিয়ে নিল ডেক্রটার। তারপর দুজনকেই তুলে গাড়ীর ড্রাইভারের সীটে ভরে দিল।

রাত দশটা। সবাই নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু জেগে আছে ডেক্রটার। ১০টা বেজে ৭ মিনিট। লিঙ্কন পার্কে আগুন লাগল। এ পাশেও আগুন দেখতে ব্যস্ত। তবে কাচের-মধ্যে দিয়ে আর কতটুকু দেখা যায়। লয়েড ছুটল টেলিফোন করতে :

—এসব কি হচ্ছে হেনড্রিক্স ?

—দাঁড়াও খবর নিয়ে জানাচ্ছি।…শোন, একটা অয়েল ট্যাংকরে আর একটা পেট্রল পাম্পে বাজ পড়ে আগুন লেগেছে।

— ওসব ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করছি না, এখুনি আগুন নেভাও। সশব্দে ফোনটা নামিয়ে রাখল লয়েড।

অল্প সময়ের মধ্যে চায়না টাউনে আতসবাজী ফাটতে লাগল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে। সবাই বেরিয়ে এসেছে আতসবাজী দেখতে।

লয়েড টেলিফোন ধরে। ডেক্রটার ডঃ ও'হারাকে বলল—এই সাদা টর্চটা নিয়ে এখানে পাহারা দিন। আমি কয়েক মিনিটে আসছি।

ডেক্রটার চট করে হেলিকপটারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ক্ষিপ্র হাতে সেই সুইচটার ভিতরের অংশ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সরিয়ে ফেলল যার ফলে ব্রিজের মাথায় মাথায় ঝোলানো বিস্ফোরনটা অকেজো হয়ে গেল।

এর একটু আগে পূর্ব পরিকল্পনা মতো ব্রিজের সব আলো নিভে গেছে। লয়েড টম ডিকসনকে জেনারেটার চালাতে বলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সার্চ লাইটগুলো জ্বলে উঠল।

—দেখো পাগলামি কোর না লয়েড, আমি যাদুকর নই, যে দু দুটো জায়গায় আগুন নিভাবো, চায়না টাউনে যাবো, ব্রিজের আলো জ্বালাবো। সব চেষ্টাই করা হচ্ছে।

ডেক্রটার আর ও'হারা ফিরে এল গাড়ীর কাছে। মুখ ঢাকা টর্চ লাইটটা ফেরত দিল ডাক্তারকে, কাজ হয়ে গেছে ওটার। এখন শুধু পিস্তলটা পাচার করতে হবে জেনারেল কর্টল্যাণ্ডের কাছে।

নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে ডেক্সটার এপ্রিলের পাশে গা এলিয়ে দিয়ে বলল—বারোটা বাজার আগে জাগিয়ে দিও।

ডেক্সটারকে জাগাতে হল না, সে জেগেই ছিল। ডেক্সটার বাইরে এসে পাহারাদারের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। নির্ভুল নিশানার মধ্যে ব্রায়াস আসার সঙ্গে সাদা পেনটি কাজ সুরু করল।

বাথরুমের মধ্যে ওকে পুরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ডেক্রটার সামমেরিনের উদ্দেশ্যে।

দড়ি আর টিনটি নামিয়ে দিল, টান পড়ল একটু করে। উঠে এল বেতার যন্ত্র, সুইচ টিপে কথা বলল ডেক্রটার : পেয়েছি, সব ঠিক মত চলছে।

—অদ্ভুত সময়ে মাছ ধরছে ডেক্রটার—টম ডিকসন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে কাঠ হয়ে গেল ডেক্রটারের সারা শরীর —তাহলে দেখছি লয়েডের সন্দেহই ঠিক, দেখি কি করছে। তবে ধীরে ধীরে আর সহজভাবে।

ধীরে ধীরে এয়রো সলটা মুঠোয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভিটক্রার। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল টম ডিকসনের দিকে। মাত্র তিনফিটের ব্যবধান। বোতামটা টিপল ডেক্রটার।

তারপর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টম ডিকসনের অচেতন দেহটাকে বেঁধে নামিয়ে দিল তলায় আস্তে আস্তে। বেতার যন্ত্রে সাবমেরিনে খবরটাও পাঠাচ্ছি।

রিচার্ডস আর কোয়ারী হ্যাগেনবাকের সঙ্গেই ছিলেন। খবরটায় তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পাগল পাগল, ডেক্রটার একটা বদ্ধ পাগল। তবে এ পাগলামীর তুলনা নেই।

এবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম চাই ডেক্রটারের। এপ্রিলের পাশে বসতেই সে চোখ মেলল।

—আমি ভাবতেই পারিনি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

—তাই নাকি? ডেক্রটার চাপা স্বরে ঠাট্টা করল।

—আরে তোমার গলায় ওটা কি?

চমকে উঠল ডেক্রটার, সদ্য যোগাড় করা বেতার যন্ত্রটা। ভাগ্যে ওদের কারুর চোখে পড়েনি। ক্যামেরার তলায় ওটাকে লুকিয়ে ফেলল।

ওদিকে ততক্ষণ কার্টলেট আর ব্রায়ানের ঘোর কেটে গেছে। ডেক্রটার অবশ্য তার আগেই তাদের যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছে।

ডেক্রটার এয়ারোসলটা সামান্য একটু স্প্রে করে নিয়ে ওটা এপ্রিলকে লুকিয়ে রাখতে বলল—আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘুমে অচেতন হয়ে যায় ডেক্রটার।

টেলিফোন ঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল লয়েড। ক্রাইসলার গিয়ে তাকে জানালো—আধঘণ্টার ওপর টম ডিকসনকে দেখতে পাচ্ছি না।

—সে কি? লাফিয়ে উঠল লয়েড।

তারপর তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি চলল। কিন্তু কোন ফল হল না। হঠাৎ লয়েড বলে উঠল—ডেক্রটার? ডেক্রটার কোথায়। চলোতো দেখি।

কার্টলেট শপথ করে বলল ডেক্রটার বেরোয় নি গাড়ী থেকে। তা না হলে ঘুমিয়ে পড়ার অপরাধে লয়েড মেরেও ফেলতে পারে।

ডেক্রটরের চোখের পাতা টেনে দেখা হল। না গাঢ় ঘুমই বটে।

সবাই একবাক্যে বলল টম ডিকসনকে তারা আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত দেখেছে।

বার্টলারকে প্রশ্ন করতেই সে বলল—আমি বোকার মত প্রশ্ন করব নাকি তাকে ও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে? ওকে শেষ কে দেখেছে?

পিটার্স, তবে তাতে কোন লাভ হয় নি। কিন্তু গেল কি ভাবে? ও তো আত্মহত্যা করার মত কাপুরুষ নয়। আর ডেক্রটারকেও সন্দেহ করা যাচ্ছে না।

—তবে? তবে কি ও ব্রিজের তলায়।

আসলে টম ডিকসন তখন ছিল হেনড্রিক্সের সদর দপ্তরে।

—তাহলে দেখছি আমিই ডেক্রটারকে তত গুরুত্ব দিইনি। টম ডিকসন পুলিশ পাহারার উদ্যত রাইফেলের দিকে তাকিয়ে বলল।

—সান কুয়েনটিন জেলখানায় ঢুকলে দেখবে তোমার মত অনুতাপ অনেক

লোকই করে থাকে সেখানে। ঢুকলে দশটি বছর আর মুক্তি নেই। হ্যাগেনবাক বললেন।

—প্রত্যেক ব্যবসায় উত্থান পতন আছে—টম ডিকসন জানালো।

—একটা চুক্তিতে আসবে আমাদের সঙ্গে—হ্যাগনবাক প্রনাম করল টম ডিকসনকে।

—না, এটাই আমার শেষ উত্তর।

রাত তিনটে বাজতে দশ মিনিট আগে বিমান বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট একটা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নিয়ে দক্ষিণ তীর থেকে কি একটা করল। লয়েডের বড় সার্চলাইটটা লেসার বিষ দিয়ে অকেজো করে দেওয়া হল।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে দুজন লোক ব্রিজের থামের মাথায় ওঠা সুরু করল সবার অগোচরে। পুলিশ বিভাগের তারাই হল মাকড়সা মানুষ।

ঠিক তিনটের সময় সবকটা আলো আবার নিভলো।

ক্রাইসলার এসে খবর দিল লয়েডকে দক্ষিণমুখী সার্চলাইটটা অকেজো হয়ে গেছে। চলো, আসছি। তার আগে হেনড্রিক্সকে জানিয়ে দিল লয়েড সকাল সাতটার কোয়ারাকে তার চাই ই।

ঠিক সাতটায় রাষ্ট্রপতির গাড়ীতে ফোন বেজে উঠল।

—আমি কোয়ারী বলছি। আমরা তোমার প্রস্তাবে রাজী। তাই যোগা-যোগ করার ব্যাপারে তুমি যা বলবে।

—চমৎকার। ফোন ছেড়ে ক্রাইসলারকে ডাকল লয়েড। এবার ব্যাপারটা চুকে গেল।

—ভাল।

শুধু ভালো শুনে একটু ভাবিত হল লয়েড।

—কেন খুশী হলে না খবরটা পেয়ে ?

—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—ক্রাইসলার গম্ভীর হয়ে বলল।

লয়েডকে সে সার্চলাইটের কাছে সূক্ষ্ম একটা ফুটো দেখাল। আর বেতার সংকেত ধারক যন্ত্রটার গায়েও ঐরকম চিহ্ন দেখাল—আমি কিন্তু এসব ভাল বুঝছিনে। এসব লেসার বিষের কাজ।

হেনড্রিক্সের দপ্তরে তখন প্রধান সাত জনই উপস্থিত, এবার একটা কিছু করতে হবে, এমন সময় ফোন বাজল।

—জেনারেল কার্টার, এরপর যদি একবারও লেসারবিষ ব্যবহার করো তবে

সুইরকে জলে ফেলে দেবো। আমাদের সার্চলাইট আর বেতার সংকেত ধারক যন্ত্র নষ্ট করেছ তোমরা।

—ভুল করছো লয়েড, আমরা লেসার বিস ব্যবহার করলে অনেক আগেই তোমার পাহারাদারদের শেষ করতে পারতাম। বাজ পড়ে ওরকম হয়েছে।

—বাজে কথা বোল না কার্টার। গাড়ী বা সার্চলাইট রবারের চাকার ওপর থাকে, আর্থ কোথায় যে বাজ পড়বে?

—ভেবেছিলাম তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে, আকাশে ওড়া অবস্থায় প্লেন কি করে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়?

এই প্রথম লয়েড চিন্তাগ্রস্ত হল। তবে কি ওর বুদ্ধি কাজ করছে না। তারপর সব কিছু ঝেড়ে ফেলে হেনড্রিক্সকে বলল—৯টার সময় টেলিভিসানদের পাঠাও।

ক্রাইসলার ওদের সব কথা শুনেছিল। সে জেনারেল কার্টারের যুক্তি মানলো না তারপর লয়েডকে বলল—দেখুন টম ডিকসন নেই, আপনার ওপর দারুণ চাপ পড়ছে, আপনি মাউন্ট তামাল পাই রাডার কেন্দ্র থেকে ক্লাসিয়াসকে আনান এখুনি।

যুক্তিটা লয়েডের মনোমত হল।

একটু পরে দেখা গেল বাথরুম থেকে এপ্রিল হেনড্রিসকে ডেক্রটারের খবর পৌছে দিচ্ছে। ডেক্রটারের ফোন পাবার পর এক মিনিট অন্তর অন্তর যেন ব্রিজের ওপর গ্যাস বোমা ফাটানো হয়।

সকাল সাড়ে সাতটা। জল খাবারের গাড়ী এসেছে। সেই সঙ্গে ব্রাডলে হেলিকপটারে করে ক্লাসিয়াসকে নিয়ে এল। ভাবনার কিছু নেই মিঃ লয়েড, আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।

আবার ফোন বাজলো। লয়েড আমি হাগেনবাক বলছি, কাইরোনিস তোমার সঙ্গে দেখা করবে না, কখনও না।

কাইরোনিস কে? লয়েড বোকার মত প্রশ্ন করল, তার মাথা ঠিক কাজ করছিল না।

—আরে তোমার সেই ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপের মালিক—বন্ধু। যেখানে তুমি যাবে ঠিক করে রেখেছ। ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কাইরোনিসের হুঙ্কার শোনা গেল—লয়েড, তুমি একটা আস্ত গাধা, কি দরকার ছিল টিভিতে জোর গলায় অত প্রচার

চালানোর। ওরা বলছে তুমি আমার দ্বীপের দিকে এগোলেই মিশাইল দিয়ে আমার দ্বীপকে উড়িয়ে দেবে! অতএব তোমার সঙ্গে আমায় সব সম্পর্কের ইতি।

—তাহলে কাইরোনিসও আমাদের ভোবালে? ক্লাসিয়াস খুব ঠাণ্ডা মাথায় দুঃসংবাদটাকে নিল।—তবে আপনি ভাববেন না লয়েড ওরা খালি ব্লাফ মেরে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আমাদের মুঠোয় দেখি ওরা কি করতে পারে।

—আমি কিন্তু কাইরোনিসের গলা চিনি ক্লাসিয়াস। আমার ভুল হয়নি।

—ঠিক আছে আমরা হাভানাতে যাবো। সেখানে কোন বাধা নেই। তাছাড়া কাস্ট্রো আমেরিকার চিরশত্রু। আমাদের স্বাগত জানাবেই।

লয়েড অনেকটা নিশ্চিত হয়ে ঘুমোতে চলে গেল। ডেক্রটার ঘুরতে ঘুরতে ও'হারার কাছে এল।

—ডাক্তার, কবে ৫৫-এর নাম শুনেছেন?

—না।

একধরনের গ্যাস বোমা, অজ্ঞান করে রাখে বেশ কয়েক ঘণ্টা। আজ ঐ ধরনের কিছু বোমা ফাটবে ব্রিজের ওপর। আপনারা নিজের নিজের বাড়ীতে থাকবেন। আর আপনি অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা কাছে রাখবেন।

এরপর ডেক্রটার গেল সাংবাদিক গ্রাফটনের কাছে। পরিচয় দেবার দরকার হল না, গ্রাফটন ওকে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। তাকেও ডেক্রটার গ্যাস বোমার কথা বলে সাবধান করে দিল।

৯ টার সময় টিভি শুরু হল। তার অনেক আগে রিচার্ড আর হ্যারিসনকে পাঠান হয়েছিল টাওয়ারে উঠে বোমা ফিট করতে। তারা যখন চুঁড়াতে পৌঁছলো হাঁফাতে হাঁফাতে তখন রিভলবার হাতে রজার্স তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

এ পাশে লয়েড টিভিতে দেখতে শুরু করল কিভাবে তারা ব্রিজটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। টাওয়ারে বোমা ফিট করা হচ্ছে আবার। কিন্তু কিছুতেই টিভি ক্যামেরার চোখ তাদের খুঁজে পেল না।

—হেনড্রিক্স আমার লোকরা টাওয়ারে নেই কেন?

—তা কি করে বলবো লয়েড। অনেকক্ষণ ধরে লিফট খারাপ ওরা উঠবে কি করে?

—ওদের কাছে টাওয়ারের নকসা আছে।

—তাহলেই সেরেছে, নিশ্চয়ই আগেকার নকশা, মাত্র কয়েক মাস আগে ওপরে ওঠার পথটা বদলানো হয়েছে, আর তার নকশা এখনও পর্যন্ত তৈরী হয়নি।

লয়েড দাঁত পিষল। এবার পাঠাল বার্টলেট আর বয়ার্ডকে। তারা লিফটে করে উঠল, বোমা ফিট করল দেশ শুদ্ধ লোক টিভিতে তা দেখল। লয়েড স্বস্তির হাসি হাসলো।

বার্টলেটরা কুঠরীতে রাজার্স তাদের বন্দী করে ফেলল পিস্তল দেখিয়ে।

লয়েডের টিভি শেষ হতে না হতেই তাতে ফুটে উঠল হ্যাগেনবাকের চেহারা।

—এবার আমরা তোমায় কিছু টিভি দেখাবো লয়েড। তোমার পথ যে কত ভ্রান্ত তা এখনই বুঝতে পারবে।

টিভিতে উপরাষ্ট্রপতি রিচার্ডস লেকবোগীতে সম্বোধন করে যা বললেন তার সারার্থ এই!

"এই কদিন লয়েডরা আপনাদের যা বুঝিয়েছে তা ঠিক নয়। ওর দলের লোকেরাই এবার বিদ্রোহী। লয়েডের ডান হাত হল টম ডিকসন। তবে লয়েড গোপনে জানায় যে মুক্তিপনের টাকা শুধু তারা দুজনে আত্মসাৎ করবে। অন্যদের ফাঁকি দিয়ে। এই বিশ্বাস হন্তার পরিচয়—পেয়ে টম ডিকসন পালিয়ে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করে সব কথা স্বীকার করেছে। বিশ্বাস না হলে দেখুন—

টিভিতে অন্য ছবি ফুটে উঠল। চারজন লোকের মাঝখানে টম ডিকসন বসে আছে। তবে ছবিটা তত স্পষ্ট নয়।

লয়েড স্ক্যাসিয়ানের দিকে তাকাল।

—লয়েড কথাটা আমরা বিশ্বাস করছি না, কারন টম ডিকসনকে আমরা চিনি। তাছাড়া ছবিটা দেখলে বোঝা যায় যে ওকে নেশার ওষুধ খাইয়ে ওই ভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু ভাবছি দলের যারা নতুন সদস্য তারা কি ভাবে জিনিসটা নেবে।

ওপাশে টিভিতে আবার ছবি ফুটে উঠল।—

—শুধু টম ডিকসন নয়—, আরও চারজন এইমাত্র টাওয়ার থেকে নেমে এসে আত্মসমর্পন করেছে। বার্টলেট বয়ার্ডদের চারজনকে দেখা গেল মদের গ্লাস নিয়ে খোস গল্প করছে।

ডাঃ ও'হারা নিচু গলায় ডেক্রটারকে বলল—এটাও কি তোমার প্ল্যান ?

—হলে খুশি হতাম। তবে মনে হচ্ছে এই হাগেনবাকের কীর্তি।

দূরে মাউন্ট তামাল পাই রাডার কেন্দ্রে জোমাবার চার সঙ্গীকে বলল—নিজেদের বিক্রী করবে ?

মৌনং সম্মতি।

রিচার্ডস লয়েডকে জানালেন টাকার কথা সব ব্যাংকে বলে দেওয়া হয়েছে। বাকীটা লয়েডের দায়িত্ব।

লয়েড বেতার ঘরের দিকে এগোল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার চলনে ক্লান্তির ছাপ।

—টম ডিকসন বিশ্বাস ঘাতক নয়। বেশ জোর দিয়ে বলল ক্লাসিয়াম।

—আমিও তাই মনে করি। কিন্তু ও ব্রিজ ছেড়ে গেল কি করে ? যাওয়া অসম্ভব। কেউ না কেউ দেখবেই।

—আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস ঘাতকতা করছে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। ক্রাইসলার জানালো তার মত।

টেলিফোন এল। আবার কি ? টেলিভিসন খুলতে বলছে। ধীরে ধীরে পর্দায় ফুটে উঠল মাউন্ট তামাল পাইয়ের রাডার কেন্দ্র। জোন্স সমেত ৫ জন এগিয়ে এসে আত্মসমর্পন করছে হেনড্রিক্সের কাছে। লয়েডের হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ক্লাসিয়াম পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, বোকা হাঁদা, এইতেই বোকা বনে গেলি।

—ওর দোষ নেই ক্লাসিয়াম। তুমি নেই কাছে, ফলে জোন্সের বুদ্ধি কি করে কাজ করবে।

কোন কাজ নেই সকলে ধীরে ধীরে নিজেদের গাড়ীতে উঠে এল, রাজকীয় বন্দীদের শেষ মানুষটি উঠে যাবার পর পাহারাদার ম্যান দরজাটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে পিছন ফিরতেই মাথার কাছে কার্টল্যাণ্ডের পিস্তলের নলটা দেখতে পেল।

—বাঁচাতে যদি চাও বন্দুক ফেলে দাও। লয়েডের দলে একমাত্র ইয়োন্সি ছাড়া সবাই বুদ্ধিমান। কার্টল্যাণ্ড ম্যাককে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে পুরে দিলেন।

তারপর রাষ্ট্রপতির দিকে ফিরে বললেন—কিছুক্ষণের মধ্যে অনেক অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। আপনারা ভয় পাবেন না। দরজা জানলা বন্ধ করে দিলাম।

তাছাড়া এখন আমাদের কাছে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র। ম্যাকেরটাও। বাইরে মারাত্মক বোমা ফাটবে। তবে আমাদের গাড়ী বুলেট প্রুফ তো বটেই, এয়ার কাণ্ডিশানও করা ঐ বোমায় আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। হয়ত কিছু পরে আমাদের হেলিকাপ্টারে চড়তে হবে, তবে সেখানেও চিন্তার কোন কারণ নেই।

—তুমি এত সব খবর পেলে কোত্থেকে কার্টল্যাণ্ড।

—ডেস্কটার। সে কে? সে এর মধ্যে কি ভাবে আসে? ও তো রিপোর্টার।

—না, ও হ্যাগনবাকের উত্তরাধিকারী।

রাষ্ট্রপতি শান্ত গলায় বললেন—আমি যা বলি। তাই ঠিক, সে আমায় কোন খবর জানায় না।

ডেক্রসনের গাড়ীতে পিটার্সেরও অবস্থা হল ম্যাকের মত। এবার নিশ্চিন্তে ডেক্রসন হেনডিক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

—তৈরী তো?

জ্যাগেনবাগের সঙ্গে কথা বল, যদি ও এখনও লয়েডর সঙ্গে কথা বলছে।

—তাহলে টাকা ইউরোপে পৌঁছে গেছে।·····চমৎকার। কিন্তু সাংকেতিক শব্দটা কি?

—পিটার লয়েড।

—আরও ভাল, অনেকক্ষণ পরে লয়েডের মুখে হাসি ফুটল।

মিনিট পাঁচেক পরেই ব্রিজের ওপর বোমা পড়তে শুরু করল। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল লয়েডের—হ্যাগেনবাক, হেনড্রিক্স—এসব কি হচ্ছে?

—বিশ্বাস করো আমরা জানি না। জেনারেল কার্টারও রাগ করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে এসব করছে। আমরা দেখছি।

—তাই দেখো। এপাশে আমি রাষ্ট্রপতির গাড়ীতে যাচ্ছি। এবং তার অর্থ যে কি তা বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না একটু পরেই।

লয়েড লাফিয়ে নামল গাড়ী থেকে। রাষ্ট্রপতির গাড়ীর দরজা বন্ধ। রাগের চোটে চাবীর গর্ত লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল লয়েড। কিন্তু কোন ফল হল না। ওর কাছে একটা বোমা ফাটল। শ্বাস কষ্ট শুরু হল।

কোন রকমে টেলিফোনের কাছে ফিরে গিয়ে লয়েড আবার পাকড়াও করল হেনড্রিক্সের।

—আমরা আক্রমন করি নি। তুমি বিশ্বাস কর লয়েড। অ্যাডমিরল নিউসমকে পাঠিয়েছি কার্টারের মোকাবিলা করতে।

ফোন রেখে উপরাষ্ট্রপতি বলেন—হ্যাগেনবাক, আমার অভিনয় কেমন হল ?

—দারুন, গোয়েন্দা দপ্তরে যোগ দিন।

ক্লাসিয়াসের প্রশ্ন—ওদের কথা জানালেন কেন ?

—অন্য উপায় ছিল না।

লয়েড গাড়ী থেকে নামল। ক্লাইসেলার মাটিতে শুয়ে কাশছিল। লয়েড ওকে গাড়ীতে তুলে নিল। বাইরে বোমা ফাটল। ওরা দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে।

জেনারেল কার্টল্যাণ্ড পিস্তল ধরে ম্যাকের কাছ থেকে চাবিটা নিলেন। জানলা খুলে চাবিটা ফেলে দিলেন।

বাতাস এসে গ্যাস উড়িয়ে দিল। রুমিয়াস, ব্রায়াস আর ব্রাজলকে নিয়ে লয়েড বেরিয়ে এল।

সেতু জুড়ে পড়ে আছে অচেতন মানুষ। রাষ্ট্রপতির গাড়ী থেকে চাবিটা নিয়ে লয়েড দরজা খুলল। তারপর চলল ডেক্সটারের খোঁজে।

গ্রাফটন জবাব দিল যে ডেক্সটার উত্তর টাওয়ারের দিকে গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে লয়েড শপথ করে—আমি সেতু ধ্বংসকরবো। তোমাদের মধ্যে কে গাড়ী চালাতে জানো ?

অল্প বয়েসী এক সাংবাদিক এগিয়ে আসে।—গাড়ী চালিয়ে দখিনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও।

স্কাইসেলারকে গাড়ীর পাহারায় রেখে লয়েড গেল হেলিকপটারের কাছে।

হেলিকপটারের প্রথম সারিতে অতিথিরা বসেছেন। তৃতীয় সারিতে ক্লাসিয়াস আর ক্লাইসেলার বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে।

অ্যাম্বুলেন্স যখন দখিন দিকের গেটে তখন ও'হারা ফেরবার নির্দেশ দিল। গাড়ীটা ফিরতে সুরু করেছে।

হেলিকপ্টারে ব্রায়াস উঠতেই সারেঙ চালাতে বলল। শব্দ করে সেজ নেমে গেল।

লেসার বিষ। পাখাটা জলে ছিটকে পড়েছে।

লয়েড ফোন তুলে বলল—ব্রাণ্ডলি, আমাদের নিয়ে যাও।

সম্ভব নয়, কয়েকটা জেট বিমান ভাড়া করেছে আমরা অন্য এয়ার পোর্টে নামতে বাধ্য হব।

ডেক্রটার উঠে সাদা পেনের সাহায্যে দুজনকে মেরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লয়েড পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়াল। এত দূর থেকে ডেক্রটার তাকে মারতে পারবে না। লয়েড শিকারী কুকুরের মত এক পা একপা করে এগোতে থাকে। রাষ্ট্রপতির হাতের লাঠিটা সশব্দে তার মুখে আঘাত করল।

এই সুযোগে ডেক্রটার মাটিতে শুয়ে ক্লসিয়াসের বন্দুকটা তুলে নিল, সে এখন সতর্ক হয়ে গেছে।

তাঁরা সবাই দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্সের কাছে। রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলটন, হ্যাগেনবাক এবং ডেক্সটার। এপ্রিলের হাতটা ডেক্সটারের মুঠিতে।

পুলিশ এসে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে বন্দীদের আহতদের নিয়ে চলে গেল।

—রাজা আর যুবরাজদের খবর কি? রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন করলেন।

—ওঁরা আজই সাম রাগয়েল যেতে চান। এটাতে তাঁরা আদৌ বিব্রত মনে করছেন না—উপরাষ্ট্রপতি জানালেন।

—তাহলে এগোন যাক—রাষ্ট্রপতি পা বাড়ালেন।

ডেক্সটার একটু এগিয়ে এসে বলল—ধন্যবাদ স্যার।

—তুমি? তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ। ওটাতো আমার দেবার কথা তোমাকে।—ঠিক তা নয় স্যার, আমি তো শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতি মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন।

—যাও অফিসে গিয়ে পুরো রিপোর্ট লিখে ফেলো—হ্যাগেনবাক হেসে বললেন ডেক্সটারকে।

—আপনার কথা অমান্য করলে কি হবে স্যার?

—চাকরী চলে যাবে।

হায়, হায়। তবে স্যার, আজ একটু এপ্রিলকে নিয়ে লাঞ্চেও যাব। তার আগে ভাল করে স্নান করতে হবে।

—এপ্রিলকে নিয়ে শুধু আজকেই লাঞ্চে যাবে? তা হলে ছুটি মঞ্জুর হবে না। যদি রোজ যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও তবেই ছুটি…

—প্রভুর হুকুম আমি কখনও অমান্য করি না স্যার।

হ্যাগেনবাক হাসলেন।

—সমাপ্ত—